মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

সম্পাদনা । যুগান্তর চক্রবর্তী

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৫৭
২০তম মুদ্রণ : কার্তিক ১৪০৮, সংখ্যা ২২০০
২১তম মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১০, সংখ্যা ২২০০
২২তম মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১২, সংখ্যা ১১০০
২৩তম মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৬, সংখ্যা ১১০০
২৪তম মুদ্রণ : মার্চ ২০০৮, সংখ্যা ২২০০

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি .

মুদ্রাকর :
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
২১বি, রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন জীবিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পর তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প'-র আরও দুটি মুদ্রণের প্রয়োজন হয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রেষ্ঠ গল্প'-র বর্তমান সংস্করণ সম্পূর্ণ নূতনভাবে পরিকল্পিত ও সম্পাদিত হল। এই নূতন সম্পাদনা পরিকল্পিত হয় প্রধানত এই বিবেচনায় যে, কোনো লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর নির্বাচিত রচনাসংকলন জীবিতকালে প্রকাশিত সংকলন অপেক্ষা মূলত ভিন্ন হতে বাধ্য। কোন লেখক যতদিন সকল অর্থে জীবিত ততদিন পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর রচনাসংকলন অন্তত এই অর্থে অসম্পূর্ণ ও আপেক্ষিক যে, সংকলন নির্বাচন ও সম্পাদনা লেখকের সৃষ্টিশীলতার সামগ্রিক পরিমাণ ও পরিণতির অপেক্ষা রাখে। অন্যপক্ষে, মৃত্যুর পর লেখকের সৃষ্টিকর্ম যেহেতু তাঁর প্রতিভার স্বকীয় পূর্ণবৃত্তে পৌছোয়, সেহেতু তাঁর রচনাসংকলন এই পূর্ণতার প্রতিভাসে পরিকল্পিত হবার প্রয়োজন হয়। ফলে, লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত রচনাসংকলনে সামগ্রিক বিচার ও ব্যাপক তথ্যসন্ধানের যে অবকাশ থাকে, জীবিতকালে প্রকাশিত সংকলনে তা স্বভাবত অনুপস্থিত।

নির্বাচিত সংকলন মাত্রই অবশ্য প্রথমাবধি আপেক্ষিক। এই জাতীয় সংকলন সর্বদাই বহুল পরিমাণে সংকলনকর্তার ব্যক্তিরুচির মুখাপেক্ষী। দেশকালের স্বভাবভেদেও একই জাতীয় সংকলনের স্বরূপভেদের কারণ ঘটে। বিশেষত শ্রেষ্ঠগল্প-জাতীয় সংকলনের স্বেচ্ছাআরোপিত শ্রেষ্ঠত্বের মান দেশকালপাত্রের বিচারভেদের তাড়নায় নিয়ত অস্থির। অপরপক্ষে, শ্রেষ্ঠ গল্পজাতীয় সংকলন যদিও বিশেষ কোন লেখকের সমগ্র সৃষ্টিকর্মের শ্রেষ্ঠ দিকচিহ্নগুলির পরিচয়মাত্র, তথাপি এমন ধারণা জন্মায় যে, বিশেষ একটি সংকলনের নির্দিষ্ট আয়তনের ভিতর সংকলিত নির্দিষ্ট কিছু গল্পই লেখকবিশেষের অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠ গল্প।

উপরোক্ত কথা মনে রেখে বর্তমান 'শ্রেষ্ঠ গল্প'-এর নির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্বতন সংস্করণের কোন আমূল সংস্কার সাধিত হয়নি। নতুবা পূর্ববর্তী সংস্করণের প্রায় সমস্ত গল্পের পরিবর্তেই সম্পূর্ণ ভিন্নতর গল্প বর্তমান সংস্করণের একই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে উপস্থিত হতে পারত। অথচ, এই নির্বাচনও যে সর্বজনগ্রাহী হত, এমন কোন কথা নেই। পূর্ববর্তী সংস্করণের ছ'টি মাত্র গল্প বর্তমান সংস্করণে বর্জিত হয়েছে, এবং লেখকের শেষপর্বের ছ'টি ভিন্ন গল্প বর্তমান গ্রন্থে নির্বাচিত হল। এই পরিবর্তনের কারণ শুধু এই যে, নবনির্বাচিত গল্পগুলির প্রতি পাঠক সমাজের মনোযোগ ইতিপূর্বে যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়নি। নতুন গল্পগুলির একটি, 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!', লেখকের ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোনো স্বতন্ত্র গল্পগ্রন্থ বা সংকলনের অন্তর্ভূক্ত হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র গল্পের এক তথ্যভিত্তিক অবয়ব নির্মাণের উপর বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদনায় অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এ-সংকাল অবধি সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে লেখকের সকল গল্প সম্পর্কিত একটি ধারাবাহিক পঞ্জি বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত হল। সংকলিত গল্পগুলি সম্পর্কে আলোচনামূলক কোনো ভূমিকা বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়নি। এ-জাতীয় ভূমিকা অনেকক্ষেত্রে পাঠকের মনে একরূপ পূর্বনির্দিষ্ট সংস্কার জন্মায় এবং এমন ধারণার কারণ হয় যে, নির্বাচিত গল্পগুলি লেখকের সৃষ্টিকর্মের শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ। ভূমিকা হিসাবে সংযোজিত হল লেখকের নিজের একটি রচনা, 'কেন লিখি'। এই রচনাটি আপন সৃষ্টি প্রসঙ্গে লিখিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বল্পসংখ্যক রচনার অন্যতম। আজ এবং আগামীকালের যারা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্ভাব্য প্রথম পাঠক, তাদের কাছে 'কেন লিখি'র মৌল সত্য অপরিসীম বলে বিবেচিত হবে। প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে রচিত একটি সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি পরিশিষ্টের প্রথমে সংযোজিত হল।

২

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সম্পর্কে কিছু আলোচনা অতীতে হয়েছে। আজ এবং আগামীকালের লেখকগণ এ-কাজ আরো বেশি করবেন আশা হয়। বিশেষত, অতি আধুনিককালের গল্প লেখকগণের দায়িত্ব মনে হয় এ-বিষয়ে সর্বাধিক। রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক লেখকগণের ভিতর হয়তো একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই তাঁদের অস্তিত্বচিন্তার উত্তরাধিকার রক্তমাংসে সম্পর্কিত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ পর্বের গল্প সম্পর্কে শুধু কিছু আলোচনার সূত্রপাত বর্তমান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক বলে বোধ হয়েছে। এর কারণ প্রথমত এই যে, বর্তমান 'শ্রেষ্ঠ গল্প'-এ শেষ পর্বের গল্প কিছু পরিমাণে অধিক। দ্বিতীয়ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-সম্পর্কিত তাবৎ আলোচনায় তাঁর শেষ পর্বের মূল্যবিচার নিতান্তই কম। এবং এই স্বল্পসংখ্যক আলোচনার ক্ষেত্রেও আলোচকগণ কখনো বা অর্ধমনস্ক সামান্যীকরণে অতিরিক্ত তৎপর, কখনো বা কেউ-কেউ শেষ পর্বের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়েছেন মাত্র। বস্তুত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পর্বের সাহিত্য সম্পর্কে অধিকাংশ আলোচনাই চরম ও বিরোধী দুই পক্ষপাতে দ্বিধাবিভক্ত। এই বিরোধী দুই শিবিরের পুরোভাগে একদিকে ফ্রয়েড এবং অন্যদিকে মার্কস্ যতটা স্থান অধিকার করে থাকেন, সাহিত্যবিচারের এক ও অখণ্ড ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান ততই সংকুচিত হয়ে যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ পর্বের সাহিত্য সম্পর্কে শুধু বুদ্ধিজীবী মহলেই নয়, সাধারণ্যেও একপ্রকার সংস্কার প্রচলিত আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শেষ পর্বের সাহিত্যে রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সমাজচেতনা প্রকাশের অত্যধিক আগ্রহে শিল্পবোধ অবধি বিস্মৃত হয়েছিলেন, এ-জাতীয় একপ্রকার ধারণা পাঠক সমাজে আজও প্রায় প্রবাদবাক্যের মতো দুর্মর। এবং প্রবাদবাক্যের মতোই এই ধারণায় জনশ্রুতির প্রভাব যত প্রবল, শিল্পনিরীক্ষার ফলশ্রুতি সেই পরিমাণে অনুপস্থিত। বর্তমান সম্পাদকীয় বক্তব্যে এ-সম্পর্কে বিস্তারিত

আলোচনার অবকাশ নেই। এ-প্রসঙ্গে আপাতত বক্তব্য শুধু এই যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র লেখক যিনি বিশেষ স্থান ও কালে স্থাপিত মানুষের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের তাৎপর্য সন্ধানে জীবন সম্পর্কে এক ক্ষমাহীন ভাবনায় আজীবন ভাবিত ছিলেন। এই ভাবনার ভারে শুধু তাঁর শেষ পর্ব নয়, প্রথম পর্বের রচনাও বহু ক্ষেত্রে বিপন্ন বোধ হয়। বস্তুত, এই বিপন্ন শিল্পবোধ আপন কালের প্রতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়ত দায়বদ্ধ শিল্পধর্মের প্রত্যক্ষ পরিণাম। তারই ফলস্বরূপ, জগৎ ও জীবনের অন্ধ অন্তঃস্রোতে চালিত যে মানুষ তাঁর প্রথম পর্বের রচনায় অবিরত আত্মখনন ও আত্মসন্ধানে ব্যাপৃত, শেষ পর্বের রচনায় সেই মানুষই ব্যাপক সমাজসত্যের আন্দোলনে আত্মপ্রতিষ্ঠা পায়। মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা হয়তো শেষ পর্বের রচনায় সবেমাত্র সূচিত হয়েছিল ; সূচনা হয়তো কিছু দ্রুত আকস্মিকতায় সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু মানুষের তাৎপর্য সন্ধানের একমাত্র প্রশ্নে ইতিমধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবতার যে নূতন আয়তন দান করেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তা অদ্যাবধি তুলনাহীন। বাস্তবতার এই নূতন আয়তনদানে শিল্পের প্রচলিত সীমা অবধি অতিক্রমকারী প্রতিভায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে লেখকের চরিত্রধর্ম নূতন অর্থে নির্ণয় করেন।

কেন লিখি

লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে সব কথা জানানো যায় না, সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি। অন্য লেখকেরা যাই বলুন, আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, তাঁরা কেন লেখেন প্রশ্নের জবাবও এই।

চিন্তার আশ্রয় মানসিক অভিজ্ঞতা। ছেলেবেলা থেকেই আমার অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে বেশী। প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে। আত্মজ্ঞানের অভাব আর রহস্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিভাবানেরা কথাটা মেনে নেন। মানসিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও উৎসাহ অথবা নেশা এবং প্রক্রিয়াটির চাপ ও তীব্রতা সহ্য করবার শক্তি অনেকগুলি বিশ্লেষণযোগ্য বোধগম্য কারণে সৃষ্টি হয়, বাড়ে অথবা কমে। আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।

লেখার ঝোঁকও অন্য দশটা ঝোঁকের মতই। অঙ্ক শেখা, যন্ত্র বানানো, শেষ মানে খোঁজা, খেলতে শেখা, গান গাওয়া, টাকা করা ইত্যাদির দলেই লিখতে চাওয়া। লিখতে পারা ওই লিখতে চাওয়ার উগ্রতা আর লিখতে শেখার একাগ্রতার ওপর নির্ভর করে। বক্তব্যের সঞ্চয় থাকা যে দরকার সেটা অবশ্য বলাই বাহুল্য,—দাতব্য উপলব্ধির চাপ ছাড়া লিখতে চাওয়ার উগ্রতা কিসে আনবে।

জীবনকে আমি যে ভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেবার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সমভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।

দান করি বলা ঠিক নয়,—পাইয়ে দিই। তাকে উপলব্ধি করাই। আমার লেখাকে আশ্রয় করে সে কতকগুলি মানসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে—আমি লিখে পাইয়ে না দিলে বেচারী যা কোনদিন পেত না।

কিন্তু এই কারণে লেখকের অভিমান হওয়া আমার কাছে হাস্যকর ঠেকে। পাওয়ার জন্য অন্যে যত না ব্যাকুল, পাইয়ে দেওয়ার জন্য লেখকের ব্যাকুলতা তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী। পাইয়ে দিতে পারলে পাঠকের চেয়ে লেখকের সার্থকতাই বেশী। লেখক নিছক কলম পেষা মজুর। কলমপেষা যদি তার কাজে না লাগে, তবে রাস্তার ধারে বসে যে মজুর খোয়া ভাঙে তার চেয়েও জীবন তার ব্যর্থ, বেঁচে থাকা নিরর্থক।

কলম-পেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই, এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহঙ্কার বোধ করি বলে আপশোষ জাগে যে, খাঁটি লেখক কবে হব!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ ঃ 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' প্রকাশিত 'কেন লিখি' নামক সংকলন। প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ১৯৪৪।

প্রাগৈতিহাসিক

সমস্ত বর্ষাকালটা ভিখু ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছে। আষাঢ় মাসের প্রথমে বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করিতে গিয়া তাহাদের দলকে দল ধরা পড়িয়া যায়। এগারো জনের মধ্যে কেবল ভিখুই কাঁধে একটা বর্শার খোঁচা খাইয়া পলাইতে পারিয়াছিল। রাতারাতি দশ মাইল দূরের মাথা-ভাঙা পুলটার নীচে পৌছিয়া অর্ধেকটা শরীর কাদায় ডুবাইয়া শরবনের মধ্যে দিনের বেলাটা লুকাইয়া ছিল। রাত্রে আরও ন'ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একেবারে পেহ্লাদ বাগ্দীর বাড়ি চিতলপুরে।

পেহ্লাদ তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই।

কাঁধটা দেখাইয়া বলিয়াছিল, 'ঘাওখান সহজ লয় স্যাঙ্গাত। উটি পাকবো। গা ফুলবো। জানাজানি হইয়া গেলে আমি কনে যামু? খুনটো যদি না করতিস্—'

'তরেই খুন করতে মন লইতেছে পেহ্লাদ।'

'এই জন্মে না স্যাঙ্গাত।' বন কাছেই ছিল, মাইল পাঁচেক উত্তরে। ভিখু অগত্যা বনেই আশ্রয় লইল। পেহ্লাদ নিজে বাঁশ কাটিয়া বনের একটা দুর্গম অংশে সিন্‌জুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে তাহাকে একটা মাচা বাঁধিয়া দিল। তালপাতা দিয়া একটা আচ্ছাদনও করিয়া দিল। বলিল, 'বাদলায় বাঘটাঘ সব পাহাড়ের উপরে গেছে গা। সাপে যদি না কাটে ত আরাম কইরাই থাকবি ভিখু।'

'খামু কী?'

'চিঁড়া গুড় দিলাম যে? দুদিন বাদে বাদে ভাত লইয়া আসুম। রোজ আইলে মাইনসে সন্দ করবো।'

কাঁধের ঘা-টা লতাপাতা দিয়া বাঁধিয়া আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া পেহ্লাদ চলিয়া গেল। রাত্রে ভিখুর জ্বর আসিল। পরদিন টের পাওয়া গেল পেহ্লাদের কথাই ঠিক, কাঁধের ঘা ভিখুর দুনাইয়া উঠিয়াছে। ডান হাতটি ফুলিয়া ঢোল হইয়া গিয়াছে এবং হাতটি তাহার নাড়িবার সামর্থ্য নাই।

বর্ষাকালে যে বনে বাঘ বাস করিতে চায় না, এমনি অবস্থায় সেই বনে জলে ভিজিয়া মশা ও পোকার উৎপাত সহিয়া, দেহের কোন না কোন অংশ হইতে ঘণ্টায় একটি করিয়া জোঁক টানিয়া ছাড়াইয়া জ্বরে ও ঘায়ের ব্যথায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে ভিখু দু'দিন দু'রাত্রি সঙ্কীর্ণ মাচাটুকুর উপর কাটাইয়া দিল। বৃষ্টির সময় ছাট লাগিয়া সে ভিজিয়া গেল, রোদের সময় ভাপসা গাঢ় গুমোটে সে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্বাস টানিল, পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি তাহার এক মুহূর্তের স্বস্তি রহিল না। পেহ্লাদ কয়েকটা বিড়ি দিয়া গিয়াছিল, সেগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে। তিন-চার দিনের মতো চিঁড়া আছে বটে, কিন্তু গুড় একটুও নাই। গুড় ফুরাইয়াছে, কিন্তু গুড়ের লোভে যে লাল পিঁপড়াগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়াছিল, তাহারা এখনো মাচার উপরে ভিড় করিয়া আছে। ওদের হতাশার জ্বালা ভিখুই অবিরত ভোগ করিতেছে সর্বাঙ্গে।

মনে মনে পেহ্লাদের মৃত্যু কামনা করিতে করিতে ভিখু তবু বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল। যেদিন পেহ্লাদের আসিবার কথা, সেদিন সকালে কলশির জলটাও তাহার

ফুরাইয়া গেল। বিকাল পর্যন্ত পেহ্লাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া তৃষ্ণার পীড়ন আর সহিতে না পারিয়া কলশিটা লইয়া সে যে কত কষ্টে খানিক দূরের নালা হইতে আধ কলশি জল ভরিয়া আনিয়া আবার মাচায় উঠিল তাহার বর্ণনা হয় না। অসহ্য ক্ষুধা পাইলে চিঁড়া চিবাইয়া সে পেট ভরাইল। একহাতে ক্রমাগত পোকা ও পিঁপড়াগুলি টিপিয়া মারিল। বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া জোঁক ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চারিদিকে লাগাইয়া দিল। সবুজ রঙের একটা সাপকে একবার মাথার কাছে সিনজুরি গাছের পাতার ফাঁকে উঁকি দিতে দেখিয়া পুরা দু'ঘণ্টা লাঠি হাতে সেদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার পর দু-এক ঘণ্টা অন্তরই চারিদিকের ঝোপে ঝপাঝপ লাঠির বাড়ি দিয়া মুখে যথাসাধ্য শব্দ করিয়া সাপ তাড়াইতে লাগিল।

মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায়, মানুষ সে, বাঁচিবেই।

পেহ্লাদ গ্রামান্তরে কুটুমবাড়ি গিয়াছিল। পরদিনও সে আসিল না। কুটুমবাড়ির বিবাহোৎসবে তাড়ি টানিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া রহিল। বনের মধ্যে ভিখু কিভাবে দিন রাত্রি কাটাইতেছে, তিন দিনের মধ্যে সে কথা একবার তাহার মনেও পড়িল না।

ইতিমধ্যে ভিখুর ঘা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। শরীরও তাহার অল্প অল্প ফুলিয়াছে। জ্বরটা একটু কমিয়াছে বটে, কিন্তু সর্বাঙ্গের অসহ্য বেদনা দম-ছুটানো তাড়ির নেশার মতই ভিখুকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সে আর এখন ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিতে পারে না। জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কচি পটোলের মতো ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নীচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না। পায়ের ধাক্কায় জলের কলশিটা একসময় নীচে পড়িয়া ভাঙিয়া যায়, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া পুঁটুলির মধ্যে চিঁড়াগুলি পচিতে আরম্ভ করে, রাত্রে তাহার ঘায়ের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাচার আশেপাশে শিয়াল ঘুরিয়া বেড়ায়।

কুটুমবাড়ি হইতে ফিরিয়া বিকালের দিকে ভিখুর খবর লইতে গিয়া ব্যাপার দেখিয়া পেহ্লাদ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। ভিখুর জন্য এক বাটি ভাত ও কয়েকটা পুঁটি-মাছ ভাজা আর একটু পুঁই-চচ্চড়ি সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিখুর কাছে বসিয়া থাকিয়া ওগুলি সে নিজেই খাইয়া ফেলিল। তারপর বাড়ি গিয়া বাঁশের একটা ছোট মই এবং তাহার বোনাই ভরতকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মইয়ে শোয়াইয়া তাহারা দুজনে ভিখুকে বাড়ি লইয়া গেল। ঘরের মাচার উপরে খড় বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল।

আর এমনি শক্ত প্রাণ ভিখুর যে, শুধু এই আশ্রয়টুকু পাইয়াই বিনা চিকিৎসায় ও একরকম বিনা যত্নেই একমাস মুমূর্ষু অবস্থায় কাটাইয়া সে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মরণকে জয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু ডান হাতটি তাহার আর ভালো হইল না। গাছের মরা ডালের মতো শুকাইয়া গিয়া অবশ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। প্রথমে অতি কষ্টে হাতটা সে একটু নাড়িতে পারিত কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমতাটুকুও তাহার নষ্ট হইয়া গেল।

কাঁধের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর বাড়িতে বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত না থাকিলে

ভিখু তাহার একটি মাত্র হাতের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে বাঁশের মই বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল এবং একদিন সন্ধ্যার সময় এক কাণ্ড করিয়া বসিল।

পেহ্লাদ সেসময় বাড়ি ছিল না, ভরতের সঙ্গে তাড়ি গিলিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। পেহ্লাদের বোন গিয়াছিল ঘাটে। পেহ্লাদের বউ ছেলেকে ঘরে শোয়াইতে আসিয়া ভিখুর চাহনি দেখিয়া তাড়াতাড়ি পালাইয়া যাইতেছিল, ভিখু তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু পেহ্লাদের বউ বাগদির মেয়ে। দুর্বল শরীরে বাঁ হাতে তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ নয়। এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া সে গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল। পেহ্লাদ বাড়ি ফিরিলে সব বলিয়া দিল।

তাড়ির নেশায় পেহ্লাদের মনে হইল, এমন নেমকহারাম মানুষটাকে একেবারে খুন করিয়া ফেলাই কর্তব্য। হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটা বউয়ের পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিয়া ভিখুর মাথা ফাটাইতে গিয়া নেশার মধ্যেও কিন্তু টের পাইতে বাকি রহিল না যে কাজটি যত বড় কর্তব্যই হোক, সম্ভব একেবারেই নয়। ভিখু তাহার ধারালো দা-টি বাঁ হাতে শক্ত করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া আছে। সুতরাং খুনোখুনির পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে অশ্লীল কথার আদানপ্রদান হইয়া গেল।

শেষে পেহ্লাদ বলিল, 'তোর লাইগ্যা আমার সাত টাকা খরচ গেছে, টাকাটা দে, দিয়া বাইর' আমার বাড়ির থেইকা,—দূর হ।'

ভিখু বলিল, 'আমার কোমরে একটা বাজু বাইন্ধা রাখছিলাম, তুই চুরি করছস। আগে আমার বাজু ফিরাইয়া দে, তবে যামু।'

'তোর বাজুর খপর জানে কেডা রে?'

'বাজু দে কইলাম পেহ্লাদ ভাল চাস ত! বাজু না দিলি সা-বাড়ির মেজোকত্তার মতো গলাডা তোর একখান কোপেই দুই ফাঁক কইরা ফেলুম, এই তোরে আমি কইয়া রাখলাম। বাজু পালি আমি অখনি যামু গিয়া।' কিন্তু বাজু ভিখু ফেরত পাইল না। তাহাদের বিবাদের মধ্যে ভরত আসিয়া পড়ায় দুজনে মিলিয়া ভিখুকে তাহারা কায়দা করিয়া ফেলিল। পেহ্লাদের বাহুমূলে একটা কামড় বসাইয়া দেওয়া ছাড়া দুর্বল ও পঙ্গু ভিখু আর বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। পেহ্লাদ ও তাহার বোনাই তাহাকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া ফেলিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিল। ভিখুর শুকাইয়া আসা ঘা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল, হাত দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ধুঁকিতে ধুঁকিতে সে চলিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে সে কোথায় গেল কেহই তাহা জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু দুপুররাতে পেহ্লাদের ঘর জ্বলিয়া উঠিয়া বাগদিপাড়ায় বিষম হইচই বাধাইয়া দিল।

পেহ্লাদ কপাল চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'হায় সব্বনাশ হায় সব্বনাশ! ঘরকে আমার শনি আইছিলো গো, হায় সর্ব্বনাশ!'

কিন্তু পুলিশের টানাটানির ভয়ে মুখ ফুটিয়া বেচারি ভিখুর নামটা পর্যন্ত করিতে পারিল না।

সেই রাত্রি হইতে ভিখুর আদিম, অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। চিতলপুরের পাশে একটা নদী আছে। পেহ্লাদের ঘরে আগুন দিয়া আসিয়া একটা জেলেডিঙ্গি চুরি করিয়া ভিখু নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। লগি ঠেলিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, একটা চ্যাপটা

বাঁশকে হালের মতো করিয়া ধরিয়া রাখিয়া সে সমস্ত রাত কোনরকমে নৌকার মুখ সিধা রাখিয়াছিল। সকাল হওয়ার আগে শুধু স্রোতের টানে সে বেশি দূর আগাইতে পারে নাই।

ভিখুর মনে আশঙ্কা ছিল ঘরে আগুন দেওয়ার শোধ লইতে পেহ্লাদ হয়তো তাহার নামটা প্রকাশ করিয়া দিবে, মনের জ্বালায় নিজের অসুবিধার কথাটা ভাবিবে না। পুলিশ বহুদিন যাবৎ তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, বৈকুণ্ঠ সাহার বাড়িতে খুনটা হওয়ার ফলে চেষ্টা তাহাদের বাড়িয়াছে বই কমে নাই। পেহ্লাদের কাছে খবর পাইলে পুলিশ আশেপাশে চারিদিকেই তাহার খোঁজ করিবে। বিশ-ত্রিশ মাইলের মধ্যে লোকালয়ে মুখ দেখানো তাহার পক্ষে বিপদের কথা। কিন্তু ভিখু তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কাল বিকাল হইতে সে কিছু খায় নাই। দুজন জোয়ান মানুষের হাতে বেদম মার খাইয়া এখনো দুর্বল শরীরটা তাহার ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া আছে। ভোর-ভোর মহকুমা শহরের ঘাটের সামনে পৌঁছিয়া সে ঘাটে নৌকা লাগাইল। নদীর জলে ডুবিয়া ডুবিয়া স্নান করিয়া গায়ের রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া শহরের ভিতরে প্রবেশ করিল। ক্ষুধায় সে চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল। একটি পয়সাও তাহার সঙ্গে নাই সে মুড়ি কিনিয়া খায়। বাজারের রাস্তায় প্রথম যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হইল, তাহারই সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল, 'দুটো পয়সা দিবান কত্তা?'

তাহার মাথার জটবাঁধা চাপ চাপ রুক্ষ ধূসর চুল, কোমরে জড়ানো মাটির মতো ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া, আর দড়ির মতো শীর্ণ দোদুল্যমান হাতটি দেখিয়া ভদ্রলোকটির বুঝি দয়াই হইল। তিনি তাহাকে একটি পয়সা দান করিলেন।

ভিখু বলিল—'একটা দিলেন বাবু? আর একটা দেন।'

ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন—'একটা দিলাম তাতে হল না—ভাগ্‌!'

এক মুহূর্তের জন্য মনে হইল ভিখু বুঝি তাঁহাকে একটা বিশ্রী গালই দিয়া বসে! কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিল। গাল দেওয়ার বদলে আরক্ত চোখে তাহার দিকে একবার কটমট করিয়া তাকাইয়া সামনের মুড়ি মুড়কির দোকানে গিয়া পয়সাটা দিয়া মুড়ি কিনিয়া গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল।

সেই হইল তাহার ভিক্ষা করিবার হাতেখড়ি।

কয়েক দিনের ভিতরেই সে পৃথিবীর বহু পুরাতন ব্যবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইনকানুন সব শিখিয়া ফেলিল। আবেদনের ভঙ্গি ও ভাষা তাহার জন্ম-ভিখারির মতো আয়ত্ত হইয়া গেল। শরীর এখন আর সে একেবারেই সাফ করে না, মাথার চুল তাহার ক্রমেই জট বাঁধিয়া বাঁধিয়া দলা দলা হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেকগুলি উকুন-পরিবার দিনের পর দিন বংশবৃদ্ধি করিয়া চলে। ভিখু মাঝে মাঝে খ্যাপার মতো দুই হাতে মাথা চুলকায়, কিন্তু বাড়তি চুল কাটিয়া ফেলিতে ভরসা পায় না। ভিক্ষা করিয়া সে একটি ছেঁড়া কোট পাইয়াছে, কাঁধের ক্ষতচিহ্নটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য দারুণ গুমোটের সময়েও কোটটি সে গায়ে চাপাইয়া রাখে। শুকনো হাতখানা তাহার ব্যবসার সবচেয়ে জোরালো বিজ্ঞাপন, এই অঙ্গটি ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না। কোটের ডানদিকের হাতাটি সে তাই বগলের কাছ হইতে ছিঁড়িয়া বাদ দিয়াছে। একটি টিনের মগ ও একটা লাঠিও সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের কাছে রাস্তার ধারে একটা তেঁতুল গাছের নীচে

বসিয়া সে ভিক্ষা করে। সকালে এক পয়সার মুড়ি খাইয়া নেয়, দুপুরে বাজারের খানিক তফাতে একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া বটগাছের নীচে ইঁটের উনুনে মেটে হাঁড়িতে ভাত রান্না করে, মাটির মালসায় কোনদিন রাঁধে ছোট মাছ, কোনদিন তরকারি। পেট ভরিয়া খাইয়া বটগাছটাতেই হেলান দিয়া বসিয়া আরামে বিড়ি টানে। তারপর আবার তেঁতুলগাছটার নীচে গিয়া বসে।

সারাটা দিন শ্বাস-টানা কাতরানির সঙ্গে সে বলিয়া যায়ঃ হেই বাবা একটা পয়সাঃ আমায় দিলে ভগবান দিবো, হেই বাবা একটা পয়সা—

অনেক প্রাচীন বুলির মতো 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' শ্লোকটা আসলে অসত্য। সারাদিনে ভিখুর সামনে দিয়া হাজার দেড়-হাজার লোক যাতায়াত করে এবং গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনের মধ্যে একজন তাহাকে পয়সা অথবা আধলা দেয়। আধলার সংখ্যা বেশি হইলে সারাদিনে ভিখুর পাঁচ-ছ আনা রোজগার হয়, কিন্তু সাধারণত তাহার উপার্জন আট আনার কাছাকাছি থাকে। সপ্তাহে এখানে দুদিন হাট বসে। হাটবারের উপার্জন তাহার একটি পুরা টাকার নীচে নামে না।

এখন বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। নদীর দু-তীর কাশে সাদা হইয়া উঠিয়াছে। নদীর কাছেই বিন্নু মাঝির বাড়ির পাশের ভাঙা চালাটা ভিখু মাসিক আট আনায় ভাড়া করিয়াছে। রাত্রে সে ওইখানেই শুইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ায় মৃত এক ব্যক্তির জীর্ণ কিন্তু পুরু একটি কাঁথা সে সংগ্রহ করিয়াছে, লোকের বাড়ির খড়ের গাদা হইতে চুরি করিয়া আনা খড় বিছাইয়া তাহার উপর কাঁথাটি পাতিয়া সে আরাম করিয়া ঘুমায়। মাঝে মাঝে শহরের ভিতরে গৃহস্থবাড়িতে ভিক্ষা করিতে গিয়া সে কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড় পাইয়াছে। তাই পুঁটুলি করিয়া বালিশের মতো ব্যবহার করে। রাত্রে নদীর জোলো বাতাসে শীত করিতে থাকিলে পুঁটুলি খুলিয়া একটি কাপড় গায়ে জড়াইয়া লয়।

সুখে থাকিয়া এবং পেট ভরিয়া খাইয়া কিছুদিনের মধ্যে ভিখুর দেহে পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। তাহার ছাতি ফুলিয়া উঠিল, প্রত্যেকটি অঙ্গসঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংসপেশি নাচিয়া উঠিতে লাগিল। অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তাহার মেজাজ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। অভ্যস্ত বুলি আওড়াইয়া কাতরভাবেই সে এখনো ভিক্ষা চায়, কিন্তু ভিক্ষা না পাইলে তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না। পথে লোকজন না থাকিলে তাহার প্রতি উদাসীন পথিককে সে অশ্লীল গাল দিয়া বসে। এক পয়সার জিনিস কিনিয়া ফাউ না পাইলে দোকানিকে মারিতে উঠে। নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুশি হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না, দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে।

রাত্রে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে।

নারীসঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তাহার ভালো লাগে না। অতীতের উদ্দাম ঘটনাবহুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে।

তাড়ির দোকানে ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি গিলিয়া সে হল্লা করিত, টলিতে টলিতে বাসির ঘরে গিয়া উন্মত্ত রাত্রি যাপন করিত আর মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ি

চড়াও হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয়া টাকা ও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত। স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে বাঁধিয়া মারিলে তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত, পুত্রের অঙ্গ হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিলে মা যেমন করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত, মশালের আলোয় সে দৃশ্য দেখা আর আর্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদনাকর নেশা আর কি আছে? পুলিশের ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইয়া বেড়াইয়া আর বনজঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াও যেন তখন সুখী ছিল। তাহার দলের অনেকেই বার বার ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়াছে, কিন্তু জীবনে একবারের বেশি পুলিশ তাহার নাগাল পায় নাই। রাখু বাগদির সঙ্গে পাহানার শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনটাকে যেবার সে চুরি করিয়াছিল, সেইবার। সাত বছরের জন্য তাহার কয়েদ হইয়াছিল, কিন্তু দুবছরের বেশি কেহ তাহাকে জেলে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক বর্ষার সন্ধ্যায় জেলের প্রাচীর ডিঙাইয়া সে পলাইয়াছিল। তারপর একা সে গৃহস্থবাড়িতে ঘরের বেড়া কাটিয়া চুরি করিয়াছে, দিনে দুপুরে পুকুরঘাটে একাকিনী গৃহস্থ বধূর মুখ চাপিয়া গলার হার, হাতের বালা খুলিয়া লইয়াছে, রাখুর বউকে সঙ্গে নিয়া নোয়াখালি হইয়া সমুদ্র ডিঙাইয়া পাড়ি দিয়াছে একেবারে হাতিয়ায়। ছমাস পরে রাখুর বউকে হাতিয়ায় ফেলিয়া আসিয়া পর পর তিনবার তিনটা দল করিয়া দূরে দূরে কত গ্রামে যে ডাকাতি করিয়া বেড়াইয়াছে, তাহার সবগুলির নামও এখন তাহার স্মরণ নাই। তারপর এই সেদিন বৈকুণ্ঠ সাহার মেজ ভাইটার গলাটা সে দা-এর এক কোপে দুফাঁক করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

কী জীবন তাহার ছিল, এখন কী হইয়াছে!

মানুষ খুন করিতে যাহার ভালো লাগিত, সে আজ ভিক্ষা না দিয়া চলিয়া গেলে পথচারীকে একটু টিটকারি দেওয়ার মধ্যে মনের জ্বালা নিঃশেষ করে। দেহের শক্তি তাহার এখনো তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সে শক্তি প্রয়োগ করিবার উপায়টাই তাহার নাই। কত দোকানে গভীর রাত্রে সামনে টাকার থোক সাজাইয়া একা বসিয়া দোকানি হিসাব মেলায়, বিদেশগত কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা থাকে একা। এদিকে, ধারালো একটা অস্ত্র হাতে ওদের সামনে হুমকি দিয়া পড়িয়া একদিনে বড়লোক হওয়ার পরিবর্তে বিষ্ণু মাঝির চালাটার নীচে সে চুপচাপ শুইয়া থাকে।

ডান হাতটাতে অন্ধকারে হাত বুলাইয়া ভিখুর আপশোশের সীমা থাকে না। সংসারের অসংখ্য ভীরু ও দুর্বল নরনারীর মধ্যে এতবড় বুকের পাটা আর এমন একটা জোরালো শরীর নিয়া শুধু একটা হাতের অভাবে সে যে মরিয়া আছে। এমন কপালও মানুষের হয়?

তবু এ দুর্ভাগ্য সে সহ্য করিতে পারে। আপশোশেই নিবৃত্তি। একা ভিখু আর থাকিতে পারে না।

বাজারে ঢুকিবার মুখেই একটি ভিখারিনি ভিক্ষা করিতে বসে। বয়স তাহার বেশি নয়, দেহের বাঁধুনিও বেশ আছে। কিন্তু একটা পায়ে হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।

এই ঘায়ের জোরে সে ভিখুর চেয়ে বেশি রোজগার করে। সেজন্য ঘা-টিকে সে বিশেষ যত্নে সারিতে দেয় না।

ভিখু মধ্যে মধ্যে গিয়া তাহার কাছে বসে। বলে, 'ঘা-টি সারবো না, লয়?'

ভিখারিনি বলে, 'খুব! অসুদ দিলে অখনি সারে।'

ভিখু সাগ্রহে বলে, 'সারা তবে, অসুদ দিয়া চটপট সারাইয়া ল। ঘা-টি সারলে তোর আর ভিক্ মাগতি অইবো না,—জানস্? আমি তোরে রাখুম।'

'আমি থাকলি ত।'

'ক্যান? থাকবি না ক্যান? খাওয়ামু, পরামু, আরামে রাখুম, পায়ের পর নি পা-টি দিয়া গাঁট হইয়া বইয়া থাকবি। না করস্ তুই কিয়ের লেগে?'

অত সহজে ভুলিবার মেয়ে ভিখারিনি নয়। খানিকটা তামাকপাতা মুখে গুঁজিয়া সে বলে, 'দুদিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘা-টি মুই তখন পামু কোয়ানে?'

ভিখু আজীবন একনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা করে, সুখে রাখিবার লোভ দেখায়। কিন্তু ভিখারিনি কোনমতেই রাজি হয় না। ভিখু ক্ষুণ্নমনে ফিরিয়া আসে।

এদিকে আকাশে চাঁদ ওঠে, নদীতে জোয়ার ভাঁটা হয়, শীতের আমেজে বায়ুস্তরে মাদকতা দেখা দেয়। ভিখুর চালার পাশে কলাবাগানে চাঁপাকলার কাঁদি শেষ হইয়া আসে। বিন্নু মাঝি কলা বিক্রির পয়সায় বউকে রূপার গোট কিনিয়া দেয়। তালের রসের মধ্যে নেশা ক্রমেই ঘোরালো ও জমাট হইয়া ওঠে। ভিখুর প্রেমের উত্তাপে ঘৃণা উবিয়া যায়। নিজেকে সে আর সামলাইয়া রাখিতে পারে না।

একদিন সকালে উঠিয়াই সে ভিখারিনির কাছে যায়। বলে, 'অইচ্ছা, ল, ঘা লইয়াই চল্।'

ভিখারিনী বলে, 'আগে আইবার পার নাই? যা, অখন মর গিয়া, আখার তলের ছালি খা গিয়া।'

'ক্যান? ছালি খাওনের কথাডা কী?'

'তোর লাইগা হাঁ কইরা বইসা আছি ভাবছস তুই, বটে? আমি উই উয়ার সাথে রইছি।'

ওদিকে তাকাইয়া ভিখু দেখিতে পায় তাহারই মতো জোয়ান দাড়িওলা এক খঞ্জ ভিখারি খানিক তফাতে আসন করিয়াছে। তাহার ডান হাতটির মতো ওর একটি পা হাঁটুর নীচে শুকাইয়া গিয়াছে, বিশেষ যত্নসহকারে এই অংশটুকু সামনে মেলিয়া রাখিয়া সে আল্লার নামে সকলের দয়া প্রার্থনা করিতেছে।

পাশে পড়িয়া আছে কাঠের একটা কৃত্রিম হ্রস্ব পা।

ভিখারিনি আবার বলিল—'বসস্ যে? যা পালইয়া যা, দেখলি খুন কইরা ফেলাইবো কইয়া দিলাম।'

ভিখু বলে, 'আরে থো, খুন অমন সব হালাই করতিছে! উয়ার মতো দশটা মাইন্ষেরে আমি একা ঘায়েল কইরা দিবার পার্তাম, তা জানস্?'

ভিখারিনি বলে, 'পারস্ তো যা না, উয়ার সাথে লাগ না গিয়া। আমার কাছে কী?'

'উয়াকে তুই ছাড়ান দে। আমার কাছে চ।'

'ইরে সোনা! তামুক খাবা? ঘা দেইখা পিছাইছিলি, তোর লগে আর খাতির কিরে হালার পুত? উয়ারে ছাড়ুম ক্যান? উয়ার মতো কামাস তুই? ঘর আছে তোর? ভাগবি তো ভাগ, নাইলে গাল দিমু কইলাম।'

ভিখু তখনকার মতো প্রস্থান করে কিন্তু হাল ছাড়ে না। ভিখারিনিকে একা দেখিলেই কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়া বলে, 'তোর নামটো কী র‍্যা?'

এমনই তাহারা পরিচয়হীন যে, এতকাল পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও তাহারা বোধ করে নাই।

ভিখারিনী কালো দাঁতের ফাঁকে হাসে।

'ফের লাগতে আইছস্? হোই ও বুড়ির কাছে যা।' ভিখু তাহার কাছে উবু হইয়া বসে। পয়সার বদলে অনেকে চাল ভিক্ষা দেয় বলিয়া আজকাল সে কাঁধে একটা ঝুলি ঝুলাইয়া বেড়ায়। ঝুলির ভিতর হইতে একটা প্রকাণ্ড মর্তমান কলা বাহির করিয়া ভিখারিনির সামনে রাখিয়া বলে, 'খা। তোর লেগে চুরি কইরা আনছি।'

ভিখারিনি তৎক্ষণাৎ খোসা ছাড়াইয়া প্রেমিকের দান আত্মসাৎ করে। খুশি হইয়া বলে, 'নাম শুনবার চাস? পাঁচী কয় মোরে,—পাঁচী। তুই কলা দিছস, নাম কইলাম, এবারে ভাগ।'

ভিখু উঠিবার নাম করে না। অতবড় একটা কলা দিয়া শুধু নাম শুনিয়া খুশি হওয়ার মতো শৌখিন সে নয়। যতক্ষণ পারে ধূলার উপর উবু হইয়া বসিয়া পাঁচীর সঙ্গে সে আলাপ করে। ওদের স্তরে নামিয়া না গেলে সে আলাপকে কেহ আলাপ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। মনে হইবে পরস্পরকে তাহারা যেন গাল দিতেছে! পাঁচীর সঙ্গীটির নাম বসির। তাহার সঙ্গেও সে একদিন আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল।

'সেলাম মিয়া।'

বসির বলিল, 'ইদিকে ঘুরাফিরা কি জন্যি? সেলাম মিয়া হতিছে! লাঠির একঘায়ে শিরটি ছেঁচ্যা দিমু নে।'

দুজনে খুব খানিকটা গালাগালি হইয়া গেল। ভিখুর হাতে লাঠি ও বসিরের হাতে মস্ত একটা পাথর থাকায় মারামারিটা আর হইল না।

নিজের তেঁতুলগাছের তলায় ফিরিয়া যাওয়ার আগে ভিখু বলিল, 'র, তোরে নিপাত করতেছি।'

বসির বলিল, 'ফের উয়ার সাথে বাতচিত করলি জানে মাইরা দিমু, আল্লার কিরে।'

এই সময় ভিখুর উপার্জন কমিয়া আসিল।

পথ দিয়া প্রত্যহ নূতন নূতন লোক যাতায়াত করে না। একেবারে প্রথমবারের জন্য যাহারা পথটি ব্যবহার করে, দৈনন্দিন পথিকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা দুই মাসের ভিতরেই মুষ্টিমেয় হইয়া আসে। ভিখুকে একবার যাহারা একটি পয়সা দিয়াছে, পুনরায় তাহাকেই দান করিবার প্রয়োজন তাহাদের অনেকেই বোধ করে না। সংসারে ভিখারির অভাব নাই।

কোন রকমে ভিখুর পেট চলিতে লাগিল। হাটবার ছাড়া রোজগারের একটি পয়সাও সে বাঁচাইতে পারিল না। সে ভাবনায় পড়িয়া গেল।

শীত পড়িলে খোলা চালের নীচে থাকা কষ্টকর হইবে। যেখানে হোক চারিদিক ঘেরা যেমন-তেমন ঘর একখানা তাহার চাই। মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁই আর দুবেলা খাইতে না পাইলে কোনো যুবতী ভিখারিনিই তাহার সঙ্গে বাস করিতে রাজি হইবে না। অথচ উপার্জন তাহার যেভাবে কমিয়া আসিতেছে, এভাবে কমিতে থাকিলে শীতকালে নিজেই হয়তো সে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে না।

যেভাবেই হোক আয় তাহাকে বাড়াইতেই হইবে।

এখানে থাকিয়া আয় বাড়াইবার কোনো উপায়ই সে দেখিতে পায় না। চুরি-ডাকাতির উপায় নাই, মজুর খাটিবার উপায় নাই, একেবারে খুন করিয়া না ফেলিলে কাহারও কাছে অর্থ ছিনাইয়া লওয়া একহাতে সম্ভব নয়। পাঁচীকে ফেলিয়া এই শহর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না। আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহার চালার পাশে বিন্নু মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটা তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয়। এক-এক দিন বিন্নুর ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য মন ছটফট করিয়া ওঠে। নদীর ধারে খ্যাপার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে মাঝে মাঝে তাহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।

আরও কিছুকাল ভিখু এমনি অসন্তোষের মধ্যে কাটাইয়া দিল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে ঝুলির মধ্যে তাহার সমস্ত মূল্যবান জিনিস ভরিয়া জমানো টাকা ক'টি কোমরের কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ভিখু তাহার চালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে একদিন সে হাতখানেক লম্বা একটা লোহার শিক কুড়াইয়া পাইয়াছিল। অবসর মতো পাথরে ঘষিয়া ঘষিয়া শিকটির একটা মুখ সে চোখা করিয়াছে। এই অস্ত্রটিও সে ঝুলির মধ্যে ভরিয়া সঙ্গে লইল।

অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশভরা তারা তখন ঝিকমিক করিতেছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। বহুকাল পরে মধ্যরাত্রির জনহীন জগতে মনের মধ্যে ভয়ানক একটা কল্পনা নিয়া বিচরণ করিতে বাহির হইয়া ভিখুর সহসা অকথনীয় উল্লাস বোধ হইল। নিজের মনে অস্ফুটস্বরে সে বলিয়া উঠিল, 'বাঁ-টি লইয়া ডানটিরে যদি রেহাই দিতা ভগমান!'

নদীর ধারে ধারে আধমাইল হাঁটিয়া গিয়া একটি সংকীর্ণ পথ দিয়া সে শহরে প্রবেশ করিল। বাজার বাঁ-হাতি রাখিয়া ঘুমন্ত শহরের বুকে ছোটো ছোটো অলিগলি দিয়া শহরের অপর প্রান্তে গিয়া পৌছিল। শহরে যাওয়ার পাকা রাস্তাটি এখান দিয়া শহর হইতে বাহির হইয়াছে। নদী ঘুরিয়া আসিয়া দু-মাইল তফাত এই রাস্তারই পাশে পাশে মাইল খানেক রহিয়া গিয়া আবার দক্ষিণে দিক পরিবর্তন করিয়াছে।

কিছুদূর পর্যন্ত রাস্তার দুদিকে ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি বাড়ি চোখে পড়ে। তারপর ধানের খেত ও মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ডাঙ্গার দেখা পাওয়া যায়। এমনি একটা জঙ্গলের ধারে খানিকটা জমি সাফ করিয়া পাঁচ-সাতখানা কুঁড়ে তুলিয়া কয়েকটা হতভাগা মানুষ একটি দরিদ্রতম পল্লি স্থাপিত করিয়াছে। তার মধ্যে একটি কুঁড়ে বসিরের। ভোরে উঠিয়া ঠকঠক শব্দে কাঠের পা ফেলিয়া সে শহরে ভিক্ষা করিতে যায়, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। পাঁচী গাছের পাতা জ্বালাইয়া ভাত রাঁধে, বসির টানে তামাক। রাত্রে পাঁচী পায়ের ঘায়ে ন্যাকড়ার পটি জড়ায়। বাঁশের খাটে পাশাপাশি শুইয়া তাহাদের কাটা কাটা কদর্য ভাষায় গল্প করিতে করিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে। তাহাদের নীড়, তাহাদের শয্যা ও তাহাদের দেহ হইতে একটা ভাপসা পচা দুর্গন্ধ উঠিয়া খড়ের চালের ফুটা দিয়া বাহিরের বাতাসে মিশিতে থাকে।

ঘুমের ঘোরে বসির নাক ডাকায়। পাঁচী বিড়বিড় করিয়া বকে।

ভিখু একদিন ওদের পিছু পিছু আসিয়া ঘর দেখিয়া গিয়াছিল। অন্ধকারে সাবধানে ঘরের পিছনে গিয়া বেড়ার ফাঁকে কান পাতিয়া সে কিছুক্ষণ কচুবনের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ঘুরিয়া ঘরের সামনে আসিল। ভিখারির কুঁড়ে, দরজার ঝাঁপটি পাঁচী ভিতর হইতে বন্ধ করে নাই, শুধু ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ঝাঁপটা সন্তর্পণে একপাশে সরাইয়া দিয়া ঝুলির ভিতর হইতে শিকটি বাহির করিয়া শক্ত করিয়া ধরিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে তারার আলো ছিল, ঘরের ভিতরে সেটুকু আলোরও অভাব। দেশলাই জ্বালিবার অতিরিক্ত হাত নাই ; ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভিখু ভাবিয়া দেখিল, বসিরের হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থানটি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বাঁ হাতের আঘাত, ঠিক জায়গা মতো না পড়িলে বসির গোলমাল করিবার সুযোগ পাইবে। তাহাতে মুশকিল অনেক।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বসিরের শিয়রের কাছে সরিয়া গিয়া একটিমাত্র আঘাতে ঘুমন্ত লোকটার তালুর মধ্যে শিকের চোখা দিকটা সে প্রায় তিন আঙুল ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। অন্ধকারে আঘাত কতদূর মারাত্মক হইয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। শিকটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছে টের পাইয়াও ভিখু তাই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। একহাতে সবলে বসিরের গলা চাপিয়া ধরিল।

পাঁচীকে বলিল, 'চুপ থাক, চিল্লাবি তো তোরেও মাইরা ফেলামু।'

পাঁচী চেঁচাইল না, ভয়ে গোঙাইতে লাগিল।

ভিখু তখন আবার বলিল, 'একটুকু আওয়াজ লয়, ভালা চাস ত একদম চুপ মাইরা থাক।'

বসির নিস্পন্দ হইয়া গেলে ভিখু তাহার গলা হইতে হাত সরাইয়া নিল।

দম নিয়া বলিল, 'আলোটা জ্বাইলা দে পাঁচী।'

পাঁচী আলো জ্বালিলে ভিখু পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিজের কীর্তি চাহিয়া দেখিল। একটিমাত্র হাতের সাহায্যে অমন জোয়ান মানুষটাকে ঘায়েল করিয়া গর্বের তাহার সীমা ছিল না। পাঁচীর দিকে তাকাইয়া সে বলিল, 'দেখছস? কেডা কারে খুন করল দেখছস? তখন পইপই কইরা কইলাম, মিয়াবাই ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাইবার লারবা গো, ছাড়ান দেও। শুইন্যা মিয়াবায়ের অইল গোসা। কয় কিনা, শির ছেঁচ্চ্যা দিমু! দেন গো দেন, শিরটা আমার ছেঁচ্চাই দেন মিয়াবাই—' বসিরের মৃতদেহের সামনে ব্যঙ্গভরে মাথাটা একবার নত করিয়া ভিখু মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'ঠ্যারাইন বোবা ক্যান গো? আরে কথা ক হাড়হাবাইতা মাইয়া! তোরেও দিমু নাকি সাবাড় কইরা,—অ্যাঁ?'

পাঁচী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'ইবারে কী করবি?'

'দ্যাখ কী করি। পয়সাকড়ি কনে গুইনা রাখছে, আগে তাই ক।'

বসিরের গোপন সঞ্চয়ের স্থানটি পাঁচী অনেক কষ্টে আবিষ্কার করিয়াছিল। ভিখুর কাছে প্রথমে সে অজ্ঞতার ভান করিল। কিন্তু ভিখু আসিয়া চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিলে প্রকাশ করিতে পথ পাইল না।

বসিরের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় কম নয়, টাকায় আধুলিতে একশত টাকার উপর। একটা মানুষকে হত্যা করিয়া ভিখু পূর্বে ইহার চেয়ে বেশি উপার্জন করিয়াছে। তবু সে খুশি হইল।

বলিল, 'কি কি নিবি পুঁটলি বাঁইধা ফ্যালা পাঁচী। তারপর ল' রাইত থাকতে মেলা করি। খানিক বাদে নওমির চান্দ উঠবো, আলোয় আলোয় পথটুকু পার হমু।'

পাঁচী পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল, 'অখনই চান্দ উটবো পাঁচী।'

পাঁচী বলিল, 'আমরা যামু কনে?'

'সদর। ঘাটে নাও চুরি করুম। বিয়ানে ছিপতিপুরের সামনে জংলার মদ্যি ঢুইকা থাকুম, রাইতে একদম সদর। পা চালাইয়া চ পাঁচী, এক কোশ পথ হাঁটন লাগব।'

পায়ের ঘা নিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা একসময় দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, 'পায়ে নি তুই ব্যথা পাস পাঁচী?'

'হ, ব্যথা জানায়।'

'পিঠে চাপামু?'

'পারবি ক্যান?'

'পারুম আয়।'

ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথের দুদিকে ধানের খেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল, এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না।

সরীসৃপ

চারিদিকে বাগান, মাঝখানে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। জমি কিনিয়া বাড়িটি তৈরি করিতে চারুর শ্বশুরের লাখ টাকার উপর খরচ হইয়াছিল। কিন্তু মোটে তিরিশ হাজার টাকার দেনার দায়ে এই সম্পত্তি চারুর হাত হইতে খসিয়া বনমালির হাতে চলিয়া গিয়াছে।

প্রথম বয়সে চারু তার টনটনে বুদ্ধির সাহায্যে শ্বশুরের সম্পত্তির এমন চমৎকার বিলিব্যবস্থাই করিয়াছিল যে, আত্মীয়-পর কেহ কোনোদিন কোনো দিক দিয়া তাহার একটি পয়সা অপচয় করিতে পারে নাই। কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্নতা ও বিকারহীনতা বজায় রাখিতে চারুর তিনটি বিশেষ অসুবিধা ছিল। প্রথমত, আজীবন তাহাকে স্ত্রীলোক হইয়াই থাকিতে হইল। দ্বিতীয়ত, তাহার আধপাগলা স্বামী বিশ বছরের মধ্যে একদিনও প্রাণত্যাগ করিল না, অথচ এই বিশ বছরে প্রত্যেকটি মুহূর্ত বেশ ভালো মানুষের মতই স্ত্রীর চরিত্রে ভয়ঙ্কর সন্দিহান হইয়া রহিল। তৃতীয়ত, বয়স বাড়ার সঙ্গে চারুর একমাত্র পুত্রটিরও স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশ পাইবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

শেষ জীবনে শ্রান্ত ক্লান্ত ও ভীরুতাগ্রস্ত চারু তাই সম্পত্তির সুব্যবস্থার নামে নানারকম মজা করিতে লাগিল। যেদিকে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই সেদিকে সে তার অতিসাবধানী দৃষ্টিকে ব্যাপৃত রাখিল। আর যেদিকে সর্বনাশের পথ খোলা রহিল, সেদিকটা লাভ করিল তাহার উদাসীনতা ; যাহাকে বিশ্বাস করার কথা, তাহাকে সে করিল একান্তভাবে অবিশ্বাস, আর যাহাকে জেলে দিয়া নিজেকে তাহার বাঁচানোই ছিল উচিত, তাহার মতো বিশ্বাসী লোক সংসারে সে আর দেখিতে পাইল না।

ফলে চারুর যাহা রহিল তাহার নাম কিছুই না থাকা।

কোনো লাভ হোক বা না হোক, সকলের সঙ্গে শুধু গায়ের জ্বালাতেই বিবাদ করিয়া তবে চারু হার মানিয়াছিল। বনমালীর সঙ্গে সে লড়াই করিল, কিন্তু বিবাদ করিল না।

চারুর বিবাহ হয় সতের বৎসর বয়সে। বনমালী তখন পনেরো বৎসরের বালক মাত্র। চারুর শ্বশুর রামতারণ প্রত্যেক শনিবার ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে একটা বাগানবাড়িতে স্ফূর্তি করিতে যাইত। বনমালীর বাবা ছিল তাহার প্রতিবেশী, বন্ধু এবং মোসাহেব। তাহাদের ছোটো দ্বিতল গৃহের সামনে মোটর থামাইয়া রামতারণ বনমালীর বাবাকে মোটরে তুলিয়া লইত। বনমালীকে হাসিয়া বলিত, বউমাকে পাহারা দিস বুনো।

হাসিয়া বলিলেও কথাটা পরিহাস নয়। নিজের পাগল ছেলের বউ বলিয়া নয়, স্ত্রী-জাতির সতীত্বেই রামতারণ অবিশ্বাস করিত। কোথাও যাওয়ার আগে সে তাই বাড়িতে পাহারা রাখিয়া যাইত। কিন্তু রামতারণের বুদ্ধি ছিল। চাকর-দাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ব্যাপারটা প্রকাশ্য করিয়া দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। মোসাহেবের সরল ছেলেটাকে সে তাই বাড়িতে রাখিয়া যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া নানা কৌশলে নিজের অনুপস্থিতির সময়ে চারুর গতিবিধির ইতিহাস জানিয়া লইত। বনমালীর বাবা সবই বুঝিত, কিন্তু কিছু বলিত না। হাঁসিত এবং কর্তব্যে অবহেলা করিয়া রামতারণের বাড়ি ছাড়িয়া মার জন্য মন কেমন

করায় বনমালী নিজের বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল জানিতে পারিলে আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিত।

চারুও বুঝিত। কিন্তু অবুঝের মতো তাহার রাগটা বনমালীর উপরে গিয়া পড়িত না। বনমালীকে সে যত্ন করিয়া খাওয়াইত, সারাদিন তাহার সঙ্গে গল্প করিত এবং রাত্রে নিজের শোবার ঘরের পাশের ঘরখানায় তাহাকে বিছানা করিয়া দিয়া মাঝখানের দরজাটা খোলা রাখিয়া দিত। স্বামী গোলমাল করিলে সভয়ে বলিত, 'চুপ চুপ, বাবার হুকুম।' এবং রামতারণকে তাহার ছেলে এমনই যমের মতো ভয় করিত যে আর কথাটি না কহিয়া সে শান্ত শিশুর মতো ঘুমাইয়া পড়িত।

কয়েক বৎসর পরে রামতারণের মৃত্যুর পর এ ব্যবস্থা রহিত হইয়া গেল বটে কিন্তু বনমালীর যাতায়াত বজায় রহিল। যাতায়াত সে কমাইয়া ফেলিল অনেক বয়সে, শহরের ভিতরে একটা বাড়ি করিয়া উঠিয়া যাইবার পর।

আজ বিপদে পড়িয়া বনমালীকে অতিরিক্ত খাতির করিয়া কোনো সুবিধা আদায় করিবার চেষ্টার মধ্যে নানা কারণে চারুর যথেষ্ঠ লজ্জা ও অপমান ছিল। তবু একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া পাখা হাতে কাছে বসিয়া এমনই উত্তপ্ত সমাদরের সঙ্গেই বনমালীকে সে খাওয়াইতে বসাইল যে, তাহাতে পাষাণও গলিয়া জল হইয়া যায়।

বলিল, 'ভগবান সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন তাই বাগানবাড়ি তোমার কাছে বাঁধা রাখবার কথা মনে হয়েছিল, ভাই। আমার সর্বস্ব গেছে, যাক, কী আর করব ;—সবই মানুষের কপাল। মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু যে রইল, এই আমার ঢের।'

বনমালী একবার মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র। চারুর মাথার চুলের কালিমা ফ্যাকাশে হইয়া আসিয়াছে কেবল এইটুকু লক্ষ করিয়া আবার সে আহারে মন দিল।

আসল ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এইবার একটু মিঠা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিয়া চারু বলিল,—'নিরামিষ কপির ডালনা তোমার বোধহয় ভালো লাগছে না, ভাই?'

'বেশ লাগছে।'

চারুর ছোটবোন পরী একমাসের ছেলে-কোলে কাছে বসিয়া ছিল। এতক্ষণ কথা বলিতে না পারিয়া তার ভালো লাগিতেছিল না। এইবার সুযোগ পাইয়া বলিল, 'এটা কিন্তু আপনি ভদ্রতা করে বললেন বনমালীদাদা। ডালনা নিশ্চয় ভালো হয়নি। দিদিকে কত বললাম, আমি রাঁধি দিদি, আমি রাঁধি। দিদি কি কিছুতে আমাকে রাঁধতে দিলে!'

চারু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিল, 'না রেঁধেছিস বেশ করেছিস বাপু। ওইটুকু ছেলে নিয়ে রান্না করলে খেতে মানুষের ঘেন্না হত না?'

পরী উত্তেজিত হইয়া বলিল, 'ঘেন্না হত! আমার রান্না খেতে বনমালীদাদার ঘেন্না হত, স্বয়ং বিধাতা একথা বললেও আমি বিশ্বাস করিনে দিদি!'

চারু একটু হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা নে, না করিস না করিস, একটু চুপ কর। মানুষের সঙ্গে দুটো কথা বলতে দে।'

'আমিও কথাই বলছি।'

চারু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকাইল। কুড়ি বাইশ হাজার টাকা খরচ করিয়া সে

যে তাহার বিবাহ দিয়াছিল, এমনি রাগের সময় সে কথাটা মনে পড়িয়া আজকাল চারুর মনের মধ্যে খচখচ করিয়া বেঁধে।

পরীর ছেলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দিদি উপস্থিত থাকিতে বনমালীর কাছে আমল পাওয়ার সুবিধা হইবে না টের পাইয়া ছেলেকে শোয়ানোর প্রয়োজনটা এতক্ষণে সে অনুভব করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'অমন করে তাকাচ্ছ কেন দিদি? মুখে কিছু লেগে আছে নাকি আমার?' বলিয়া বনমালীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

চারু বলিল, 'দেখলে ভাই? শুনলে মেয়ের কথাবার্তা? আমি যেন ওর ইয়ার! আর এই সেদিনও কেঁদে কেঁদে আমায় চিঠি লিখেছে, ও দিদি, আমাকে শ' পাঁচেক টাকা পাঠিয়ে দিও দিদি! টাকার বেলা দিদি দিদি, অন্য সময় সে কেউ নয়।'

বনমালী বলিল, 'ছেলেমানুষ, বোঝে না।'

'বোঝে না? হুঁ, কচি খুকি কিনা, বোঝে না! বোঝে সব, সব বুঝেও এমনি করে, এ আর আমি টের পাই নে! দিদির যে আর টাকা নেই, দিদি যে হুট বলতে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দেয়নি।'

বনমালী কিছু বলিল না। চারুও নিজের জ্বালা আর অভিমানে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

উহাদের স্তব্ধতা নিঃসম্পর্কীয়। কারণ, আজ একজন প্রৌঢ়া নারী এবং অপরজন মধ্যবয়সি পাটের দালাল।

খানিক পরে চারু বলিল, 'যা বলছিলাম। ভাগ্যে এই বাড়ি আর বাগান তোমার কাছে বাঁধা রাখার কথা মনে হয়েছিল! টাকা দেবার মেয়াদ পার হয়ে গেছে বলে তুমি অবিশ্যি বাড়িটা নিয়ে নেবে না, কিন্তু আর কারো কাছে বাঁধা রাখলে কী সর্বনাশ হত বল তো!'

'তা বইকি। বাগানবাড়ি পরের হাতে চলে যেত। কিন্তু আমার কাছে বাড়ি তো তুমি বাঁধা রাখোনি চারুদি, বিক্রি করেছিলে।'

'ওমা, সে কি! বাড়ি আমি বিক্রি করলাম কখন?'

বনমালী একটু হাসিয়া বলিল, 'দলিলের নকলটা একবার পড়ে দেখো, তিরিশ হাজার নগদ আর ওই টাকার পাঁচ বছরের সুদের দামে তুমি আমাকে বাড়ি বিক্রি করেছ। বরাবর সুদ দিয়ে এলে বলতে পারতে বাঁধা আছে।'

মুখ পাংশু হইয়া যাওয়াটা চারু সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারিল না। কী বলিবে হঠাৎ সে ভাবিয়া পাইল না। শেষে বলিল, 'তুমি হাসছ, তাই বল!'

বনমালীর মুখের হাসি অনেক আগেই মুছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না। জীবনের একটা অভিজ্ঞতাকে বনমালী খুব দামি মনে করিয়া থাকে। তাহা এই যে, বক্তব্য সহজে দুবার মুখ দিয়া বাহির করিতে নাই। পুনরুক্তিতে কথার দাম কমিয়া যায়।

চারু আবার বলিল, 'আমি বলি কি, ত্রিশ হোক বত্রিশ হোক, দেনা তো তোমার আমি শুধতে পারছি না, এ বাড়ি দিয়ে তুমিই বা করবে কী; তার চেয়ে বিক্রি করে ফেলে তোমার টাকাটা তুমি নিয়ে নাও, বাকিটা আমাকে দাও। তোমার ত্রিশ হাজার কেটে নিলে আমার যা থাকবে তাই দিয়ে দেশে একটা ছোটখাটো বাড়ি তুলে বাস করিগে। জমিজায়গা যা আছে দু-চার বিঘে তার খাজনা পাই না, ফসল পাই না, নিজে থাকলে একটা ব্যবস্থা হবে।'

বনমালী খাওয়া বন্ধ করিল। আজকাল কোনো কিছুতেই সে বিস্ময় বোধ করে না, আকাশের একটা বজ্র পাখি হইয়া পাশ দিয়া উড়িয়া গেলেও না। কিন্তু চারুর কথায় সে যেন অবাক হইয়া গিয়াছে, এমনই মুখের ভাব করিয়া বলিল, 'তুমি এ বাড়ি বিক্রি করতে চাও? খেপেছ?'

চারু সভয়ে বলিল, 'কেন? তোমার টাকা তো তুমি পাবে।'

'আমার টাকা চুলোয় যাক।'

চারু আরও ভয় পাইয়া বলিল, 'রাগ কোরো না ভাই। মেয়েমানুষ, কিছুই তো বুঝি নে।'

বনমালী বলিল, 'ভুবনের বাড়ি বিক্রি করার পরামর্শ তোমাকে দিলে কে? ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না। সময়টা, কি জানো চারুদি, আমারও তেমন সুবিধে যাচ্ছে না। তোমার এই বাড়িটা বন্ধক রেখে কিছু ধার পেয়েছি। একটু সামলে উঠলেই ছাড়িয়ে নেব।'

চারু রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, 'তারপর?'

'ভুবনের বাড়ি ভুবন ফিরে পাবে।'

গলনালি প্রায় রুদ্ধ করিয়া চারু বলিল, 'কিন্তু তোমার টাকা? তোমার তিরিশ হাজার টাকা?'

'ভুবনের কাছে জমা থাকবে।'

একথা কেহ বিশ্বাস করে! নির্মূল আশার শোকে চারু কাঁদিয়া ফেলিল।

বনমালী বলিল, 'কেঁদো না চারুদি। আমি কি তোমার পর? আগে তুমি আমাকে কত ভালোবাসতে।'

শুনিয়া চারুর কান্না থমকিয়া থামিয়া গেল। বনমালী যদি পরিহাস করিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া আগের কথা তুলিয়া পরিহাস করিয়া থাকে, তবে সত্যসত্যই আর কোনো আশা নাই।

'আমি যদি তোমার মনে কোনোদিন ব্যথা দিয়ে থাকি, জেনো—'

বনমালী আবার খাওয়া বন্ধ করিল।

'তুমি আমার মনে ব্যথা দেবে কেন?'

চারু চোর বনিয়া গেল—'যদির কথা বলছি।'

বনমালী একেই গম্ভীর, সে আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, 'ভুবন কোথায় চারুদি?' চারু নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল, 'ও ভুবন, ভুবন। একবারটি এদিকে শুনে যাও তো, বাবা।'

ঘরের ভিতর হইতে ভুবন থুপথুপ করিয়া পা ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে অত্যাশ্চর্য মোটা। তাহার গলায় দু'টি খাঁজ আছে, মনে হয় গালেও বুঝি খাঁজ পড়িবে।

বনমালী ভাবিল, এই ছেলেকে অত ভালোবাসে, চারু তো আশ্চর্য মেয়েমানুষ!

মাসখানেক পরে পরী শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, 'আর আসব না দিদি।'

আরও একমাস পরে বনমালী তার বুড়ো মা, আশ্রিত-আশ্রিতা, দাস-দাসী ও মোটবহর লইয়া শহরের ভিতরের বাড়ি ছাড়িয়া চারুর শহরতলির বাড়িতে উঠিয়া আসিল। চারুর অনুমান করিতে কষ্ট হইল না যে, বনমালীর অবস্থানটা সাময়িক হইবে না।

পাংশু মুখে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখানে কি তোমাদের অসুবিধে হচ্ছিল ভাই?'

বনমালী বলিল, 'অসুবিধে হলে এতদিন বাস করলাম কী করে, চারুদি? সে জন্য নয়। মনে করছি, বাড়িটা আগাগোড়া মেরামত করব আর দু'খানা ঘর তুলব ছাদে। মাস দুই তোমার এখানেই আশ্রয় নিতে এলাম।'

চারুকে বলিতে হইল, 'আহা আসবে বইকি, সে কি কথা, বেশ করেছ।'

তারপর দুই মাসের মধ্যেও বনমালীর বাড়ি মেরামত আরম্ভ হইল না, ছাদে ঘর উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। চারু গোপনে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিল, নিজের বাড়ি বনমালী দুইশত দশ টাকায় ভাড়া দিয়াছে। ইতিমধ্যে বনমালীর নিরঙ্কুশ তৈলাক্ত অধিকার সদরের গেট হইতে পিছনের গলিতে খিড়কির দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল। অতিথির আদর ও সম্মান পাইয়া চারু তার নিজের বাড়িতে বাস করিতে লাগিল।

বনমালী বলে, 'অসুবিধে হচ্ছে, চারুদি?'

প্রশ্ন শুনিলে রাগ হয়।

'না ভাই, অসুবিধে কিছু নেই।'

'কিছুদিন যদি দেশে গিয়ে থেকে আসতে চাও, কেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো। দেশেটেশে মধ্যে মধ্যে যাওয়া দরকার বইকি।'

'দেশে কি বাড়ি ঘরদোর কিছু আছে ভাই যে যাবো?'

'হাজার দুই খরচ করলেই দেশে দিব্যি বাড়ি হয়। জমিজায়গা আছে, খাজনা পাও না, ফসল পাও না, সব লুটেপুটে নিচ্ছে। নিজে থাকলে লোকসানটা রদ হত।'

'জমি! জমি কই দেশে? কিছু কি আর আছে ভাই, আমার সর্বস্ব গেছে।'

বনমালী তখনকার মতো চুপ করিয়া যায়।

তাহার মা হেমলতা বলেন, 'হ্যাঁ রে, ওরা কি যাবে না?'

'কোথায় যাবে?'

'যে চুলোয় খুশি, আমাদের তা ভাববার দরকার? কদিন দ্যাখ, তারপর নিজের পথ দেখে নিতে বলে দে।'

'তাড়িয়ে দিতে পারব না, মা। ওসব আমার ধাতে নেই। নিজে থেকে যায় তো যাবে, নইলে রইল।'

কয়েকদিন পরে বনমালী আবার চারুকে বলে, 'শুনলাম, তুমি নাকি তীর্থে যেতে চাও? আমায় বলোনি কেন চারুদি? আমি সব ব্যবস্থা করে দিতাম। তোমার ধর্মকর্মে আমি বাধা দেব কেন?'

বুদ্ধির ধার পড়িয়া গেলেও চারু এত বোকা হইয়া পড়ে নাই যে, ভুবনকে লইয়া এ বাড়ি হইতে নড়িবে। বনমালীর দুর্বলতা সে জানে। বনমালী সোজাসুজি কাহারও প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখাইতে পারে না। সামনে যে উপস্থিত থাকে তাহার মনে বেদনা দেওয়া বনমালীর সাধ্যাতীত। তার মনের চলাফেরার প্রস্তরময় পথে সে এক পরত মাটি বিছাইয়া ফুল ফুটাইয়া রাখিবারই চেষ্টা করে।

তীর্থদর্শন কামনা রাখার অপবাদ চারু তাই অস্বীকার করে। বলে, 'কই তীর্থে যাওয়ার কথা আমি তো কিছু বলিনি? ও, হ্যাঁ মনে পড়েছে। মাসিকে বলছিলাম, স্বামী-শ্বশুরের এই

তীর্থ ছেড়ে আমার এক পাও কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। মাসিমা বুঝি মনে করেছেন, আমি তীর্থে যেতে চাই?'

বনমালী একটা হাই তোলে। মেয়েমানুষের এত বুদ্ধি তার ভালো লাগে না।

'তবু দেশ বেড়ালে ভুবনের একটু উপকার হত।'

'হায়রে কপাল, ওর আবার দেশ বেড়ানো!'

চারু কাঁদাকাটা করার উপক্রম করে।

বনমালী আর কিছু না বলিয়া বাগানে পায়চারি করিতে যায়। ভাবে, কী আর হইবে, থাক। গ্রামকে গ্রাম ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসিয়া আছে, চারুদির ভারটা আর এমন কি গুরু!

কাঁকর-বিছানো পথের ঠিক মাঝখান হইতে দুটি কচি সবুজ ঘাসের শিষ বাহির হইয়াছে দেখিয়া বনমালী থমকিয়া দাঁড়ায়। পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া যমজ ভাই-এর মতো তাদের দুটিকে সে চাপা দিয়া দেয়। ভাবে, আগে চারুর যদি টাকা না থাকিত!

তারপর একদিন পরী বিধবা হইয়া দিদির কাছে চলিয়া আসিল। ছেলেকে সাবধানে মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিতে লাগিল, 'দিদি গো, আমার কপাল পুড়েছে গো! কে অভিশাপ দিয়ে আমার এমন করলে গো, কে করলে!'

গলায় আঁচল জড়াইয়া পাক দিয়া চারু গলায় ফাঁস দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু হেমলতা ফাঁস খুলিয়া দেওয়ায় সে চেষ্টা সে ত্যাগ করিল। খানিকক্ষণ মেঝেতে কপাল কুটিয়া হাত কামড়াইয়া চেঁচাইয়া এক বিষম কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল ও ছুটিয়া নিজের ঘরে গিয়া দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গলায় সে যে আর ফাঁস দিতেছে না, সেটি বেশ বুঝা গেল। কারণ বাহির হইতে ভগবানের কাছে তাহার একটানা আবেদন শোনা যাইতে লাগিল, 'আমায় নাও ভগবান, এবার আমায় নাও।'

বনমালী পরীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'অমন করে কাঁদিস নে পরী ; ছেলের মুখ চেয়ে বুক বাঁধ। নে ওঠ, উঠে মাই দে ছেলেকে, ককিয়ে ককিয়ে গলা যে ওর কাঠ হয়ে গেল রে।'

হেমলতা বনমালীর সান্ত্বনা প্রত্যাহার করিয়া নিলেন।

'ওকে এখন ওসব বলিস নে বনমালী, কাঁদতে দে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ওর শুনেছি যে দজ্জাল, প্রাণ খুলে সেখানে কি ও একটু কাঁদতেও পেরেছে রে? এই প্রাণঘাতী শোক জোর করে চেপে রেখে শেষে কি অসুখে পড়বে মেয়েটা? খানিক কেঁদে নিক।'

পরী আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল। বনমালীর বিপদের আর সীমা রহিল না। কান্না তাহার একেবারেই সহ্য হয় না। অথচ উঠিয়া যাইবার উপায় নাই। পরী মনে করিবে, দেখো কী নির্মম ; আমার এমন শোকটা চোখ মেলে একটু চেয়েও দেখলে না!

ওদিকে চারুর সাড়াশব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খানিক পরে দম লইয়া পরী বলিল, 'ও মাসিমা, দিদি কী করছে দেখুন।'

হেমলতা খোকাকে বনমালীর দিকে আগাইয়া দিলেন।

'ধর তো, দেখেই আসি একবার।'

বনমালী হাত বাড়াইল না।

'আমি দেখে আসছি।'

'তুই এখানে বোস।' পরীর ছেলেকে নিজের ছেলের কোলে একরকম ফেলিয়া দিয়াই হেমলতা পলাইয়া গেলেন। খোকাকে সঙ্গে নিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাকে আবার ফিরিয়া আসিতে হইত, সে ইচ্ছা হেমলতার ছিল না। এসব তাঁহার ভালো লাগে না—সদ্য বিধবার এই কান্নাকাটি। তা ছাড়া কুপিত বায়ুর প্রকোপে সর্বদা তাঁহার মনের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে, কোনপ্রকার উত্তেজনা হওয়া কবিরাজের নিষেধ। পরের মেয়ের কপাল পোড়ার ঝাঁঝে শেষে কি তাহার তালু জ্বলিবে?

চারুর ঘরের দরজা ঠেলিয়া বলিলেন, 'দরজা খোলো মা, দরজা খোলো, ওসব কি করতে আছে? মাথা ঠান্ডা রাখো।'

বলিয়া ওদিকের জানালায় সরিয়া গিয়া ঘরের ভিতরে তাকাইয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। শরৎকালের ফাজিল মেঘের মতো চারুর শোক ইতিমধ্যেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ভুবনকে আদর করিয়া সে তাহার মাথায় মাখাইতেছে কবিরাজি তেল।

হেমলতা চলিয়া গেলে পরী উঠিয়া বসিল। বনমালীর কাছে একা একা কাঁদিতে তাহার লজ্জা করে। মুখ হইতে এলোচুল সরাইয়া সে ভগ্নস্বরে বলিল, 'খোকাকে দিন, হাতটা বোধ হয় ওর ভেঙেই গেল।'

খোকাকে তার কোলে দিয়া বনমালী বলিল, 'তোর ছেলেটা তো বেশ হয়েছে রে!'

'থাক, আপনাকে আর ঠাট্টা করতে হবে না।'

বনমালীর দিকে পিছন করিয়া বসিয়া পরী খোকার মুখে মাই তুলিয়া দিল।

এবার বনমালী উঠিয়া যাইতে পারে, যাওয়াই সংগত; কিন্তু সে বসিয়াই রহিল। পরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বনমালীর চেতনা কোনদিন বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল না। সে তার কাছে চিরদিনই চারুর ছোট বোন। আজ বনমালী লক্ষ করিল যে বিধবার বেশ ধারণ করায় পরীকে কমবয়সি চারুর মতো দেখাইতেছে। তার ব্যবহার, তার মনোবিকার, তার কথা বলিবার ভঙ্গি যেন চারুর যৌবনকাল হইতে নকল করা। কেবল চারুর চেয়ে সে স্পষ্ট স্বচ্ছ।

'তোর ঘাড়ে কী লেগে আছে রে পরী?'

ঘাড়ে হাত বুলাইয়া পরী জবাব দিল, 'কী লেগে থাকবে? কিছু না।'

'তুই পাউডার মেখেছিস?'

পরী জোরে নিশ্বাস নিয়া বলিল, 'মেখেছিই তো, একশবার মেখেছি। আপনি কেন আমায় কালো বলেন?'

পরীর বৈধব্যের আঘাতেই বোধহয় চারুর মাথা আর একটু খারাপ হইয়া গেল। চল্লিশ বছর বয়সেই তাহার চুলে এবার পাক ধরিল, কোমরে বাত দেখা দিল আর পেটে হইল অম্বল। শোক আর অম্বলের মধ্যে কোন্ কারণে তাহার বুক সর্বদা জ্বালা করিতেছে, সেটা আর সব সময় ঠিকমতো বুঝিবার উপায় রহিল না।

হেমলতার কাছে সে কাঁদিয়া বলে, 'আমার মতো অবস্থা মাসিমা শত্রুরও যেন না হয়,

দিনরাত ভগবানের কাছে এই কামনা জানাচ্ছি। কোনোদিকে কূলকিনারা নেই মাসিমা, আমি অকূলে ডুবেছি।'

হেমলতা বিরক্ত হন। মুখে বলেন, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো মা, কী করবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখো।'

মাথা চারু ঠাণ্ডা রাখিতে পারে না, ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা গরম করে। একটা পেটের ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, ছেলে নিয়া কচি বোনটাও আসিয়া ঘাড়ে চাপিল। সে কোন্ দিক সামলাইবে!

পরীকে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু রেখে গেছে?'

'না।'

'কিছু না? পোস্টাফিসে, ব্যাঙ্কে, তোর নামে কিছুই রেখে যায় নি?'

'কী রোজগার করত যে রেখে যাবে দিদি? মাস গেলে হাতখরচের টাকার জন্য বাপের কাছে হাত পাততো, রেখে যাবে!'

'আমি যা দিয়েছিলাম?'

'শ্বশুরের সিন্দুকে ঢুকেছে—খাট পালঙ্ক ছাড়া।'

চারু কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, 'তোর গয়নাও দেয়নি নাকি? তোকে যে আমি তেরো-চোদ্দ হাজারের গয়না দিয়েছিলাম রে!'

'কিছুটি আমাকে দেয়নি দিদি, সব আটকে রেখেছে। আঁচল থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে বাক্সো খুলে শ্বশুর নিজে সব বার করে নিল। খোকার গয়না পর্যন্ত।'

'এমন চামার? তা, আর দুটো মাস তুই ধৈর্য ধরে থাকলি না কেন? কেমন করে আদায় করে নিতে হয় আমি দেখতাম।'

'বড় খারাপ ব্যবহার করে দিদি, থাকতে ভালো লাগল না।'

চারু হঠাৎ রাগিয়া উঠিল, 'থাকতে ভালো লাগল না! মেয়েমানুষের অত ভালো লাগা মন্দ লাগা কী লো, যা কালকেই ফিরে যা তুই,—বুড়ো মরবার সময় খোকাকে তো কিছু দিয়ে যাবে।'

পরী ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, 'আছে ছাই, দিয়েও যাবে ছাই। সাত ছেলের একটা রোজগার করে? তাদের দিয়ে যেতে হবে না? ও বাড়ি আমি আর যাচ্ছি না বাবু, হ্যাঁ।'

চারু আগুন হইয়া বলিল, 'ছেলে তবে তোর মানুষ করবে কে শুনি? তোকে খাওয়াবে কে শুনি? আমি! আমার আর সেদিন নেই পরী, বনমালী তাড়িয়ে দিলে নিজের ছেলে আমার খেতে পাবে না।'

'আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না দিদি' বলিয়া মুখ ঘুরাইয়া পরী চলিয়া গেল।

চারু দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, 'আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না দিদি! ভাবতে হবে না তো আমার বাড়িতে এসেছিস কেন লো হারামজাদি?'

তিনদিন পরীর সঙ্গে সে কথা কহিল না। কিন্তু তাহাতেও পরীর কিছুমাত্র অনুতাপের লক্ষণ নাই দেখিয়া চারুর নিজের হাত পা কামড়াইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল।

'দেখ্ পরী, এত বাড় ভাল নয়।'

'নয় তো নয়, কী হবে?'

'খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করিনি তোকে আমি?'

'সবাই করে থাকে, তুমি একা নও।'

চারু বনমালীর শরণ নিল।

'মেয়েটা নিজের সর্বনাশ করছে ভাই। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এলে তাদেরই সুবিধে, একেবারে বঞ্চিত করবে।'

বনমালী কাজের ভিড়ে ব্যস্ততার ভান করিয়া বলিল, 'আহা, যাবে বইকি চারুদি, যাবে। দুদিন জুড়িয়ে গেলে ক্ষতি কী?'

চারু আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

পরদিন পরী মুখভার করিয়া বলিল, 'লেগেছো তো পেছনে? জগতে কারও ভালো করতে নেই।'

'তুই আবার কবে আমার কী ভালো করলি লো?'

'এখানে আছ কার জন্যে? ভেবে দেখেছ একবার?'

চারু চোখ পাকাইয়া বলিল, 'তোর জন্য, না? তুই দয়া করে থাকতে দিয়েছিস!'

'তাই।'

চট করিয়া ঘুরিয়া দমদম পা ফেলিয়া পরী চলিয়া গেল। চারু নিজের ঘরে গিয়া দেয়ালকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, 'ওর জন্য আমি আর কিছু করব না। করব না, করব না, করব না; এই তিন সত্যি করলাম, নারায়ণ সাক্ষী।'

পরীর ঔদ্ধত্য তার কাছে বেশিদিন অন্ধকার হইয়া রহিল না। ক্রমে ক্রমে ব্যাপারখানা বুঝা গেল।

বনমালীর খাওয়ার সময় চারু উপস্থিত থাকে, কয়েকদিন পরে পরীকেও দেখা যাইতে লাগিল। চারুর চেয়ে সে বনমালীর বেশি কাছ ঘেঁষিয়া বসে, চারুর হাতের পাখা অনেক আগেই দখল করিয়া রাখে, চারুর মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া বলে, 'খান, পেট আপনার ভরেনি। কখ্খনো ভরেনি। আমি বুঝি না! ওই খেয়ে মানুষ বাঁচে?'

বলে, 'কাল আপনাকে পেঁপের ডালনা রেঁধে দেব। খেয়ে দেখবেন, বেশ রাঁধি।'

চারু এমন করিয়া বলিতে পারে না, এমন স্নেহসিঞ্চিত্র গাঢ় কণ্ঠে, এমন মনোহর আবদারের ভঙ্গিমায়। অবাক হইয়া সে বোনের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

পরী বলে, 'হাঁ করে তাকিয়ে কী দেখছ দিদি? দুধটা এনে দাও। খাওয়া যে হয়ে এল, উঠে গেলে ভালো হবে?'

পরী যেন বনমালীর ছায়াটিকে বেদখল করিতে চায়। আশেপাশে কোথাও সে সর্বদা আছেই। বনমালীকে কখনো চুরুট খুঁজিতে হয় না, ওষুধ খাইতে ভুলিয়া যাইতে হয় না, দিনের মধ্যে দু-চার মিনিটের জন্য কারো সঙ্গে হালকা কথা বলিবার সাধ জাগিলে কেমন করিয়া টের পাইয়া পরী আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, 'স্নান করতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখে যাই আপনি কী করছেন!'

রাত্রে বনমালী বিছানায় শুইলে চুপিচুপি ঘরে আসে।

বলে, 'কী চাই বলুন।'

বনমালী হাসি গোপন করিয়া বলে, 'পা কামড়াচ্ছে—কেষ্টকে ডেকে দিয়ে যা। আর কিছু চাই না।'

পরী বলে, 'কেষ্ট কেন? আমি কি পা টিপতে জানি নে?'

অবশ্য পা সে টেপে না, অত বোকা পরী নয় ; কেষ্টকেই ডাকিয়া দেয়। হুকুম দিয়া যায়, 'যাবার সময় আলো নিভিয়ে দিস কেষ্ট।'

ছেলের দিকে চাহিবার সময় পরীর হয় না। ঝি-র কোলে পরীর ছেলে প্রায়ই মাতৃস্তন্যের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

বনমালীর চারিদিকে পরী যে বৃত্ত রচনা করিয়া রাখে, তার পরিধির বাহিরে চারু পাক খাইয়া বেড়ায়, কোথাও প্রবেশের ফাঁক দেখিতে পায় না।

ভাবে, কী মেয়ে বাবা! ও দেখছি সর্বনাশ করে ছাড়বে!

একদিন একটু বেশি রাত্রে খুব বাদল নামিয়াছে।

খানিক বর্ষণের পর অবিরত বিদ্যুৎচমক আর বজ্রপাত আরম্ভ হইয়া গেল। প্রকৃতির সে এক মহামারি কাণ্ড।

চারু ভাবিল, অন্য ঘরে একা একা পরী বড় ভয় পাইতেছে।

উঠিয়া দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিল। একটু খোঁজখবর নিলে পরী খুশি হইবে। বনমালীকে ও যেরকম বাগ মানাইয়া আনিতেছে, ওকে একটু খুশি রাখা দরকার বইকি!

নিশুতি রাত, বাড়িটা এক একবার প্রাণঘাতী আলোয় চমকাইয়া উঠিয়া অন্ধকারে আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছে। চারু পা চালাইয়া বারান্দাটুকু পার হইয়া গেল। কী জানি, একটা বজ্র যদি তাহার ঘাড়েই আসিয়া পড়ে!

পরীর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলিতে খুলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে দু-পা আগাইয়া চারু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ দৃশ্য তাহাকে দেখিতে হইবে চারু তাহা কল্পনাও করে নাই। মেঘগর্জনে পরী ভয় পাইবে এ আশঙ্কা কয়েক মিনিটের জন্যও তাহার পোষণ করার প্রয়োজন ছিল না। পরী একা নয়। বনমালীর বুকের কাছে যদিও সে জড়োসড়ো হইয়াই তাহার কথা শুনিতেছে, সেটা ভয়ে নয়।

খোকার ছোটো বিছানাটি মেঝেতে নামানো, বিছানা হইতে গড়াইয়া বনমালীর একপাটি জুতা দুহাতে বুকের কাছে আঁকড়াইয়া ধরিয়া খোকা শান্তভাবে ঘুমাইয়া আছে।

পা হইতে মাথা অবধি চারু একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করিল। একটা ভয়ানক চীৎকার করিয়া বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরীকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেওয়ার জন্য, গলা টিপিয়া তাহাকে একেবারে মারিবার জন্য, সে একটা অদম্য অস্থির প্রেরণা অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু সংসারে সব কাজ করা যায় না। কাকে সে কী বলিবে? এটা তাহার বোনের শয়ন ঘর, কিন্তু ঘরের মালিক বনমালী। বনমালীকে কিছুতে বলা যায়ই না, পরীকে কিছু বলিলেও বনমালী নিজে অপমানিত জ্ঞান করিবে। দারোয়ান দিয়া এই রাত্রেই যদি তাহাকে আর ভুবনকে বনমালী বাহির করিয়া দেয়, আটকাইবে কে? ছেলের হাত ধরিয়া এই দুর্যোগে সে যাইবে কোথায়?

চারু আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দরজা যেমন ভেজানো ছিল, তেমনই ভেজাইয়া দিল।

আকাশে এখনো বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, আকাশের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চিড়-খাওয়া বিদ্যুৎ। চারু ভাবিতে লাগিল, একি মহা বিস্ময়ের ব্যাপার যে পরী শেষ পর্যন্ত বনমালীকে জয় করিয়া ছাড়িল, সেদিনকার কচি মেয়ে পরী! এমন মূল্য দিয়াই সে বনমালীকে কিনিয়া নিল যে, তার ছেলের সমগ্র ভবিষ্যৎটা সোনায় মণ্ডিত হইয়া গেল। বনমালী এইবার সারাজীবন অনুতাপ করিবে আর পরীর ছেলের পিছনে টাকা ঢালিবে!

হয়তো ভুবনকে না দিয়া এ বাড়িটা সে পরীকেই দান করিবে। বলিবে, 'ভুবন আর বাড়ি দিয়ে করবে কি চারুদি? পরীকেই দিয়ে দিলাম।'

ঘরে গিয়া খাটে বসিয়া ছেলের গায়ে হাত রাখিয়া চারু অনেকক্ষণ চুপচাপ ভাবিল।

সে জানে উহারা তাহার যাওয়া-আসা টের পাইয়াছে। পাক টের। কাল তারা যদি তাহার কাছে লজ্জা বোধ না করে, তাহারও লজ্জা পাইবার কোনো কারণ থাকিবে না। পরী তাহার কে? কেউ নয়। ছুঁইতেও ঘৃণায় গা শিহরিয়া উঠিল বলিয়া সে যাহার চোখ দুটা উপড়াইয়া আনিল না, সে তাহার বোন হইবে কোন্ দুঃখে? কপাল পুড়িয়া যাওয়ার তিন মাসের মধ্যে এমন কাজ যে করিতে পারে বাড়ির ঝিয়ের চেয়েও সে পর, অনাত্মীয়া। ওর অক্ষয় নরকের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্ক নাই।

মনে মনে মস্ত এক প্রতিজ্ঞা করিয়া আঠারো বছরের ঘুমন্ত ছেলের মাথায় সস্নেহে চুমা খাইয়া চারু মেঝেতে তাহার সংক্ষিপ্ত কম্বলের শয্যায় নামিয়া গেল।

এ বাড়িতে পাপের বন্যা বহিয়া যাক, এ ঘরখানাকে সে পবিত্র মনে করিবে। যতদিন বাঁচে সপুত্র এই ঘরের বায়ু সে নিশ্বাসে গ্রহণ করিবে। বাহিরে এমন বৃষ্টি হইয়া গেল, তাহাদের গায়ে লাগিল কি? বাহিরে যত অন্যায়ই ঘটিয়া চলুক, তাহাদের গায়ে ছোঁয়াচ লাগিবে না।

এই কথাটা বারবার ভাবিয়া এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করিয়াও চারু কিন্তু সমস্ত রাত ঘুমাইতে পারিল না। পরীর আদিম শৈশবের ইতিহাস ছায়াছবির রূপ নিয়া তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বাপের বাড়ির গ্রামে পরী যখন ছেঁড়া ডুরে পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, আর বিবাহের পর এখানে আসিয়া পিঠে বেণি দুলাইয়া স্কুলে যাইত, তখনকার কথা। কত আদরে, কত যত্নে তাকে সে মানুষ করিয়াছিল। সেই পরী যে আজ তাহার ভুবনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া নেওয়ার জন্য এমনভাবে নিজের সর্বনাশ করিল, এর আকস্মিকতা, এর অসামঞ্জস্য সমস্ত রাত চারুকে অভিভূত করিয়া রাখিল।

বনমালীকে ভালবাসিয়া, যৌবনের অপরিতৃপ্ত অসংযত ক্ষুধায় অথবা নেহাত ছেলেমানুষি খেয়ালে যে পরী এই নিদারুণ ভুল করিয়া থাকিতে পারে, চারুর মনে ঘুণাক্ষরেও সে কথা উদিত হইল না। যাহার বিবাহ হইয়াছে, যে তিন বছর স্বামীর ঘর করিয়াছে, বিশেষ করিয়া যে তাহার বোন, তাহার মধ্যে ওসব পাগলামি চারু কল্পনা করিতে পারে না। চল্লিশ বছরের জীবনে কাহারও মধ্যেই আভিজাত্যের চিহ্ন তো সে খুঁজিয়া পায় নাই।

মতলব থাকে। যেদিকে যেভাবে মানুষ পা ফেলুক, পিছনে মতলব থাকে।

বনমালীর আটত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছে। টাকা ছাড়া তার আর কি আছে যে তার টানে মেয়েমানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে? মানুষটা একটু অদ্ভুত, একটু গভীর। প্রথম বয়সে মনে মনে সেও তাহাকে একটু ভয় করিত। মনে হইত, তাহার ভিতরটা কী কারণে মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া পাক খাইতেছে, তার বড় যন্ত্রণা। তখন বনমালী যুবক। তার মধ্যে সে তো তখনও কোন আকর্ষণ আবিষ্কার করিতে পারে নাই! তার নৈকট্যকে, তার নির্বাক আবেদনকে, তার দুচোখের গভীর তৃষ্ণাকে, সে যে কতবার অপমান করিয়াছে তার হিসাব হয় না।

তার সঙ্গে কথা কহিবার সময়ও কি সবসময় সে পাইত!

তাহার কাছে মানুষ হইয়া পরী কি তাহার মনের জোর এতটুকু পায় নাই? অসহায় আক্রোশে থাকিয়া থাকিয়া চারুর মনে হইতে লাগিল, এর চেয়ে সে-ই যদি সেসময় বনমালীর নিকট আত্মসমর্পণ করিত তাও ভালো ছিল, এরকম বিপদ ঘটাইবার সুযোগ পরী আজ তাহা হইলে পাইত না।

চারুর জীবনে অন্ধ আবেগের স্থান ছিল না। সমস্ত জীবন তাহাকে সংসারের এলোমেলো বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। প্রথম জীবনে তাহার লড়াই ছিল অভাবের সঙ্গে আর গ্রামের দু-তিনটি যুবকের স্বভাবের সঙ্গে। বিবাহের পর তাহার লড়াই শুরু হইয়াছিল ধনসম্পদের পলাতক প্রবৃত্তির সঙ্গে আর নিজেকে সামলাইয়া না চলার দুরন্ত ইচ্ছার সঙ্গে। এর কোনোটাই সহজ ছিল না। পুরুষ অভিভাবকের অভাবে সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে তাহার যেমন প্রাণান্ত হইত, অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে পাগলা স্বামীকে খাপ খাওয়াইতেও তাহার তেমনই অবিরাম নিজেকে শাসন করিয়া চলিতে হইত। হাতে টাকা, দেহে রূপ, মনে অতৃপ্ত যৌবন—এরকম ভয়ানক সমন্বয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সারাজীবন তাহাকে অনেক ভুগিতে হইয়াছে।

চারুর হৃদয়ের কতকগুলি স্থান তাই ভয়ানক শক্ত।

পরদিন সকালে সে নিজে গিয়া পরীকে ডাকিয়া তুলিল, কিছুই যেন ঘটে নাই এমনিভাবে বলিল, 'নে ওঠ এবার। অনেক বেলা হয়েছে।'

পরী সাড়া দিল না। পায়ের বুড়া আঙুলের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খোকাকে তুলিয়া নিয়া বাহিরে আসিয়া চারু হাঁফ ছাড়িল।

কিন্তু তখনও আর একজন বাকি।

বনমালীকে চারু আবিষ্কার করিল বাগানে।

এক মুহূর্তের জন্য তার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এই বাগানে এক স্বপ্নধূসর সন্ধ্যায় বনমালী একরকম জোর করিয়াই একদিন তাকে প্রায় চুম্বন করিয়া বসিয়াছিল। সেদিন যদি সে বাধা না দিত!

গাছের ডাল হইতে টপটপ জল পড়িতেছিল। কতকগুলি ফুলের গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চারু বলিল, 'কি বৃষ্টিটাই কাল হয়ে গেল!'

বনমালী বলিল, 'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।'

'হাঁ। কদিন গরমে প্রাণটা গেছে—আমি আজ একবার তারকেশ্বর যাব ভাই।'

বনমালী আচমকা বলিল, 'ক্ষেন্তির মা দুশো টাকা চেয়েছে, মেয়েকে নিয়ে কাশী যেতে চায়, তুমি যাবে ওদের সঙ্গে?'

চারু মাথা নাড়িল।

'কাশী মাথায় থাক, তোমাদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না ভাই। ক্ষেন্তির মা-র কী? হুট বলতে ও যেখানে খুশি যেতে পারে, আমরা পারিনে। আমাদের মায়ামমতা আছে। বিশ বছর ধরে যার সঙ্গে—'

চারু একটা নিশ্বাস ফেলিল।

তারকেশ্বর রওনা হওয়ার আগে চারু বলিয়া গেল, 'ভুবন রইল ভাই, একটু দেখো। আর শোনো, কাল পরীর একাদশী, এই বয়সে ওর একাদশী করার কী দরকার কে জানে! কথা কি শুনবে মেয়ে! তোমাকে মানে, ফলটল যদি খাওয়াতে পারো, একটু চেষ্টা করে দেখো ভাই।'

আগে, চারুর সরকার প্রথমে গিয়া একটা আস্ত বাড়ি ভাড়া করিয়া আসিত, তবে চারু তারকেশ্বর যাইত। এবার সে সোজাসুজি যাত্রী নিবাসে গিয়া উঠিল।

প্রত্যেক দিন এই মানত করিয়া সে দেবতার কাছে পূজা দিল যে, তার ফিরিয়া যাওয়ার আগেই পরী যেন কলেরা হইয়া মরিয়া যায়। পরীর যে আর বাঁচিয়া থাকার দরকার নাই দেবতাকে এই কথাটা সে খুব ভালো করিয়াই বুঝাইয়া দিল।

পরীর ছেলে? পরীর ছেলেকে সে মানুষ করিবে।

তৃতীয় দিন মন্দিরে পূজা দিয়া যাত্রীনিবাসে ফিরিয়া চারু দেখিল, একটি বউয়ের কলেরা হইয়াছে। তাকে বিদায় করিবার ষড়যন্ত্র আর পলায়নপর যাত্রীদের কোলাহলে যাত্রীশালা সরগরম।

সকালে বউটির সঙ্গে চারুর পরিচয় হইয়াছিল। স্বামীর অম্বলের অসুখের জন্য ছেলেমানুষ দেওরকে সঙ্গে নিয়াই মরিয়া হইয়া সে ধরনা দিতে আসিয়াছে। বউটির নাম কনক, বয়স অল্প ; থুপথুপ করিয়া পা ফেলিয়া ওর চলার ভঙ্গি অনেকটা পরীর মতো।

দেওর শিশুকে দুধ খাইতে দিবে বলিয়া সকালে চারুর কাছে একটি পাথরের বাটি ধার করিতে আসিয়াছিল। ঘনিষ্ঠতা হইতে মিনিট দশেক লাগিল বইকি!

'হ্যাঁ মাসিমা, কদিন থাকবেন আপনি?'

চারু হিসাব করিয়া বলিল, 'আজ নিয়ে হলো তিনদিন, আরও পাঁচ-ছদিন থাকবার ইচ্ছে আছে, এখন বাবা যা করেন। পরের কাছে পাগল ছেলে ফেলে এসেছি মা, থাকতে কি মন চায়! কিন্তু দেখি ক'টা দিন, ছেলেটাকে কেমন যত্নআত্তি করে। আমি চোখ বুজলে ওদের কাছেই তো থাকতে হবে। বোসো বাছা এইখেনে, পা গুটিয়েই বোসো না, বিছানা একটু নোংরা হয় তো হবে। তুমি বুঝি ভাবছ ছেলেকে ওরা কীভাবে রাখছে ফিরে গিয়ে আমি তা কী করে জানব? এতকাল একটা জমিদারি চালিয়ে এলাম, আমার কি ওসব ভুল হয় বাছা? সে ব্যবস্থা করেই এসেছি। আমাদের পদ্ম ঝিকে দুটো টাকা দিয়ে এসেছি, চোখ দিয়ে সব দেখবে, কান দিয়ে সব শুনবে, ফিরে গেলে আমায় সব বলবে।'

এখানে আসিয়া চারু কথা বলিয়া বাঁচিয়াছে। বাহিরে থাকিলে ভাষায় একটু সংযম দরকার হয়, কে জানে কে গ্রাম্য মনে করিবে, বুড়ি মনে করিবে!

কিন্তু যে যার হৃদয়-চর্চা নিয়া থাকে।

কনক বলিয়াছিল, 'আপনি তাহলে আছেন কদিন। আমার দেওরকে একটু দেখবেন মাসিমা। বাবার দয়া হতে দুদিন লাগে কি তিনদিন লাগে ঠিক তো কিছু নেই, একা কী করে থাকবে এখানে ভেবে বড় ভাবনা হচ্ছিল। আপনি যখন রইলেন তখন অবিশ্যি আর—'

কনক একটু হাসিয়াছিল, শিশুকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, 'মাসিমাকে প্রণাম কর শিশু।'

কাল কনক ধরনা দিবে স্থির হইয়াছিল, এখন আজ তাদের এই বিপদ!

ছেলেমানুষ শিশু একেবারে দিশাহারা হইয়া গিয়াছে, যে যা বলিতেছে, তাই করিতে গিয়া কিছুই সে করিতে পারিতেছে না।

এদিকে যাত্রীনিবাসের কর্তা একটা গাড়ি ডাকাইয়া আনিয়া ক্রমাগতই বলিতেছে, 'যাও না হে ছোকরা, হাসপাতালে নিয়ে যাও না, সবাইকে মারবে না কি? আচ্ছা বেয়াক্কেলে লোক বাপু তুমি, কথাটা জানাজানি হবার আগে আমাকে একবার বলতে নেই! দেখুন, আপনারা কেউ যাবেন না, কোনো ভয় নেই—আমি বলছি কোন ভয় নেই। রুগি হাসপাতালে পাঠিয়ে এখুনি প্রত্যেক ঘরের চৌকাঠ থেকে চাল পর্যন্ত ডিসেনফিট করে দিচ্ছি। আপনাদের যদি কিছু হয় তো আমায় বলবেন তখন।'

'হলে আর তোমায় বলে কী হবে বাপু?' এই ধরনের প্রশ্ন করিলে যাত্রীনিবাসের কর্তা চোখ লাল করিয়া একবার তার দিকে তাকাইতেছে, কিন্তু কোনো জবাব দিবার লক্ষণ দেখাইতেছে না।

চারু সঙ্গের চাকরকে গাড়ি আনিতে পাঠাইয়া দিল।

শিশু এতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পায় নাই, এবার তাহার দিকে চোখ পড়ায় সে যেন অকূলে কূল পাইল।

'মাসিমা, দেখুন না, এরা জোর করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আপনি একটু বলে দিন না?'

চারু বলিল, 'তা যাও না বাছা, হাসপাতালেই নিয়ে যাও। এখানে কি চিকিৎসে হয়?' তারপর ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, 'এখনো একজন ডাক্তার ডাকোনি, করেছ কী? ডাক্তার আনতে পাঠাও বাছা, আগে ডাক্তার আনতে পাঠাও। তারপর অন্য কথা।' বলিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাহির হইল গাড়ি নিয়া চাকর ফিরিয়া আসিলে।

শিশুকে ইশারায় কাছে ডাকিয়া বলিল, 'আমার পাথরের বাটিটা?'

'বাটিটা বৌদি নোংরা করে ফেলেছে মাসিমা।'

চারু বিরক্ত হইয়া বলিল, 'কেন, নোংরা করেছে? পরের জিনিস নিলে সাবধানে রাখতে হয় বাবু। আচ্ছা, যা করেছে বেশ করেছে এবার বাটিটা এনে দাও।'

'একটু দাঁড়ান, ধুয়ে দিচ্ছি।'

চারু অনাবশ্যক রূঢ়তার সঙ্গে বলিল, 'দাঁড়াবার আমার সময় নেই বাছা, তোমার বাটি ধোবার জন্য গাড়ি ফেল করব নাকি? যেমন আছে তেমনি এনে দাও।'

শিশু আর কথা না কহিয়া বাটি আনিয়া দিল। চারু তাহার একখানা পরনের কাপড় মাটিতে বিছাইয়া বলিল, 'এইতে দাও।' অনেক পরত কাপড়ে বাটিটা সন্তর্পণে জড়াইয়া পুঁটলি করিয়া চারু সেটা আলগোছে তুলিয়া নিল। নিজের জিনিস ফিরাইয়া নিয়া চোরের মতো কয়েকবার চারিদিকে চাহিয়া শিশুর হাতে দশ টাকার একটা নোট গুঁজিয়া দিয়া সে পলাইয়া আসিল।

বাড়ি ফিরিয়া ধূলা পায়ে সকলের আগে চারু পরীর হাতে পাথরের বাটিতে নির্মাল্য তুলিয়া দিল।

বলিল, 'এক হাতে নয়, দুহাতে ধর্। ছেলের মা তুই, তোর তো সাহস কম নয় পরী! কপালে ঠেকিয়ে খেয়ে ফেল্!'

'দুটো ভাত যে দিদি!'

'ভাত নয় প্রসাদ, খা।'

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে পরীর নির্মাল্যপান চাহিয়া দেখিল। তারপর বাটিটা নিয়া স্নানের ঘরে সাবান দিয়া সোডা দিয়া অনেকবার মাজিল। নিজে একঘণ্টা ধরিয়া স্নান করিয়া আসিয়া বেতের বাস্কেট হইতে দেবতার ফুল বাহির করিয়া ভুবনের কপালে ছোঁয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোকে সকলে ভালোবেসেছে ভুবন?'

ভুবন অস্বীকার করিল।

'তোমার কাছে পালিয়ে যাচ্ছিলাম, কেষ্ট আমায় ধরে আনলো কেন? আমায় ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।'

চারু ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিরে পদ্ম? সকলের ভাবসাব কীরকম দেখলি বলতো?'

পদ্ম জানাইল সকলের ভাবসাব মন্দ নয়। আবার ভালোও নয় কিন্তু। দু'য়ের মাঝামাঝি। পরী তার বোনপোকে ঠিক সময় মতো না হোক ডাকিয়া খাওয়াইয়াছে, মা-র জন্য হাউ হাউ করিয়া কাঁদিলে ভোলানোর চেষ্টাও যে করে নাই এমন নয়। তবে চোখে চোখে ওকে কেউ রাখে নাই। কাল দুপুরবেলা ভুবন চুপিচুপি পলাইতেছিল, পদ্ম দেখিতে পাইয়া কেষ্টকে দিয়া ধরাইয়া আনিয়াছে। গোলমাল শুনিয়া আসিয়া বনমালী তাকে কয়েক ঘণ্টা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

'কি জানো মা, মা-র মতো কেউ কি করে?'

চারু বলিল, 'আমি যে চিরকাল বাঁচব না পদ্ম, তখন কী হবে? মারধর করেনি তো কেউ?'

ধরিয়া আনিবার সময় কাল কেষ্ট বুঝি ভুবনকে একটু মারিয়াছিল, কিন্তু পদ্ম সেকথা গোপন করিয়া গেল।

'না মারধর কেউ করেনি।'

চারুর পুরা নাম চারুদর্শনা, পরীর পুরা নাম পরীরানী। এগুলি কেবল যে নাম তা নয়,—মানানসই নাম।

সারাদিন পরীকে চারু আজ বিশেষভাবে সুন্দরী দেখিল, অপরূপ, অভিনব। পরী

যতবার তার লাল করা ঠোঁট দুইটি ফাঁক করিয়া হাসিল, ততবারই চারুর সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ বহিয়া গেল।

ভাবিল, 'না, এত রূপ নিয়ে সংসারে থাকাটা কিছু নয়। চাদ্দিকে আগুন জ্বেলে দিত বইতো নয়।'

শরীরটা চারুর ভালো লাগিতেছিল না। সে সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। একটা আশঙ্কা সে মন হইতে কোনমতেই দূর করিতে পারিতেছিল না যে, আজ রাত্রেই যদি পরীর কলেরার লক্ষ্মণ প্রকাশ পায় ভুবনকে কোথাও সরানোর সময় পাওয়া যাইবে না। তারকেশ্বরের সেই বউটির ভেদবমির কথা স্মরণ করিয়া চারুর গা ঘিনঘিন করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল একটা নোংরামির মধ্যে সে শুইয়া আছে, বিছানাটা অপবিত্র, অশুচি।

সম্ভবত মনের ঘেন্নাতেই খানিক পরে চারুর বমি আসিতে লাগিল।

আর খানিক পরে সে প্রথমবার বমি করিল। একবার বমি করিয়াই তার মনে হইল সমস্ত শরীরের রস তার শুকাইয়া গিয়াছে!

বমির শব্দে পরী উঠিয়া আসিয়াছিল, চারু কাঁদিয়া তাহাকে বলিল, 'ও পরী, আমার কলেরা হয়েছে, বনমালীকে ডাক শিগগির।'

বনমালী উঠিয়া আসিল। ডাক্তারকে ফোন করা হইল।

ডাক্তার আসিল একঘণ্টা পরে। ইতিমধ্যে চারুর মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। বিড়বিড় করিয়া আপন মনে কী যে সে বকিতে লাগিল কেহ তার মানে বুঝিল না। মানে বুঝুক আর না বুঝুক, বনমালী বারকতক তাকে শুনাইয়া দিল যে ভুবনের জন্য তার কোনো ভয় নাই, ভুবনের ভার সে নিল।

পরীর মনে হইল তারও কিছু বলা দরকার।

'ভুবনকে আমি চোখে চোখে রাখব দিদি, চোখের আড়াল করব না কখনো।'

কিন্তু মরিয়া গেলেও চারু কি ইহার একটি কথা বিশ্বাস করে! চল্লিশটা বছর সংসারে বাস করিয়া মানুষের কাছে সে যে শিক্ষা পাইয়াছে শুধু মৃত্যু কেন, মৃত্যু যাহার বিধান তারও বোধহয় ক্ষমতা নাই সে শিক্ষা তাহাকে ভুলাইয়া দেয়।

কদিন পরী খুব কাঁদিল। 'দিদি আমায় বড় ভালোবাসত', এই কথা বনমালীকে সে কতবার যে শোনাইল তার ইয়ত্তা নাই। বনমালী সভয়ে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল।

তখন পরী সভয়ে কান্নাও বন্ধ করিল এবং সুরও বদলাইয়া ফেলিল।

'একদিনের তরে সুখ কাকে বলে জানে নি। তারপর ওই তো ছেলে। গিয়েছে না বেঁচেছে—' বনমালী বলিল, 'শরীরও ভেঙে গিয়েছিল।'

পরী বলিল, 'হ্যাঁ। অম্বলের অসুখটা হবার পর থেকে একরকম মরবার দাখিল হয়েছিল।'

'অথচ একটু যত্ন হয়নি।'

'না। নিলে তো কারো যত্ন! তেমন মানুষই ছিল না দিদি। সকলের সেবাই করেছে প্রাণপণে, পরের জন্য খেটে খেটে প্রাণটা দিয়েছে।'

আড়চোখে চাহিয়া আবার বলিল, 'বড় ঘা খেয়ে গেল। আমাদের একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল, কী বল?'

'হলে না কেন?'

পরী হাসিয়া বলিল, 'বাঃ বেশ, আমি হলাম মেয়েমানুষ, আমাদের কি অত হিসাব থাকে? তুমি ঘরে এলে আমার বলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভুল হয়ে যায়, সাবধান থাকব!'

বনমালী বলিল, 'তাই নাকি!'

চারুর মৃত্যুর পর বনমালী দিনে অথবা রাত্রে কখনও পরীর ঘরে আসে নাই। দুর্ভাবনার পরীর আর সীমা ছিল না। চুলে সেদিন সে অল্প একটু তেল দিল, এলো চুলে একটু স্নিগ্ধ রুক্ষতাই ভালো মানায়। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ভাবিবার পর বাটিতে পাতলা করিয়া আল্‌তা গুলিয়া গালে লাগাইয়া সিল্কের রুমাল দিয়া মুছিয়া নিল। ছোট একটি পান সাজিয়া মুখে নিয়া একটু চিবাইয়া ফেলিয়া দিল।

তারপর বনমালীর বেড়াইতে যাওয়ার সময় সামনে পড়িয়া একটু হাসিল।

'শোনো। কাছে সরে এসো, কানে কানে বলি। একটা ফিডিং বোতল এনো, আমি মরুভূমি হয়ে গেছি। আনবে তো?'

'আনব। পদ্মর কাছে খোকা ভারী কাঁদছে পরী।'

'পদ্ম ওকে ইচ্ছে করে কাঁদায়।'

'পদ্মর কাছে না দিলেই হয়।'

'আমাকে সেজেগুজে ফিটফাট থাকতে না বললেই হয়।'

বনমালী তাহার গালে একটা টোকা দিল।

'না সাজলেই তোকে ভালো দেখায় পরী।'

বনমালী চলিয়া গেলে পরী ছুটিয়া গিয়া পদ্ম-ঝির কাছ হইতে খোকাকে ছিনাইয়া নিল। চোখ পাকাইয়া বলিল, 'তোকে না পাঁচশো বার বলেছি, বাবুর ধারেকাছেও খোকাকে নিয়ে যাবি না?'

পদ্ম একগাল হাসিয়া বলিল, 'বাবু নিজে ডাকলে গো। বললে, খোকাকে আন্‌তো পদ্ম। ভয়ে মরি দিদিমণি।'

'মরণ তোমার! ভয় আবার কিসের!'

'তা যাই বলো, বাবুকে আমি বড্ড ডরাই বাপু। দেখলে বুকের মধ্যে টিপটিপ করতে থাকে দিদিমণি। এই অ্যাদ্দুর থেকে বাবুকে আমি গড় করি।'

পরী হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা আচ্ছা, বেশ করিস। তারপর কী হল বল্‌।'

'ভয়ে ভয়ে খোকাকে তো নিয়ে গেলাম। বাবু কোলে নিলে, আদর করলে, চুমো পর্যন্ত খেলে। তারপর বললে, বেশ ছেলেটা, না রে পদ্ম? লজ্জায় মরি দিদিমণি।'

বনমালী বেড়াইয়া ফিরিলে পরী বলিল, 'আচ্ছা পরের ছেলেকে তুমি এত ভালোবাসলে কি করে বলো তো? তোমার হিংসা হয় না?'

বনমালী হাসিয়া বলিল, 'না, দুদিনের জন্য এসেছে, ওকে আবার হিংসে করব কী? বরং তোর ছেলে বলে ভালোই বাসি।'

পরীর মুখ শুকাইয়া গেল।

এ কী পরিণাম? সংক্ষিপ্ত ও সাংঘাতিক!

আরশি কি প্রত্যহ তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছে? বনমালীর সেই উগ্র আবেগময় ভালোবাসা এর মধ্যে উপিয়া গেল কী করিয়া? আজন্ম দেখিয়া আসিয়াও আরশিতে নিজেকে তাহার প্রত্যহ নূতন মনে হয়, আপনার রূপ ও যৌবনের এক একটা অভিনব ভঙ্গিমা আজও সে প্রত্যহ আবিষ্কার করে। আর বনমালীর কাছেই এর মধ্যে পুরানো হইয়া গেল? মাথায় না তুলিয়া বনমালী তাহাকে কোথায় নামাইয়া দিতে চায়?

পরীর বুক দুরুদুরু করিতে লাগিল। তাহার পাপের সমান অংশীদার তখনও চোখের আড়ালে চলিয়া যায় নাই। তাকাইয়া দেখিয়া পরীর মনে হইল পদ্ম-ঝি বড় মিথ্যা বলে নাই। বনমালীকে সেও কম ভয় করে না।

অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া বনমালীর চিরদিনের স্বভাব। জীবনের কোনো স্তরই একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ছাড়া তাহাকে নিজস্ব করিয়া রাখিতে পারে নাই। জীবনের বৈচিত্রগুলি বনমালী দ্রুতগতিতে সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিয়া নেয়। তাহার উপভোগ যেমন প্রখর তেমনই অধীর। স্থূল হোক, সূক্ষ্ম হোক, জীবনের রসবস্তুকে সে তাড়াতাড়ি জীর্ণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে।

তাহাকে জব্দ করিয়াছিল চারু।

চারু তার প্রথম বয়সের নেশা ; অদম্য, অবুঝ, বহুকাল স্থায়ী। যে বয়সে নারীদেহের সুলভতা সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান জন্মে, নারীমনের দুর্লভতায় প্রথম হতাশা জাগে, চারুকে বনমালী সেই বয়সে দেহমন দিয়া চাহিয়াছিল। চারু রীতিমতো তাহাকে নিয়া খেলা করিত ; ওষুধের ডোজে আশা দিয়া তার প্রেমকে বাঁচাইয়া রাখিত এবং প্রাণপণে এই খেলার উন্মাদনা উপভোগ করিত। বনমালীর এক গ্রাসে পেট ভরানোর প্রবৃত্তি ক্ষুধাতুর বন্য জন্তুর মতো চারুর দুর্ভেদ্য সাবধানতা ঘেরিয়া পাক খাইয়া মরিত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

পরীর রূপ আছে, চারুর মতো প্রতিভা নাই। বনমালীর পাক খাওয়া মনকে সে একাভিমুখী করিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার নদীতে হাঁটু ডুবাইয়া বনমালী পার হইয়া গেল, সে তাকে ভাসাইয়া নিতে পারিল না।

পরী তাহার ঘরে সযত্নে শয্যা রচনা করিয়া রাখে, বালিশের নীচে জুঁই আর বেলফুল রাখিয়া দেয়। কিন্তু যাহার জন্য ফুলগুলি হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া চাপা গন্ধ বিলায় সে আসে না। সোজাসুজি নিমন্ত্রণ করিবার সাহস পরীর নাই, জানালায় বসিয়া সে শুধু কাঁদে। এখন প্রকৃত বর্ষাকাল। প্রতি রাত্রেই প্রায় বাদল নামে। গাঢ় ভিজা অন্ধকারে বিবরবাসিনী নাগকন্যার মতো পরী ফুলিয়া ফুলিয়া সাশ্রু নিশ্বাস নেয়। খোকা কাঁদে, ককায়, তাহার গলা ভাঙিয়া আসে, শ্রান্ত হইয়া একসময় সে ঘুমাইয়া পড়ে। পরী সাড়াশব্দ দেয় না। খানিক পরে খোকার মুখের উপর ঝুঁকিয়া মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলিতে থাকে, শোধ নিস, শোধ নিস ; তাতেই হবে। ছাড়বি কেন? শোধ নিস।'

তারপর অদম্য আক্রোশে খোকার দুই কাঁধ ধরিয়া সজোরে ঝাঁকি দিয়া চেঁচাইয়া উঠে, 'কেন তুই এসেছিলি হারামজাদা!'

গভীর রাত্রে দরজা খুলিয়া সে বাহিরে চলিয়া যায়, প্যাসেজের আলো নিভাইয়া

অন্ধকারে এ-বারান্দা ও-বারান্দা ঘুরিয়া বেড়ায়, ঘরে ঘরে উঁকি দেয়, বনমালীর ঘরের দরজায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

একদিন নৈশ পর্যটনের সময় ভুবনের ঘরে উঁকি দিয়া সে দেখিতে পাইল বিছানায় উপুড় হইয়া সে হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দৃশ্যটা সে খানিকক্ষণ উপভোগ করিল। সে চিরদিনই দুঃখী, অন্যের দুঃখ দেখিলে সে আনন্দ পায়।

তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া বনমালীকে সে ডাকিয়া তুলিল।

'ভুবন কী রকম করছে দেখবে চলো!'

'কি রকম করছে?'

'কাঁদছে আর ছটফট করছে।' অন্ধকারে পরী বনমালীর গা ঘেঁষিয়া আসিল।

বনমালী বলিল, 'প্যাসেজের আলো নিভিয়েছে কে?'

'আমি।'

বনমালী সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। পরী সংকুচিতা হইয়া বলিল, 'দ্যাখো তো কী করলে। নিভিয়ে দাও।'

বনমালী তাহার আলো নিভানোর প্রয়োজনটা চাহিয়া দেখিল না।

'ঘরে যাও' বলিয়া ভুবনের ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

রোষে ক্ষোভে আত্মহারা পরী আলোকে লজ্জা দিয়া আলোর নীচে দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালীর পাশের ঘরখানা হেমলতার। তিনি দিনের বেলায় বিছানায় শুইয়া থাকেন বলিয়া রাত্রে বিছানায় শুইয়া আর ঘুমান না, ঝিমান। বারান্দায় কথা শুনিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

'কে রে? পরী নাকি? বনমালীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তুই কি করছিস পরী?' বলিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া যোগ দিলেন, 'মরণ তোমার, বেহায়া মেয়ে।'

পরী তখন যে কাজ করিয়া বসিল তাহার অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার। চট করিয়া বনমালীর ঘরে ঢুকিয়া সে দড়াম করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল এবং স্তম্ভিত হেমলতা নড়িবার শক্তি ফিরিয়া পাওয়ার আগেই বনমালীর একটা চাদর গায়ে জড়াইয়া তাহার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

হেমলতা শূন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'এ কী কাণ্ড মা! অ্যাঁ?'

পরদিনটা কোনরকমে চুপ করিয়া থাকিয়া তার পরের দিন হেমলতা ছেলেকে অনুরোধ করিলেন, 'পরীকে এবার পাঠিয়ে দে বনমালী।'

'দেব। এখন থাক।'

পরীকে এখন সে অবহেলা করিতেছে। অমন সুন্দর একটা পুতুলের আবোল-তাবোল নাচ দেখিতে তার ভারী মজা লাগিতেছে। এ অবস্থাটি অতিক্রান্ত না হইলে বনমালী তাহাকে কোথাও পাঠাইবে না।

হেমলতা অত জানেন না, তিনি আবার বলিলেন, 'না বাবা পাঠিয়েই দে। স্বামী না থাক, স্বামীর ঘর তো আছে। কেন পরের বোঝা ঘাড়ে করে আছিস?'

বনমালী হাই তুলিয়া বলিল, 'দটি খায়, ও আবার বোঝা কী মা?'

হেমলতা আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। ডাইনির মায়া হইতে ছেলেকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিবেন শুইয়া শুইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কবিরাজের মাথা গরম না করিবার উপদেশটা পর্যন্ত তাঁহার স্মরণ রহিল না।

দুদিন পরে আবার বলিলেন, 'যে রাগী মানুষ তুই, তোকে বল্‌তে সাহস হয় না বাবু। কিন্তু চোখ মেলে এ তো আর দেখা যায় না বনমালী।'

'কী হয়েছে?'

'রাগের মাথায় কিছু করে বসবি না বল্‌?'

বনমালী হাসিয়া বলিল, 'না। আমার রাগ হবে না, বলো।'

হেমলতা গলা নীচু করিয়া বলিলেন, 'পরীর স্বভাব-চরিত্র ভালো নয় বনমালী। মেয়ে মিটমিটে ডান। শ্রীধরের ভাইটা আসে জানিস? ওই যে রোগা লম্বা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল?'

'জানি। আমার চিঠি টাইপ করে।'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি, বনমালী। দুপুরবেলা সেদিন চোরের মতো পরীর ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক চেয়ে ওদিক চেয়ে নীচে নেমে গেল।'

'কবে?'

'পরশু।'

বনমালী হাসিয়া বলিল, 'পরশু তো? আমি তখন পরীর ঘরে ছিলাম, টাইপ করার জন্য শ্রীধরের ভাই একটা দরকারি চিঠি নিতে এসেছিল। মানুষকে অত সন্দেহ কোরো না মা। পরী সেরকম নয়।'

হেমলতার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তার মিথ্যার পাশে ছেলের মিথ্যা আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র মুখোশ গেল খুলিয়া, গোপন সত্য প্রকাশ হইয়া গেল ; লজ্জার আর সীমা রহিল না। বনমালী চলিয়া গেলে তিনি ভাবিলেন, বাহাদুরি করিতে যাওয়ার এই শাস্তি। চুপচাপ থাকিলেই হইত! আটত্রিশ বছরের লাখপতি ছেলের ভালো করিতে যাওয়া কি তাহার সাজে?

এদিকে বনমালীর স্বাভাবিক সংযত নির্মমতায় পরী পাগল হইয়া উঠিল। কেন এরকম হইল, বনমালীর অমন উদ্দাম-কামনা তুবড়ির মতো জ্বলিয়া উঠিয়া এমন অকস্মাৎ কেমন করিয়া নিভিয়া গেল কিছুই সে বোঝে না, দিনরাত আগের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার উপায় চিন্তা করে। ভাবে, 'অভিমান করে গম্ভীর হয়ে থাকবো? যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে হেসে খেলে দিন কাটাবো? আর কারো দিকে একটু ঝুঁকবো? একদিন রাতদুপুরে ঘরে গিয়ে পাগলের মতো বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বো? পায়ে ধরে যে দোষই করে থাকি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব?'

এর মধ্যে শেষ কল্পনা দুটিকে সে কার্যে পরিণত করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। দিন দিন পরী শুকাইয়া যায়।

ভুবনকে এখন বনমালী খুব ভালবাসে।

অন্তত তাহার ভাব দেখিয়া তাহাই মনে হয়।

কেষ্টকে সে অন্য কোনো কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে, ভুবনকে সর্বদা চোখে

চোখে রাখিবে। খাওয়ার সময় বনমালী ভুবনকে কাছে খাইতে বসায়, প্রায়ই তাহাকে সঙ্গে নিয়া মোটর চাপিয়া বেড়াইতে যায়, অবসর সময়ে কাছে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলে, তাহাকে নানান বিষয় শিখাইবার চেষ্টা করে।

তার বুদ্ধির জড়তা বিনষ্ট করিবে এই তাহার ইচ্ছা। কাজের মতো একটা কাজ পাইয়া বনমালী ভারী সুখী।

বলে, 'ওকে চারুদি বোকা করে রেখেছিল, আসলে ও বোকা নয়।'

পরী তোষামোদ করিয়া বলে, 'আগে থাকতে তোমার হাতে পড়লে এ্যাদ্দিন ও মানুষ হয়ে যেত। খোকাকেও তুমিই মানুষ করে দিও।'

তারপর হাসিয়া যোগ দেয়, 'যেন মানুষ করবে না, তাই বলে দিচ্ছি।'

বনমালীর প্রতি ভুবনের আনুগত্য অদ্ভুত!

হেমলতার জ্বর হইয়াছে। তিনি আর বাঁচিবার আশা করেন না। তাই প্রাণপণে ছেলের সেবা আদায় করিয়া নিতেছেন।

বনমালী বলে, 'আপিসে কাজ আছে মা, যেতে হবে।'

হেমলতা বলেন, 'আমায় চিতায় তুলে দিয়ে যাস।'

শিয়রে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া বনমালী বিকালে বাগানে পায়চারি করিতে যায়। এদিকে ভুবন বার বার হলঘরের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাইতে থাকে। একবার সে ভয়ানক চমকাইয়া ওঠে। এইমাত্র সে দেখিয়া গেল পাঁচটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে, এর মধ্যে সাড়ে দুটা বাজিতে চলিল কী করিয়া?

ঘড়ির ডায়ালটা ভালো করিয়া দেখিবার চেষ্টায় ভুবনের প্রকাণ্ড দেহটা বিহ্বল প্রশ্নের ভঙ্গিতে পিছন দিকে হেলিয়া যায়। তারপর একসময় সে তাহার ভুল বুঝিতে পারে। ঘড়ির বড় কাঁটা আর ছোট কাঁটার মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়া সে যেন ভারি কৌতুক করিয়াছে, এমনিভাবে সে হাসিয়া ফেলে। মুষ্টি তুলিয়া ঘড়িটাকে শাসন করিয়া বলে, 'ভেঙে ফেলে দেব, পাজি কোথাকার!'

ঘড়িতে ছটা বাজিতে আরম্ভ করামাত্র সে বাগানে ছুটিয়া যায়। বলে, 'ছটা বাজল মামা!'

তাহার কথা শেষ হওয়ার আগে অথবা পরে হলঘরের ঘড়িটা নীরব হয়, ঠিক বোঝা যায় না।

বনমালীর এক প্রকার অভূতপূর্ব অনুভূতি হয়। ছটার সময় হেমলতাকে ওষুধ খাওয়াইতে হইবে, কিন্তু সময়মতো ডাকিয়া দিবার কথা ওকে সে কিছুই বলে নাই। যাহাকে বলিয়াছিল সে হয়তো কার সঙ্গে গল্পে মাতিয়াছে, কিন্তু অন্যকে দেওয়া তাহার সে আদেশ ভুবন ভোলে নাই। কাঁটায় কাঁটায় অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করিয়াছে।

কেন করিয়াছে? তাহাকে একটু খুশি করিবার জন্য। কোনো প্রত্যাশা করিয়া নয়, কোনো মতলব হাসিল করিবার জন্য নয়, তাহাকে খুশি করিবার প্রেরণা মনের মধ্যে ছিল, শুধু এইজন্য?

ভুবনকে সে যে ভালোবাসিয়াছে সেটা তাই অকারণ নয়। ভুবনের নিষ্কাম প্রেম ছাড়া আরও একটা গৌণ কারণও ইহার ছিল। চারুর জন্য পরী কাঁদিয়াছে, কিন্তু তাহার কান্নায়

বনমালী হইয়াছে বিরক্ত। চারুর জন্য ভুবনের শোক একটিবার মাত্র দেখিয়া বনমালীর মনে শোকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। আহত পশুর মতো ভুবন মধ্যে মধ্যে মার জন্য ছটফট করিয়া কাঁদে ; বনমালীর শুষ্ক তৃণহীন জগতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়!

পরীর সামনেই একদিন সে ভুবনকে বলিল, 'একটা বাড়ি নিবি, ভুবন?'

'নেব মামা।'

'আচ্ছা, তোকে একটা বাড়ি লিখে দেব।'

এ বাড়ি অবশ্য নয়, শ্যামবাজারের একটা ছোট বাড়ি সম্প্রতি একপ্রকার বিনামূল্যেই বনমালীর হাতে আসিয়াছে। সেই বাড়িটি দান করিবার কথাই সে ভাবিতেছিল। কিন্তু পরী তো তাহার মনের খবর রাখে না, সে ভাবিল, ভুবনকে বনমালী এই বাড়িটিই দিয়া দিবে, একদিন মিথ্যা করিয়া চারুকে সে যাহা বলিয়াছিল তাহা পালন করিবে।

পরীর বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল। খোকাকে অনেকক্ষণ বুকে চাপিয়া রাখিয়াও সে জ্বালা তাহার কমিল না।

সারাদিন তাহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া রহিল। বনমালীর আশ্রিতাদের মধ্যে সকলের চেয়ে নিরীহ ক্ষেন্তির মাকে এমন অপমানই সে করিল যে, গৃহপালিতা কুক্কুরীর মতো অপমানজ্ঞান-হীনা সেই নারীটি কাঁদিয়া ফেলিল।

তারপর পদ্ম-ঝির সঙ্গে পরীর কলহ হইয়া গেল। বিকালে বিনা অপরাধে কেষ্টকে সে তাহার পায়ের ঘাসের চটি ছুঁড়িয়া মারিল।

এবং পঞ্চমী তিথিতে একাদশী করিয়া গভীর রাত্রে উন্মত্তার মতো বনমালীর রুদ্ধ দরজার সামনে মাথা কপাল কুটিয়া আসিয়া ঘুমন্ত ছেলেটাকে হ্যাঁচকা টানে কোলে তুলিয়া নিয়া কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তাহার কচি গলাটি সজোরে টিপিয়া ধরিল।

গলা ছাড়িয়া দিবার পর কাশিতে কাশিতে খোকা বমি করিয়া ফেলিল। পরদিন দেখা গেল গলা তাহার লাল হইয়া আছে এবং কাঁদিতে গিয়া সে শব্দ বাহির করিতে পারিতেছে না।

পদ্ম ভয় পাইয়া বলিল, 'কী করে এমন হল দিদিমণি?'

পরী ফিশফিশ করিয়া বলিল, 'বাবুর কীর্তি পদ্ম। অন্ধকারে—'

পদ্ম চোখ মিটমিট করিয়া বলিল, 'সেরে যাবে। আমি ভাবলাম পেলেগ। ইঁদো বেড়ালটার হয়েছিল দেখনি? দেখে আমি তো ঘেন্নায় মরি দিদিমণি, গলা জুড়ে এই ঘা, পুঁজে, রক্তে— !'

* * * *

কয়েকদিন পরে হেমলতার অসুখ হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ায় তাকে নিয়া বনমালী বিশেষ ব্যস্ত আছে, দুপুরবেলা পরী চুপিচুপি ভুবনকে বলিল, 'মার কাছে যাবি, ভুবন?'

ভুবন উৎসুক হইয়া বলিল, 'যাব।'

'এক কাজ কর্ তবে। জামা গায়ে চুপিচুপি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবি যা। আমি যাচ্ছি, গাড়ি চাপিয়ে তোকে মার কাছে নিয়ে যাব।'

ভুবন তৎক্ষণাৎ জামা গায়ে দিল।

'মামাকে বলে যাই?'

'তবেই তুমি গিয়েছ! মামা তোকে যেতে দেবে ভেবেছিস? ছাই দেবে!'

ভুবন আর কথা কহিল না। চটি পায়ে দিয়া মার কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া নিল।

পরী বলিল, 'কাউকে কিছু বলিস নে কিন্তু খবরদার। বললে নিয়ে যাব না। যা, রাস্তায় দাঁড়াগে।'

ভুবনের এক মিনিট পরে খোকাকে কোলে নিয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাড়ির পিছন দিকে গলিতে নামিয়া গিয়া পরী দেখিল, ভুবন তার প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া আছে। হাত ধরিয়া পরী তাহাকে হনহন করিয়া টানিয়া নিয়া চলিল। বড় রাস্তায় পড়িয়া ট্যাক্সি ধরিয়া হাজির করিল একেবারে হাওড়া স্টেশনে।

দরাজ হাতে অনেকগুলি নোট কাউণ্টারের ওপাশে চালান করিয়া দিয়া বোম্বে পর্যন্ত ফার্স্টক্লাসের একখানি টিকিট কিনিয়া গাড়ি ছাড়ার অল্প আগে পরী ভুবনকে বোম্বে মেলের একটি খালি ফার্স্টক্লাস কামরায় তুলিয়া দিল।

'যা যা বলেছি মনে আছে ভুবন? কাল বিকেলে ঠিক ছটার সময় যেখানে গাড়ি থামবে সেইখানে নেমে যাবি।'

ভুবন বলিল, 'আমি ঘড়ি দেখতে জানি মাসি।' পকেট হইতে দশ টাকা দামের ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, 'মামা দিয়েছে। কটা বেজেছে জানো? তিনটে বেজেছে।'

'ঘড়ি দেখে কাল ঠিক ছটার সময় নেমে যাবি। গাড়ি না থামলেও লাফিয়ে নেমে যাবি। মার কাছে যাচ্ছিস কিনা, দেখিস তোর কিছু হবে না।'

ভুবন বলিল, 'আচ্ছা।'

'রেলের লোক টিকিট দেখতে চাইলে দেখাবি। খিদে পেলে খাবার কিনে খাবি। টাকা ঠিক রেখেছিস? ওটা পাঁচ টাকার নোট, জানিস তো? ভাঙিয়ে কাল খাবার কিনিস।'

'মা স্টেশনে আসবে, মাসি?'

'আসবে।'

ভুবনের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

'খোকাকে দাও না মাসি, একটা চুমু খাই।'

পরী খোকাকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিল।

'না না, এখখুনি গাড়ি ছেড়ে দেবে।'

গলির মুখে ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া খিড়কির দরজা দিয়াই পরী বাড়ি ঢুকিল। তাকে অভ্যর্থনা করিল বনমালী স্বয়ং।

'ভুবনকে কোথায় রেখে এলি পরী?'

'ভুবন? ভুবনের আমি কী জানি! বাড়ি নেই?'

বনমালী হাঁকিল, 'কেষ্ট, এদিকে আয়।'

কেষ্ট ভয়ে ভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

'তোকে ছাড়িয়ে দিলাম কেষ্ট। মাইনে যা জমেছে পাবি না। পালা, দাঁড়িয়ে থাকলে পুলিশে দেব।'

কেষ্ট কাঁদোকাঁদো হইয়া বলিল, 'কেন বাবু?'

'রাতদুপুরে তুই দোতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকিস বলে। আমার নশো টাকা চুরি গেছে।'

ঝি-চাকর, আশ্রিত ও আশ্রিতারা চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরীর বুকের মধ্যে টিপটিপ করিতেছিল।

অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভুবন কোথায় গেছে কেষ্ট? পালিয়ে গেছে?'

কেষ্টর হইয়া জবাব দিল বনমালী।

'ও জানে না। তুই ঘরে যা পরী।'

দোতলায় যে ঘরখানায় সে এতদিন ছিল, বনমালী যে সে ঘরখানার কথা বলে নাই ঘরে ঢুকিয়াই পরী তাহা টের পাইল। তার সমস্ত জিনিস অদৃশ্য হইয়াছে। ধোয়া-মোছা শূন্য ঘরের মাঝখানে সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালী আসিয়া বলিল, 'এখানে থাকতে তোর অসুবিধা হচ্ছিল বলে তোকে নীচের একটা ঘর দিয়েছি পরী। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা।'

নীচে ভাঁড়ারের পাশে একসারিতে খানসাতেক ঘর আছে, বনমালী যাদের খাইতে দেয় ওটা তাদের কলোনি অথবা বস্তি। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা ওই সারিতেই।

পরীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। ইতিমধ্যে শুধু সন্দেহের উপর তার বিচার হইয়া শাস্তির ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, এটা সে হঠাৎ ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না। এ বাড়িতে যাদের স্থান ঝি চাকরেরও নীচে, বনমালী অনায়াসে তাকে তাদের দলে নামাইয়া দিল? সারাদিন ধরিয়া সে যে নিজের অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ রচনা করিয়াছে সেটা একবার শোনাও দরকার মনে করিল না?

সে কাঁদিয়া ফেলার উপক্রম করিয়া বলিল, 'আমি কী করেছি? তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—'

কিন্তু গা সে ছুঁইবে কার? বনমালী আগাইয়া গিয়াছে, বিদায় নিয়াছে।

পরীকে নীচেই যাইতে হইল।

ক্ষেন্তি বলিল, 'কী গো, ওপোর থেকে তাড়িয়ে দিলে? বড়লোকের মর্জি দিদি, কি করবে বল।'

পরী বলিল, 'কী যে বল তার ঠিক নেই। তাড়িয়ে আবার দেবে কে? আমি যেচে এসেছি। ওপরে যে সব ম্লেচ্ছাচার—বিধবা মানুষ আমি, আমার পোষালো না।'

ক্ষেন্তি বলিল, 'ভাবলে অবাক লাগে বোন, এ বাড়ি তো একদিন তোমার নিজের দিদির ছিল! আজ যে রানি, কাল সে দাসী। হায়রে কপাল!'

ছোট স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া পরী কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষেন্তি পিছু পিছু আসিয়া বলিল, 'কাঁদছ কেন? সয়ে যাবে।'

বলিয়া সে পরীর বিছানাতে বসিল।

'শোনো বলি। কলকাতার সে বাড়িতে আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম—'

পরী বাধা দিয়া বলিল, 'থাক। তুমি যাও।'

'শোনোই না। আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম, বাড়ির রাজা আমাকে বললে, 'নীচেটা স্যাঁতসেঁতে, তুই ওপরেই থাক। তোর মার সহ্য হয়ে গেছে, কিছু হবে না, তোর অসুখ করবে। আমি—'

ক্ষেন্তির হঠাৎ খেয়াল হইল, পরী সখী নয়, ওকে শুনাইয়া বুক হালকা হইবে না।

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ঢোক গিলিয়া সে বলিল, 'ব্যাপার বুঝে আমি রাজি হলাম না। নীচে মার কাছেই রইলাম।'

পরী শুইয়া পড়িল। আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া বলিল, 'আমার জ্বর আসছে, তুমি যাও ভাই।'

একদিন হেমলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে, ভুবনের কোনো খোঁজ করলি না?'

বনমালী বলিল, 'আপদ গেছে, যাক।'

ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।

আত্মহত্যার অধিকার

বর্ষাকালেই ভয়ানক কষ্ট হয়।

ঘরের চালাটা একেবারে ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে। .

কিছু নারিকেল আর তালপাতা মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়াই কুড়াইয়া সংগ্রহ করা গিয়াছিল। চালের উপর সেগুলি বিছাইয়া দিয়া কোন লাভ হয় নাই। বৃষ্টি নামিলেই ঘরের মধ্যে সর্বত্র জল পড়ে।

বিছানাটা গুটাইয়া ফেলিতে হয়, ভাঙা বাক্সো-প্যাঁটরা কয়টা এ কোণে টানিয়া আনিতে হয়, জামাকাপড়গুলি দড়ি হইতে টানিয়া নামাইয়া পুঁটলি করিয়া কোথায় রাখিলে যে ভিজিবে কম, তাই নিয়া মাথা ঘামাইতে হয়।

বড়ো ছেলেটি কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। আদর করিয়া তাহার কান্না থামানো যায় না, ধমক দিলে কান্না বাড়ে। মেয়েটা বড়ো হইয়াছে, কাঁদে না; কিন্তু ওদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া এমন করিয়াই চাহিয়া থাকে যে, নীলমণির ইচ্ছা হয় চড় মারিয়া ওকেও সে কাঁদাইয়া দেয়। এতক্ষণ ঘুমাইবার পর এক ঘণ্টা জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইল বলিয়া ও কী চাহনি? আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে, ঘরের চাল সাত বছর মেরামত হয় নাই। ঘরের মধ্যে জল পড়াটা নীলমণির এমন কি অপরাধ যে মেয়েটা তাকে ওরকমভাবে নিঃশব্দে গঞ্জনা দিবে?

ছোটো ছেলেটাকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া নিভা একবার এধার একবার ওধার করিয়া বেড়াইতেছিল।

হঠাৎ বলিল, ওগো, ছাতিটা একবার ধরো, একেবারে ভিজে গেল যে! লক্ষ্মী, ধরো একবার ছাতিটা খুলে। ওরও কি শেষে নিমুনিয়া হবে?

নীলমণি বলিল, হয় তো হবে। বাঁচবে।

নিভা বলিল, বালাই ষাট।—শ্যামা, তুইও তো ধরতে পারিস ছাতিটা একটু?

শ্যামা নীরবে ভাঙা ছাতিটা নিভার মাথার উপর ধরিল। ছাতি মেলিবার বাতাসে প্রদীপের শিখাটা কাঁপিয়া গেল। প্রদীপে তেল পুড়িতেছে। অপচয়! কিন্তু উপায় নাই। চাল-ভেদ করা বাদলে ঘর যখন ভাসিয়া যাইতেছে তখনকার বিপদে প্রদীপের আলোর একান্ত প্রয়োজন। জিনিসপত্র নিয়া মানুষগুলি এ-কোণ ও-কোণ করিবে কেমন করিয়া?

এক ছিলুম তামাক দে শ্যামা। নীলমণি হুকুম দিল।

শ্যামা বলিল, ছাতিটা ধরো তবে?

নীলমণি আকাশের বজ্রের মতো ধমকাইয়া উঠিল : ফেলে দে ছাতি, চুলোয় গুঁজে দে। আমি ছাতি ধরব তবে উনি তামাক সাজবেন, হারামজাদি!

তামাক অবিলম্বেই হাতের কা' আগাইয়া আসিল। ঘরের পশ্চিম কোণ দিয়া কলের জলের মতো মোটা ধারায় জল পড়িয়া ইতিমধ্যেই একটা বালতি ভরিয়া গিয়াছে। সেই জলে হাত ধুইয়া শ্যামা বলিল, তামাক আব একটুখানি আছে বাবা।

দুঃসংবাদ।

এতবড় দুঃসংবাদ প্রদানকারিণীকে একটা গাল দিবার ইচ্ছা নীলমণিকে অতি কষ্টে চাপিয়া যাইতে হইল।

নীলমণি ভাবিল ঃ বিনা তামাকে এই গভীর রাত্রির লড়াই জিতিব কেমন করিয়া? ছেলের কান্না দুই কানে তিরের ফলার মত বিঁধিয়া চলিবে, মেয়েটার মুখের চাহনি লঙ্কাবাটার মতো সারাক্ষণ মুখে লাগিয়া থাকিবে, নিমুনিয়ার সঙ্গে নিভার ব্যাকুল কলহ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে শিহরিয়া শিহরিয়া মনে হইবে বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন—আর ঘরে এখন তামাক আছে একটুখানি!

তামাক আনানো হয় নাই কেন জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া নীলমণি চুপ করিয়া রহিল। প্রশ্ন করা অনর্থক, জবাব সে পরশু হইতে নিজেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে—পয়সা নাই। ছেলেটা বিকালে এক পয়সার মুড়ি খাইতে পায় নাই—তামাকের পয়সা কোথা হইতে আসিবে! নিজে গেলে হয়তো দোকান হইতে ধার আনিতে পারিত, কিন্তু—

নীলমণি খুশি হয়। এতক্ষণে ছুতা পাওয়া গিয়াছে।

তামাক নেই বিকেলে বলিসনি কেন?

আমি দেখিনি বাবা।

দেখিনি বাবা! কেন দেখোনি বাবা? চোখের মাথা খেয়েছিলে?

তুমি নিজে সেজেছিলে যে? সারাদিন আমি একবারও তামাক সাজিনি বাবা।

তা সাজবে কেন? বাপের জন্য তামাক সাজলে সোনার অঙ্গ তোমার ক্ষয়ে যাবে যে!

নীলমণির কান্না আসিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া সহসা উদ্গত অশ্রু সে দমন করিয়া লইল। না আছে তামাক, না থাক। পৃথিবীতে তার কী-ই বা আছে, যে তামাক থাকিলেই সব দুঃখ দূর হইয়া যাইত!

বাহিরে যেন অবিরল-ধারে জল পড়িতেছে না, ঘরের বায়ু যেন সাহারা হইতে আসিয়াছে, নীলমণির চোখ মুখ এত জ্বালা করিতেছিল। খানিকক্ষণ হইতে তাহার হাঁটুর উপর বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতেছিল—টপ টপ। অঞ্জলি পাতিয়া নীলমণি গুনিয়া গুনিয়া জলের ফোঁটাগুলি ধরিতে লাগিল। সিদ্ধ-করা চামড়ার মতো ফ্যাকাশে ঠোঁট নাড়িয়া সে কী বলিল ঘরের কেহই তাহা শুনিতে পাইল না। ছেলেমানুষের মতো তাহার জলের ফোঁটা সঞ্চয় করার খেলাটাও কেহ চাহিয়া দেখিল না। কিন্তু হাতে খানিকটা জল জমিলে তাই দিয়া মুখ ধুইতে গিয়া নীলমণি ধরা পড়িয়া গেল।

নিভা ও শ্যামা প্রতিবাদ করিল দুজনেই।

শ্যামা বলিল, ও কী করছ বাবা?

নিভা বলিল, পচা গলা চাল-ধোয়া জল, হ্যাঁগা, ঘেন্নাও কি নেই তোমার?

নীলমণি হঠাৎ একটু হাসিয়া বলিল, হোক না পচা জল। চাল-ধোঁয়া জল তো! এও হয়তো কাল জুটবে না নিভা!

ইহাকে সূক্ষ্ম রসিকতা মনে করিয়া নীলমণি নিজের মনে একটু গর্ব অনুভব করিল। এমন অবস্থাতেও রসিকতা করিতে পারে, মনের জোর তো তার সহজ নয়। ঘরের

চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া আনিয়া নিভার মুখের দিকে পুনরায় চাহিতে গিয়া কিন্তু তার হাসি ফুটিল না। নিভার দৃষ্টির নির্মমতা তাকে আঘাত করিল।

অবিকল শ্যামার মতো চাহিয়া আছে! এত দুঃখ, এত দুর্ভাবনা ওর চোখের দৃষ্টিকে কোমল করিতে পারে নাই, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই, রূঢ় ভর্ৎসনা আর নিঃশব্দ অসহায় নালিশে ভরিয়া রাখিয়াছে।

নীলমণি মুষড়াইয়া পড়িল।

সব অপরাধ তার। সে ইচ্ছা করিয়া নিজের স্বাস্থ্য ও কার্যক্ষমতা নষ্ট করিয়াছে, খাদ্যের প্রাচুর্যে পরিতুষ্ট পৃথিবীতে নিজের গৃহকোণে সে সাধ করিয়া দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে, ঘরের চাল পচাইয়া ফুটা করিয়াছে সে, তারই ইচ্ছাতে রাতদুপুরে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। শুধু তাই নয়, ওদের সমস্ত দুঃখ দূর করিবার মন্ত্র সে জানে। মুখে ফিশফিশ করিয়া হোক, মনে মনে নিঃশব্দে হোক, ফুসমন্তরটি একবার আওড়াইয়া দিলেই তার এই ভাঙা ঘর সরকারদের পাকা দালান হইয়া যায়, আর ঘরের কোনার ওই ভাঙা বাক্‌সোটা চোখের পলকে মস্ত লোহার সিন্দুক হইয়া ভিতরে টাকা ঝমঝম করিতে থাকে—টাকার ঝমঝমানিতে বৃষ্টির ঝমঝমানি কোনোমতেই আর শুনিবার উপায় থাকে না।

কিন্তু মন্ত্রটা সে ইচ্ছা করিয়া বলিতেছে না।

ঘণ্টাখানেক এমনিভাবে কাটিয়া গেল।

নিভা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা, রাত কত?

তা হবে, দুটো-তিনটে হবে।

একটা কিছু ব্যবস্থা কর? সারারাত জল না ধরলে এমনি বসে বসে ভিজব?

বসে ভিজতে কষ্ট হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজো।

নিভা আর কিছু বলিল না। ছেঁড়া আলোয়ানটি দিয়া কোলের শিশুকে আরও ভালো করিয়া ঢাকিয়া রুক্ষ চুলের উপর খসিয়া-পড়া ঘোমটাটি তুলিয়া দিল। স্বামীর কাছে মাথায় কাপড় দেওয়ার অভ্যাস সে এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

ছাতি ধরিয়া আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া শ্যামা তার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, মধ্যে মধ্যে তার শিহরণটা নিভা টের পাইতে লাগিল।

কাঁপছিস কেন শ্যামা? শীত করছে?

শ্যামা কথা বলিল না। একটু মাথা নাড়িল মাত্র।

নিভা বলিল, তবে ভালো করেই ছাতিটা ধর্‌ বাবু, খোকার গায়ে ছিটে লাগছে।

আঁচল দিয়া সে খোকার মুখ মুছিয়া লইল। ফিশফিশ করিয়া আপন মনে বলিল, কত জন্ম পাপ করেছিলাম, এই তার শাস্তি। নীলমণি শুনিতে পাইল, কিন্তু কিছু বলিল না। মন তার সজাগ, নির্মমভাবে সজাগ, কিন্তু চোখের পাতা দিয়া দুই চোখকে সে অর্ধেক আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, একান্ত নির্বিকার চিত্তেই সে ঝিমাইতেছে।

কিন্তু নীলমণি সবই দেখিতে পায়। তার স্তিমিত দৃষ্টিতে নিভার মুখ তেরচা হইয়া বাঁকিয়া যায়, প্রদীপের শিখাটা ফুলিয়া কাঁপিয়া ওঠে, দেয়ালের গায়ে ছায়াগুলি সহসা জীবন

পাইয়া দুলিয়া উঠিতে শুরু করে। মুখ না ফিরাইয়াই নীলমণি দেখিতে পায় ঘরের ও-কোণে গুটাইয়া রাখা বিছানার উপর উপুড় হইয়া নিমু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিরক্তির তার সীমা থাকে না। তার মনে হয় ছেলেটা তাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। দুই পা মেঝের জলস্রোতে প্রসারিত করিয়া দিয়া আকাশের গলিত মেঘে অর্ধেকটা শরীর ভিজাইতে ভিজাইতে ওইটুকু ছেলের অমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়ায় আর কী মনে হয়? এর চেয়ে ও যদি নাকি সুরে টানিয়া টানিয়া শেষ পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিত তাও নীলমণির ভালো ছিল। এ সহ্য হয় না। সন্ধ্যায় ও পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই ; ক্ষুধার জ্বালায় মাকে বিরক্ত করিয়া পেটের জ্বালায় চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ঘুমাইয়াছিল। হয়তো ওর রূপকথার পোষা বিড়ালটি এই বাদলে রাজবাড়ির ভালো ভালো খাবার ওকে চুরি করিয়া আনিয়া দিতে পারে নাই। হয়তো ঘুমের মধ্যেই ওর গালে চোখের জলের শুকনো দাগ আবার চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। এত রাত্রে দুঃখের এই প্রকৃত বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে ও তবে ঘুমায় কোন্ হিসাবে?

নিমুকে তুলে দে তো শ্যামা।

নিভা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কেন, তুলবে কেন? ঘুমোচ্ছে ঘুমোক।

ঘুমোচ্ছে না ছাই। ইয়ার্কি দিচ্ছে। ঢঙ করছে।

হ্যাঁ ইয়ার্কি দিচ্ছে! ঢঙ করছে! যেমন কথা তোমার! ঢঙ করার মতো সুখেই আছে কি না।

আধ-ঢাকা চোখ নীলমণি একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিল। ওরা যা খুশি করুক, যা খুশি বলুক। সে আর কথাটি কহিবে না।

খানিক পরে নিভা বলিল, দেখো, এমন করে আর তো থাকা যায় না। সরকারদের বাইরের ঘরটাতে উঠিগে চলো।

নীলমণি চোখ না খুলিয়াই বলিল, না।

নিভা রাগ করিয়া বলিল, তুমি যেতে না চাও থাকো, আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি।

নীলমণি চোখ মেলিয়া চাহিল।

না—যেতে পাবে না। ওরা ছোটলোক। সেবার কী বলেছিল মনে নেই?

বললে আর করছ কী শুনি? রাতদুপুরে বিরক্ত করলে অমন সবাই বলে থাকে।

নীলমণি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, বলে থাকে? রাতদুপুরে বিপদে পড়ে মানুষ আশ্রয় নিতে গেলে বলে থাকে—এ কি জ্বালাতন? ওইটুকু শিশুর জন্য একটু শুকনো ন্যাকড়া চাইলে বলে থাকে—কাপড়জামা সব ভিজে? ময়লা হবার ভয়ে ফরাশ তুলে নিয়ে ছেঁড়া সতরঞ্চি অতিথিকে পেতে দেয়?—যেতে হবে না। বাস্।

নিভা অনেক সহ্য করিয়াছে। এবার তার মাথা গরম হইয়া গেল।

ছেলেমেয়ে বউকে বর্ষাবাদলে মাথা গুঁজবার ঠাঁই দিতে পারে না, অত মান-অপমান জ্ঞান কী জন্যে? আজ বাদে কাল ভিক্ষে করতে হবে না?

নীলমণি বলিল, চুপ।

এক ধমকেই নিভা অনেকখানি ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

চুপ করেই আছি চিরটা কাল। অন্য মানুষ হলে—

হাতের কাছে ঘটিটা তুলিয়া লইয়া নীলমণি বলিল, চুপ। একদম চুপ। আর একটা কথা কইলে খুন করে ফেলব।

. কথা কেউ বলছে না। নিভা একেবারে নিবিয়া গেল।

শ্যামা ঢুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বাপের গর্জনে সে চমকাইয়া সজাগ হইয়া উঠিল। কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, মা, ভুলু দরজা আঁচড়াচ্ছে।

গরিবের মেয়ে, হা-ঘরের বউ, নিভার মেরুদণ্ড বলিতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু তার বদলে যা ছিল, নিরপরাধ মেয়ের উপর ঝাঁঝিয়া উঠিবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

আঁচড়াচ্ছে তো কী হবে? কোলে তুলে নিয়ে এসে নাচো!—ভালো করে ছাতি ধরে থাক শ্যামা, মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেব।

নীলমণি বলিল, আমার লাঠিটা কই রে?

শ্যামার মুখ পাংশু হইয়া গেল। সে মিনতি করিয়া বলিল, মেরো না বাবা। দরজা না খুললে ও আপনিই চলে যাবে।

তোকে মাতব্বরি করতে হবে না, বুঝলি? চুপ করে থাক।

বাঁ পা-টি আংশিকভাবে অবশ, হাতে ভর দিয়া নীলমণি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কোনায় তার মোটা বাঁশের লাঠিটি ঠেস দেওয়া ছিল, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া লাঠিটা সে আয়ত্ত কবিল। উঠানবাসী লোমহীন নির্জীব কুকুরটার উপর তার সহসা এত রাগ হইয়া গেল কেন কে জানে! বেচারি খাইতে পায় না, কিন্তু প্রায়ই অদৃষ্টে প্রহার জোটে, তবু সে এখানেই পড়িয়া থাকে, সারারাত শিয়াল তাড়ায়। শ্যামা একটু করুণার চোখে না দেখিলে এত দিনে ওর অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া যাইত। কিন্তু নীলমণি কুকুরটাকে দেখিতে পারে না। ধুঁকিতে ধুঁকিতে লাথিঝাঁটা খাইয়া মৃত্যুর সঙ্গে ওর লজ্জাকর সকরুণ লড়াই চাহিয়া দেখিয়া তার ঘৃণা হয়, গা জ্বালা করে।

শ্যামা আবার বলিল, মেরো না বাবা, আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি।

নীলমণি দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, মারব? মার খেয়ে আজ রেহাই পাবে ভেবেছিস? আজ ওর ভবযন্ত্রণা দূর করে ছাড়ব।

ভবযন্ত্রণা নিঃসন্দেহ, কিন্তু শ্যামা শুনিবে কেন? পেটের ক্ষুধায় এখনো তার কান্না আসে, ছেঁড়া কাপড়ে তার সর্বাঙ্গ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া থাকে ; তার বুকে ভাষা আছে, মনে আশা আছে। ভবযন্ত্রণা সহ্য করিতে তার শক্তির অকুলান হয় না, বরং একটু বাড়তিই হয়। ওইটুকু শক্তি দিয়া সে বর্তমান জীবন হইতেও রস নিংড়াইয়া বাহির করে,—হোক পান্‌সা, এও তুচ্ছ নয়। ভুলুর মতো কুকুরটিরও মরিবার অথবা তাকে মারিবার কল্পনা শ্যামার কাছে বিষাদের ব্যাপার। তার সহ্য হয় না।

ছাতি ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া শ্যামা নীলমণির লাঠি ধরিল। কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলিল, না বাবা, মেরো না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি বাবা!

নীলমণি গর্জন করিয়া বলিল, লাঠি ছাড় শ্যামা, ছেড়ে দে বলছি। তোকেই খুন করে ফেলব আজ।

শ্যামা লাঠি ছাড়িল না। তারও কি মাথার ঠিক আছে? লাঠি ধরিয়া রাখিয়াই সে বারবার নীলমণির পায়ে পড়িতে লাগিল।

নিভা বলিল, কী জিদ মেয়ের। ছেড়েই দে না বাবু লাঠিটা।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নীলমণি বলিল, জিদ বার করছি।

লাঠিটা নীলমণিকে মেয়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইল ; কিন্তু বেড়ার ঘরের বেড়ার অনেকগুলি বাতাই আলগা ছিল।

মেয়েকে মারিয়া নীলমণির মন এমন খারাপ হইয়া গেল বলিবার নয়। না মারিয়া অবশ্য উপায় ছিল না। ওরকম রাগ হইলে সে কখনো সামলাইতে পারে নাই, কখনো পারিবেও না। মন খারাপ হওয়ার কারণটাও হয়তো ভিন্ন। কে বলিতে পারে? মেয়েকে না মারিয়াও তো মাঝে মাঝে তার মরিতে ইচ্ছা করে!

জীবনে লজ্জা, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু, শোকের তো অভাব নাই। মন খারাপ হইবার, দশ বছর জ্বর ভোগ করিয়া যেমন হয় তেমনি মন খারাপ হইবার কারণ জাগিয়া থাকার প্রত্যেকটি মুহূর্তে এবং ঘুমানোর সময় দুঃস্বপ্নে!

কয়েক মিনিট আগে বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিয়াছিল। হঠাৎ আবার আগের চেয়েও জোরে আরম্ভ হইয়া গেল। নীলমণির মান-অপমান জ্ঞানটা এবার আর টিকিল না।

লণ্ঠনে তেল আছে শ্যামা?

শ্যামা একবার ভাবিল চুপ করিয়া থাকিয়া রাগ আর অভিমান দেখায়, কিন্তু সাহস পাইল না।

একটুখানি আছে বাবা।

জ্বাল তবে।

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, লণ্ঠন কী হবে?

সরকারদের বাড়ি যাব। ফের চেপে বৃষ্টি এল দেখছ না?

যেন সরকারদের বাড়ি যাইতে নিভাই আপত্তি করিয়াছিল।

শ্যামা বলিল, দেশলাই কোথা রাখলে মা?

নিভা বলিল, দেশলাই? কেন, পিদিম থেকে বুঝি লণ্ঠন জ্বালানো যায় না? চোখের সামনে পিদিম জ্বলছে, চোখ নেই?

নীলমণি বলিল, ওর কি জ্ঞানগম্যি কিছু আছে?

নিজের মুখের কথাগুলি খচখচ করিয়া মনের মধ্যে বেঁধে। এ যেন তোতাপাখির মতো অভাবগ্রস্তের মানানসই মুখস্থ বুলি আওড়ানো। বলিতে হয় তাই বলা, না বলিলে চলে না সত্য ; কিন্তু আসলে বলিয়া কোনো লাভ নাই।

সাত বছরের পুরানো লণ্ঠন জ্বালানো হইল।

নিভা মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবু, ছাতিতে আটকাবে না। আর একখানা কাপড় জড়িয়ে নি। দে তো শ্যামা, শুকনো কিছু দে তো। আর এক কাজ কর—দুটো-তিনটে কাপড় পুঁটলি করে নে। ওখানে গিয়ে সব্বাইকে কাপড় ছাড়তে হবে। আমার দোক্তার কৌটো নিস।

নীলমণি একটু মিষ্টি করিয়াই বলিল, হুঁকোটা নিতে পারবি শ্যামা? লক্ষ্মী মা-টি আমার, —পারবি? জল ফেলেই নে না, ওখানে গিয়ে ভরে নিলেই হবে। জলের কী অভাব!—তামাকটুকু ফেলে যাস নে ভুলে।

সব ব্যবস্থাই হইল, নিমুর কান্নায় কর্ণপাত না করিয়া তাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া পিঠে একটা ছেঁড়া চটের বস্তা চাপাইয়া দেওয়া হইল।

দরজা খুলিয়া তারা উঠানে নামিয়া গেল। উত্তরের ভিটার ঘরখানা গত বৎসরও খাড়া ছিল, এবারকার চতুর্থ বৈশাখী ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে ; সময়মতো অন্তত দুটি খুঁটি বদলাইতে পারিলেও এটা ঘটিত না। ভুলু বোধহয় ওই ভগ্নস্তূপটির মাঝেই কোথাও মাথা গুঁজিয়া ছিল, মানুষের সাড়া পাইয়া বাহির হইয়া আসিল। তখন ঘরের দরজায় তালা লাগানো হইয়া গিয়াছে। দরজা আঁচড়াইয়া ভুলু সকরুণ কান্নার সঙ্গে কুকুরের ভাষায় বলিতে লাগিল—দরজা খোলো, দরজা খোলো।

বাড়ির সামনে একহাঁটু কাদা, তার পরেই পিছল এঁটেল মাটি। ছেলে লইয়া আছাড় খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়া নিভা দেবতাকেই গাল দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কষ্ট নীলমণিরই বেশি ; শুকনো ডাঙাতেই বাঁ পায়ের পদক্ষেপটি তাকে চট করিয়া ডিঙাইয়া যাইতে হয়, —এখন তাহার পা আর লাঠি দুই-ই কাদায় ঢুকিয়া যাইতে লাগিল। লাঠি টানিয়া তুলিলে পা আটকাইয়া থাকে, পা তুলিলে লাঠি পোঁতা হইয়া যায়। নিভার তাকাইবার অবসর নাই। শ্যামার ঘাড়ে কাপড়ের পুঁটুলি, হুঁকা-কলকি, লণ্ঠন আর নিমুর ভার। তবু শ্যামাই নীলমণির বিপদ উদ্ধার করিয়া দিতে লাগিল।

ঘোষেদের পুকুরটা পাক দিলে সরকারদের বাড়ি। পুকুরটা ভরিয়া গিয়া পাড় ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম কোনার প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটার তলা দিয়া তিন-চার হাত চওড়া এক সংক্ষিপ্ত স্রোতস্বিনী সৃষ্টি হইয়াছে। তেঁতুল গাছটার জমকালো আবছা চেহারা দেখিলে গা ছমছম করে। ভরপুর পুকুরের বুকে শ্যামার হাতের আলো যে লম্বা সোনালি পাত ফেলিয়াছে, প্রত্যেক মুহূর্তে হাজার বৃষ্টির ফোঁটায় তাহা অজস্র টুকরায় ভাঙিয়া যাইতেছে।

নীলমণি থমকিয়া দাঁড়াইল। কাতর স্বরে বলিল, ও শ্যামা, পার হব কী করে!

শ্যামা বলিল, জল বেশি নয় বাবা, নিমুর হাঁটু পর্যন্তও ওঠে নি। চলে এসো।

সুখের বিষয় স্রোতের নিচে কাদা ধুইয়া গিয়াছিল, নীলমণির পা অথবা লাঠি আঁটিয়া গিয়া তাকে বিপন্ন করিল না, তবু এতখানি সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও নীলমণির দুচোখ একবার সজল হইয়া উঠিল। বাহির হওয়ার সময় সে কাপড়টা গায়ে জড়াইয়া লইয়াছিল, এখন ভিজিয়া গায়ের সঙ্গে আঁটিয়া গিয়াছে। খানিকক্ষণ হইতে জোর বাতাস উঠিয়াছিল, নীলমণির শীত করিতে লাগিল। জগতে কোটি কোটি মানুষ যখন উষ্ণ শয্যায় গাঢ় ঘুমে পাশ ফিরিয়া পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিতেছে—সপরিবারে অক্ষম দেহটা টানিয়া টানিয়া সে তখন চলিয়াছে কোথায়? যে প্রকৃতির অত্যাচারে ভাঙা ঘরে টিকিতে না পারিয়া তাকে আশ্রয়ের খোঁজে পথে নামিয়া আসিতে হইল, সেই প্রকৃতিরই দেওয়া নির্মমতায় হয়তো সরকাররা দরজা খুলিবে না, ঘুমের ভান করিয়া বিছানা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। না, নীলমণি আর যুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তার শক্তি নাই, কিন্তু আক্রমণ চারিদিক হইতে ; পেটের ক্ষুধা, দেহের

ক্ষুধা, শীত, বর্ষা, রোগ, বিধাতার অনিবার্য জন্মের বিধান,—সে কোন্ দিক সামলাইবে? সকলে যেখানে বাঁচিতে চায়, লাখ মানুষের জীবিকা একা জমাইতে চায়, কিন্তু কাহাকেও বাঁচাইতে চায় না, সেখানে সে বাঁচিবে কিসের জোরে?

স্রোত পার হইয়া গিয়া লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া শ্যামা দাঁড়াইয়া আছে। পাশেই ভরাট পুকুরটা বৃষ্টির জলে টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। নীলমণি সাঁতার জানিত না। কিন্তু জানিত যে পুকুরের পাড়টা এখানে একেবারে খাড়া! একবার গড়াইয়া পড়িলেই অথই জল, আর উঠিয়া আসিতে হইবে না।

নিভা তাড়া দিতেছিল। শ্যামা বলিল, বাবা চলে এসো? দাঁড়ালে কেন?

নীলমণি চলিতে আরম্ভ করিল; ডাইনে নয়. বাঁয়েও নয়। সাবধানে, সোজা শ্যামার দিকে।

হঠাৎ শ্যামা চিৎকার করিয়া উঠিল, মাগো, সাপ!

পরক্ষণে আনন্দে গদগদ হইয়া বলিল, সাপ নয় গো, সাপ নয়, মস্ত শোল মাছ! ধরেছি ব্যাটাকে। ইঃ, কী পিছল!

তাড়াতাড়ি আগাইবার চেষ্টা করিয়া নীলমণি বলিল, শক্ত করে ধর, দুহাত দিয়ে ধর, —পালালে কিন্তু মেরে ফেলব শ্যামা!

সরকাররা বছর তিনেক দালান তুলিয়াছে। এখনও বাড়িসুদ্ধ সকলে বাড়ি বাড়ি করিয়া পাগল। বলে, বেশ হয়েছে, না? দোতালায় দুখানা ঘর তুললে, বাস্ আর দেখতে হবে না।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর সরকারদের বড়োছেলে বাহিরের ঘরের দরজা খুলিল। বলিল, ব্যাপার কি? ডাকাত নাকি?

নীলমণি বলিল, না ভাই, আমরা। ঘরে তো টিকতে পারলাম না ভায়া, সব ভেসে গেছে। ভাবলাম তোমাদের বৈঠকখানায় তো কেউ শোয় না, রাতটুকু ওখানেই কাটিয়ে আসি।

বড়োছেলে বলিল, সন্ধ্যাবেলা এলেই হত!

নীলমণি কষ্টে একটু হাসিল ঃ সন্ধ্যায় কি বৃষ্টি ছিল ভাই? দিব্যি ফুটফুটে আকাশ—মেঘের চিহ্ন নেই। রাতদুপুরে হঠাৎ জল আসবে কে জানত!

নিভা ছাতি বন্ধ করিয়া ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মাসিকের ছবির সদ্যস্নাতার অবস্থায় পড়িয়া শ্যামা লজ্জায় মার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে! নিভার এটা ভালো লাগিতেছিল না। কিন্তু বড়োছেলের সামনে কিছু বলিবার উপায় নাই।

বড়োছেলে বলিল, বেশ থাকুন। কিন্তু চৌকি পাবেন না, চৌকিতে আমার পিসে শুয়েছে। আপনাদের মেঝেতে শুতে হবে।

তা হোক ভাই, তা হোক। ভিজতে না হলেই ঢের। একখানা কম্বলটম্বল—?

ওই কোণে চট আছে।

বড়োছেলে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

নীলমণি ঝাঁঝালো হাসি হাসিয়া বলিল, দেখলে? তখনি বলেছিলাম শুধু জুতো মারতে বাকি রাখবে।

নিভা বলিল, ঘরে যে থাকতে দিয়েছে তাই ভাগ্যি বলে জেনো!

নীলমণি তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলিল, তা ঠিক।

ঘরে অর্ধেকটা জুড়িয়া চৌকি পাতা, বড়োছেলের পিসে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া তাহাতে কাত হইয়া শুইয়া আছে। শ্যামা লণ্ঠনটা মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া চৌকির উপরে আলো পড়ে নাই, তবু এ বাড়ির আত্মীয়কেও ফরাশ তুলিয়া লইয়া শুধু সতরঞ্চির উপর শুইতে দেওয়া হইয়াছে, এটুকু টের পাইয়া নীলমণি একটু খুশি হইল। বড়োছেলের পিসে!—আপনার লোক। সে যদি ওরকম ব্যবহার পাইয়া থাকে তবে তারা যে লাথি-ঝাঁটা পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য!

চারিদিকে চাহিয়া নীলমণির খুশির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। সুখশয্যা না জুটুক, নিবাত, শুষ্ক, মনোরম আশ্রয় তো জুটিয়াছে। ঘরের এদিকে একটিমাত্র ছোট় জানালা খোলা ছিল, নিভা ইতিমধ্যেই সেটি ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বাস্, বাহিরের সঙ্গে আর তাদের কোনো সম্পর্ক নাই। আকাশটা আজ একরাত্রেই গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যাক, ঝড় উঠুক, শিল পড়ুক, পৃথিবীর সমস্ত খড়ের ঘরগুলি ভাঙিয়া পড়ুক,—তারা টেরও পাইবে না।

নীলমণির মেজাজ যেন ম্যাজিকে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত মোলায়েম শোনাইল।

ও শ্যামা, দাঁড়িয়ে থাকিস নি মা, চটগুলো বিছিয়ে দে চট করে। একটু গড়াই। আহা, ভিজে কাপড়টা ছেড়েই নে আগে, তাড়াতাড়ির কী আছে। এতক্ষণই গেল, না হয় আরও খানিকক্ষণ যাবে। ওগো, শুনছ? দাও না, খোকাকে চৌকির এক পাশেই একটু শুইয়ে দাও না, দিয়ে তুমিও কাপড়টা ছেড়ে ফ্যালো। গলা নামাইয়া ফিশফিশ করিয়া বলিল, ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন, অত লজ্জাটা কিসের শুনি? লজ্জা করে দরজা খুলে বারান্দায় চলে যাও না!

কাপড় ছাড়া হইল। বাহিরে এখন পুরাদমে ঝড় উঠিয়াছে। ঘরের কোথাও এতটুকু ছিদ্র নাই, কিন্তু বাতাসের কান্না শোনা যায়। চাপা একটানা সাঁ সাঁ শব্দ। তাদের—নীলমণি তার তার পরিবারকে, নাগালের মধ্যে না পাইয়া প্রকৃতি যেন ফুঁসিতেছে।

নীলমণির মনে হইল, এ একরকম শাসানো। পঞ্চভূতের মধ্যে যার ভাষা আছে সে ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছে, আজ বাঁচিয়া গেলে। কিন্তু কাল? কাল কী করিবে? পরশু? তার পরদিন? তারও পরের দিন?

শ্যামা চট বিছাইতেছিল, বলিল, মাগো কী গন্ধ!

নিভা বলিল, নে ঢং করতে হবে না, তাড়াতাড়ি কর।

নীলমণি বলিল, ঝেড়ে ঝেড়ে পাত না।

নিভা বলিল, না না, ঝাড়িস নি। ধুলোয় চাদ্দিক অন্ধকার হয়ে যাবে।

নিভা ছেলেকে স্তন দিতেছিল, কথাটা শেষ করিয়াই সে দমক মারিয়া চৌকির দিকে পিছন করিয়া বসিল।

নীলমণি চাহিয়া দেখিল, বড়োছেলের পিসে চাদর ফেলিয়া চৌকিতে উঠিয়া বসিয়াছে। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় পিসের মূর্তি দেখিয়া নীলমণি শিহরিয়া উঠিল। একটা শব যেন সহসা বাঁচিয়া উঠিয়াছে। মাথার চুল প্রায় ন্যাড়া করিয়া দেওয়ার মতো ছোট ছোট করিয়া

ছাঁটা, চোখ যেন মাথার অর্ধেকটা ভিতরে চলিয়া গিয়াছে, গালের ঢিলা চামড়ার তলে হাড় উঁচু হইয়া আছে। বুকের সবগুলি পাঁজর চোখ বুজিয়া গোনা যায়। বুকের বাঁ পাশে কী ঠিক চামড়ার নীচেই হৃৎপিণ্ডটা ধুকধুক করিতেছে।

পিসে নিশ্বাসের জন্য হাঁপাইতেছিল। খানিক পরে ক্ষীণস্বরে বলিল, একটা জানলা খুলে দিন।

নীলমণি সভয়ে বলিল, দে তো শ্যামা, জানালাটা খুলে দে।

শ্যামা আরও বেশি ভয়ে ভয়ে বলিল, ঝড় হচ্ছে যে বাবা!

হোক, খুলে দে।

শ্যামা পশ্চিমের ছোটো জানালাটি খুলিয়া দিল। ঝড় পুবদিক হইতে বহিতেছিল, মাঝে মাঝে এলোমেলো একটু বাতাস আর ছিটেফোঁটা একটু বৃষ্টি ঘরে ঢোকা ছাড়া জানালাটি খুলিয়া দেওয়ায় বিশেষ কোনো মারাত্মক ফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভীরু নিভা ছেলের গায়ে আর এক পরত কাপড় জড়াইয়া দিল।

পিসে বলিল, ঘুমের ঘোরে কখন চাদর মুড়ি দিয়ে ফেলেছি, আর একটু হলেই দম আটকাতো! বাপ্!

নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল, আপনার অসুখ আছে না কি?

পিসে ভর্ৎসনার চোখে চাহিয়া বলিল, খুব মোটাসোটা দেখছেন বুঝি? অসুখ না থাকলে মানুষের এমন চেহারা হয়? চার বচ্ছর ভুগছি মশায়, মরে আছি একেবারে। যম ব্যাটাও কানা, এত লোককে নিচ্ছে, আমায় চোখে দেখতে পায় না। যে কষ্টটা পাচ্ছি মশায় শত্রুও যেন—

ব্যারামটা কী?

পিসে রাগিয়া বলিল, টের পান না? এমন করে শ্বাস টানছি দেখতে পান না? পাবেন কেন, আপনার কী! যার হয় সে বোঝে।

বোঝা গেল, পিসের মেজাজটা খিটখিটে!

নীলমণি নম্রভাবে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আহা, সেরে যাবে. ভালো মতো চিকিচ্ছে হলেই সেরে যাবে।

পিসে বলিল, হুঁ, সারবে। আমকাঠের তলে গেলে সারবে। চিকিচ্ছের কি আর কিছু বাকি আছে মশায়? ডাক্তার কবরেজ জলপড়া কিচ্ছুটি বাদ যায় নি। আজ চার বছর ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছি, কোনো ব্যাটা সারাতে পারল!

কথার মাঝে মাঝে পিসে হাপরের মতো শ্বাস টানে, এক-একবার থামিয়া গিয়া ডাঙায় তোলা মাছের মতোই চোখ কপালে তুলিয়া খাবি খায়। নীলমণির গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল। বাতাস! পৃথিবীতে কত বাতাস! তবুও ফুসফুস ভরাইতে পারে না। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে সে উপবাসী. পঞ্চাশ মাইল গভীর বায়ুস্তরে ডুবিয়া থাকিয়া ওর দম আটকাইল।

পিসে বলিল, কী বলে জানেন? বলে, ভয় কী, সেরে যাবে। বলে সবাই টাকা নেয়, চিকিৎসে করে। শেষে বলে, না বাপু তোমার সারবে না, এসব ব্যারাম সারে না। আমি বলি, ওরে চোর ডাকাত ছুঁচোর দল! সারাতে পারবি না তো মেরে ফ্যাল, দে মরবার ওষুধ দে।

উত্তেজনায় পিসে জোরে জোরে হাঁপাইতে লাগিল। নীলমণি কথা বলিল না, তার বিনিদ্র আরক্ত চোখদুটি কেবলই মিটমিট করিয়া চলিল।

তেল কমিয়া আসায় আলোটা দপদপ করিতেছে, এখনই নিবিয়া যাইবে। ছেলেকে বুকে জড়াইয়া হাতকে বালিশ করিয়া নিভা দুর্গন্ধ ছেঁড়া চটে কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শ্যামা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে।

নীলমণির হুঁকা-কলকি শ্যামা জানালায় নামাইয়া রাখিয়াছিল। আলোটা নিবিয়া যাওয়ার আগে নীলমণি বাকি তামাকটুকু সাজিয়া লইল। তারপর ঠেস দিয়া আরাম করিয়া পিসের শ্বাস টানার মতো সাঁ সাঁ শব্দ করিয়া জলহীন হুঁকায় তামাক টানিতে লাগিল।

কুষ্ঠরোগীর বউ

কোনো নৈসর্গিক কারণ থাকে কিনা ভগবান জানেন, মাঝে মাঝে মানুষের কথা আশ্চর্য রকম ফলিয়া যায়। সমবেত ইচ্ছাশক্তির মর্যাদা দিবার জন্যও ভগবান বিনিদ্র রজনী যাপন করেন না, মানুষের মর্মাহত অভিশাপের অর্থও জ্বালাময় অক্ষমতা ঘোষণা করার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। তবু মাঝে মাঝে প্রতিফল ফলিয়া যায়, বিষাক্ত এবং ভীষণ!

একথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড় স্কেলে করিতে পারার নাম বড়লোক হওয়া? পকেট হইতে চুপিচুপি হারাইয়া গিয়া যেটি পথের ধারে আবর্জনার তলে আত্মগোপন করিয়া থাকে সেটি ছাড়া নারীর মতো মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই। কম এবং বেশি অর্থোপার্জনের উপায় তাই একেবারে নির্ধারিত হইয়া আছে, কপালের ঘাম আর মস্তিষ্কের শয়তানি। কারো ক্ষতি না করিয়া জগতে নিরীহ ও সাধারণ হইয়া বাঁচিতে চাও, কপালের পাঁচশো ফোঁটা ঘামের বিনিময়ে একটি মুদ্রা উপার্জন কর ঃ সকলে পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্বাদ করিবে। কিন্তু বড়লোক যদি হইতে চাও মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ কর। তোমার জন্মগ্রহণের আগে পৃথিবীর সমস্ত টাকা মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দখল করিয়া আছে। ছলে বলে কৌশলে যে ভাবে পারো তাহাদের সিন্দুক খালি করিয়া নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমাও। মানুষ পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিশাপ দিবে।

ধনী হওয়ার এ ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই।

সুতরাং বলিতে হয় যতীনের বাবা অনন্যোপায় হইয়াই অনেকগুলি মানুষের সর্বনাশ করিয়া কিছু টাকা করিয়াছিল। সকলের উপকার করিয়া টাকা করিবার উপায় থাকিলে এমন কাজ সে কখনও করিত না। তাই, জীবনের আনাচে-কানাচে তাহার যে অভিশাপ ও ঈর্ষার বোঝা জমা হইয়াছিল সেজন্য তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা চলে না। তবু সংসারে চিরকাল পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয় হইয়া থাকে এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন বাপের জমা করা টাকাগুলি হাতে পাইয়া ভালো করিয়া ভোগ করিতে পারার আগেই মাত্র আটাশ বছর বয়সে যতীনের হাতে কুষ্ঠরোগেব আবির্ভাব ঘটিল।

লোকে যা বলিয়াছিল অবিকল তাই। একেবারে কুষ্ঠব্যাধি।

মহাশ্বেতা একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ 'তোমার আঙুলে কি হয়েছে?'

'কি জানি। একটা ফুসকুড়ির মতো উঠেছিল।'

মহাশ্বেতা আঙুলটা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া বলিল ঃ 'ফুসকুড়ি নয়। চারদিকটা লাল হয়েছে।'

'আঙুলটা কেমন অসাড় অসাড় লাগছে শ্বেতা।'

'একটু টিনচার আইডিন লাগিয়ে দেব? নয়তো বলো একটা চুমো খেয়ে দিচ্ছি, এক চুমোতে সেরে যাবে।'

আঙুলটি চুম্বন করিয়া মহাশ্বেতা হাসিল।

'পুরুষ মানুষের আঙুল তো নয়, উর্বশী মেনকার কাছ থেকে যেন ধার করেছো। বাবা, মানুষের আঙুলের রং পর্যন্ত এমন টুকটুকে হয়! রক্ত যেন ফেটে পড়ছে!'

আঙুলটি যে হাতে লাগানো ছিল স্বামীর সেই হাতটি মহাশ্বেতা নিজের গলায় জড়াইয়া দিল। জীবনে যে-কথা সে বহুবার বলিয়াছে আজ আর একবার সেই কথাই বলিল।

'এ তোমার ভারী অন্যায় তা জানো? তুমি এত সুন্দর বলেই তো আমার ধাঁধা লাগে! তোমাকে ভালোবাসি, না তোমার চেহারাকে ভালোবাসি বুঝতে পারি না। শুধু কি তাই গো? হুঁ, তবে আর ভাবনা কি ছিল! দিনরাত কীরকম ভাবনায়-ভাবনায় থাকি তোমার হলে টের পেতে। ঈর্ষায় জ্বলে মরি যে!'

তারপর আরও কিছুকাল বোঝা গেল না। শুধু আঙুল নয়, যতীনের হাতে দু-তিন জায়গায় তামার পয়সার মতো গোলাকার কয়েকটা তামাটে দাগ যখন দেখা দিল, তখনো নয়। মহাশ্বেতার শুধু মনে হইল, যতীনের শরীরটা বুঝি ভালো যাইতেছে না, গায়ের রংটা তাহার রক্ত খারাপ হওয়ার জন্য কীরকম নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। একটা টনিক খাওয়া দরকার।

'দ্যাখো, তুমি একটা টনিক খাও।'

'টনিক খেয়ে কি হবে?'

'আহা, খাও না। শরীরটা যদি একটু সারে!'

যতীন টনিক খাইল। কিন্তু টনিকে এ ব্যাধির কিছু হইবার নয়। ক্রমে আরও কয়েকটা আঙুলে তাহার ফুসকড়ি দেখা দিল। শরীরের চামড়া আরও কর্কশ, আরও মরা মরা দেখাইতে লাগিল। চোখের কোল এবং ঠোঁট কেমন একটা অস্বাস্থ্যকর মৃত মাংসের রূপ লইয়া অল্প অল্প ফুলিয়া উঠিল। স্পর্শ অনুভব করিবার শক্তি তাহার ক্ষীণ হইয়া আসিল। চিমটি কাটিলে তাহার যেন আর তেমন ব্যথা বোধ হয় না। দিবারাত্রি একটা ভোঁতা অস্বাস্থ্যকর অনুভূতি তাহাকে বিষণ্ণ ও খিটখিটে করিয়া রাখিল। এবং সকলের আগে যে আঙুলের ছোট একটি ফুসকুড়িকে মহাশ্বেতা চুম্বন করিয়া টিনচার আইডিন লাগাইয়া দিয়াছিল সেই আঙুলেই তাহার পচন ধরিল প্রথম।

ষোলো টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন : 'আপনাকে বলতে সংকোচ বোধ করছি, আপনার কুষ্ঠ হয়েছে।'

বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন : 'টাইপটা খারাপ। একেবারে সেরে উঠতে সময় নেবে।'

'সেরে তা হলে যাবে ডাক্তারবাবু?'

'যাবে না? ভয় পান কেন? রোগ যখন হয়েছে সারতেও পারে নিশ্চয়।'

এমন করিয়া ডাক্তার কথাগুলি বলিলেন, আশ্বাস দিবার চেষ্টাটা তাহার এত বেশি সুস্পষ্ট হইয়া রহিল যে কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যতীনের এ মহাব্যাধি কখনও সারিবে না।

একশো টাকা ভিজিটের ডাক্তার বলিলেন : 'যতটা সম্ভব লোকালাইজড্ করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। তার বেশি এখন কিছু করা অসম্ভব। জানেন তো রোগটা ছোঁয়াচে, সাবধানে থাকবেন। আপনাকে তো বলাই বাহুল্য যে ছেলেমেয়ে হওয়াটা...বোঝেন না?'

বোঝে না? যতীন বোঝে, মহাশ্বেতা বোঝে। কিন্তু ছ-মাস আগে যদি এই বোঝাটা বোঝা যাইত!

মহাশ্বেতা যেন মরিয়া গিয়াছে। অন্যায় অসঙ্গত অপঘাতে অকথ্য যন্ত্রণা পাইয়া সদ্য সদ্য মরিয়া গিয়াছে। বিমূঢ় আতঙ্কে বিহ্বলের মতো হইয়া সে বলিল : 'তোমার কুষ্ঠ হয়েছে? ও ভগবান, কুষ্ঠ!'

যতীন তখনও মরে নাই, মরিতেছিল। সাধারণ কথার সুর তাল লয় মান সমস্ত বাদ দিয়া সে বলিল : 'কী পাপে আমার এমন হল শ্বেতা?'

'তোমার পাপ কেন হবে গো? আমার কপাল।'

নিজের বাড়িতে আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে যতীন হইয়া রহিল অস্পৃশ্য। গৃহের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইবার সাধ থাকিলে বাধা অবশ্য কেহই তাহাকে দিতে পারিত না। কিন্তু সে গোপনতা খুঁজিয়া লইল। বাড়ির একটা অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সেখানে নিজেকে সে নির্বাসিত ও বন্দি করিয়া রাখিল। মহাশ্বেতা ছাড়া আর কাহারও সেদিকে যাইবার হুকুম রহিল না। বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিয়া বাহির হইতে ফিরিয়া গেল, সামনাসামনি মৌখিক সহানুভূতি জানাইবার চেষ্টা করিয়া আত্মীয়স্বজন হইয়া গেল ব্যর্থ। যতীন নিজের পচনধরা দেহকে কারও চোখের সামনে বাহির করিতে রাজি হইল না। নিজের ঘরে সে রেডিও বসাইল, স্তূপাকার বই আনিয়া জমা করিল, ফোন বসাইয়া বাড়ির অন্য অংশ এবং বাহিরের জগতের সঙ্গে একটা অস্পষ্ট চাপা শব্দের সংযোগ স্থাপিত করিয়া লইল। জীবনযাপনের প্রথায় আকস্মিক পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের সীমা পরিসীমা রহিল না।

পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বর্জন করিলেও মহাশ্বেতাকে সে কিন্তু ছাড়িতে পারিল না। নিকটতম আত্মীয়ের দৃষ্টিকে পর্যন্ত পরিহার করিয়া বাঁচিয়া থাকার মতো মনের জোর সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিল বলা যায় না, কিন্তু মহাশ্বেতার সম্বন্ধে সে শিশুর মতোই দুর্বলচিত্ত হইয়া রহিল। আপনার সংক্রামক ব্যাধিটিকে আপনার দেহের মধ্যেই সংহত করিয়া রাখিয়া মৃত্যু পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া চিতার আগুনে ভস্ম করিয়া ফেলিবার যে অনমনীয় প্রতিজ্ঞা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিল, মনে হইল, মহাশ্বেতাকে সে বুঝি তাহার সেই আত্ম-প্রতিশ্রুতির অর্ন্তগত করে নাই। আত্মীয়পর সকলের জন্য সাবধান হইতে গিয়া মহাশ্বেতার বিপদের কথাটা সে ভুলিয়া গিয়াছে। জীবনটা এতকাল ভাগাভাগি করিয়া আসিয়াছে বলিয়া দেহের এই কদর্য রোগের ভাগটাও মহাশ্বেতাকে যদি আজ গ্রহণ করিতে হয়, তাহার যেন কিছুই বলিবার নাই।

স্ত্রীকে সে সর্বদা কাছে ডাকে, সব সময় কাছে রাখিতে চেষ্টা করে। কাছে বসিয়া মহাশ্বেতা তার সঙ্গে কথা বলুক, তাকে বই পড়িয়া শোনাক। রেডিওতে ভালো একটা গান বাজিতেছে, পাশাপাশি বসিয়া গানটা না শুনিলে একা যতীনের শুনিতে ভালো লাগে না। ফোনে সে কার সঙ্গে কথা বলিবে নম্বরটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া কানেকশন লইয়া রিসিভারটা মহাশ্বেতা তাহার হাতে তুলিয়া দিক। আর তা না হয় তো সে শুধু কাছে বসিয়া থাক, যতীন তাহাকে দেখিবে।

মহাশ্বেতা এসব করে। খানিকটা কল বনিয়া যাওয়া মানুষের মতো যতীনের নবজাগ্রত সমস্ত খেয়ালের কাছে সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যতীন যা বলে নির্বিকার চিত্তে সে তাহাই

পালন করিয়া যায়। যতীনের ইচ্ছাকে কখনও সংশোধিত অথবা পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করে না। তাহার নিরবচ্ছিন্ন স্বামীর কথা শুনিয়া চলিবার রকম দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না তাহার নিজেরও স্নানাহারের প্রয়োজন আছে, সুস্থ মানুষের সঙ্গলাভের প্রয়োজন আছে, কিছুক্ষণ আপন মনে একা থাকিবার প্রয়োজন আছে। যতীন খেয়াল করিয়া ছুটি দিলে সে খাইতে যায়, যতীন মনে করাইয়া দিলে বিকালে তাহার একটু বাগানে বেড়ানো হয়। তা না হইলে নিজের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া যতীনের পরিবর্তনশীল ইচ্ছাকে সে অক্লান্ত তৎপরতার সহিত তৃপ্ত করিয়া চলে।

অথচ যাচিয়া সে কিছুই করে না। যতীনের দরকারি সুখসুবিধাগুলির জন্য ধরাবাঁধা যেসব নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলি যথারীতি পালিত হয় কিনা এ বিষয়ে সে নজর রাখে। কিন্তু যতীনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার জন্য, যতীনকে তাহার নিজের খেয়ালে সৃষ্টি করিয়া লওয়া আনন্দের অতিরিক্ত কিছু দিবার জন্য, স্বকপোলকল্পিত কোন উপায় দিন ও রাত্রির চব্বিশটা ঘণ্টার মধ্যে মহাশ্বেতা একটিও আবিষ্কার করে না।

তাহাদের সহযোগ রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে।

জীবনের তাহাদের একটি সমবেত গতি ছিল। জীবনের পথে পাশাপাশি চলিবার কতগুলি রীতি ছিল। সে গতিও এখন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেসব রীতিও গেছে বদলাইয়া। পুরানো ভালবাসা, পুরানো প্রীতি, পুরানো কৌতুক নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইয়াছে। বিবাহের চার বছর পরে পরস্পরের সঙ্গে আবার তাহাদের একটি নবতর সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। পূর্বতন বোঝাপড়াগুলি আগাগোড়া বদলাইয়া ফেলিতে হইয়াছে।

প্রথম দিকে যে মূহ্যমান অবস্থাটি তাহাদের আসিয়াছিল সেটুকু কাটিয়া যাওয়ার আগে আপনা হইতে এমন কতগুলি পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে—যাহা খেয়াল করিবার অবসরও তাহাদের থাকে নাই। চিকিৎসার বিপুল আয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া রোগী ও সুস্থ মানুষের শয্যা গিয়াছে পৃথক হইয়া। কথা বলিবার সময় শুধু হাসিয়া কথা বলিবার প্রয়োজন সম্পূর্ণ বাতিল হইয়া গিয়াছে। যার নাম দাম্পত্যালাপ এবং যাহা নয়টির মধ্যে প্রায় সবগুলি উপভোগ্য রসেই সমৃদ্ধ, দুটি পৃথক শয্যার মাঝে চিড় খাইয়া তাহা নিঃশব্দে মরিয়া গিয়াছে। দিবারাত্রির মধ্যে একটি চুম্বনও আজ আর পৃথিবীর কোথাও অবশিষ্ট নাই। চোখে চোখে যে ভাষায় তাহারা কথা বলিত সে ভাষা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। সবটুকু নয়। এখন চোখের দৃষ্টিতে একটি বিহ্বল শঙ্কিত প্রশ্ন তাহারা ফুটাইয়া তুলিতে পারে। চোখে চোখে চাহিয়া এখন তাহারা শুধু দেখিতে পায় একটা অবিশ্বাস্য অপ্রকাশিত বেদনা এই জিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়া আছে ঃ এ কী হলো?

মহাশ্বেতা দিনরাত বোধহয় এই কথাটাই ভাবে। তাহার ঠোঁট দুটি পরস্পরকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া অহরহ কঠিন হইয়া থাকে, ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এক এক সময় সে শুধু বেশি বাতাসের প্রয়োজনে জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করে। দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায়, অদৃষ্টকে অভিশাপ দিবার মতো শোনায়।

যতীন অনুযোগ করিয়া বলে ঃ 'দিনরাত তুমি অমন কর কেন?'

মহাশ্বেতা ঠোঁট নাড়িয়া উচ্চারণ করে ঃ 'কেমন করি? কিছু করি না তো!'

যতীন হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হইয়া বলে ঃ 'এমনিতেই আমি মরে আছি, তারপর তুমিও যদি আমার মনে কষ্ট দাও—'

যতীন ভুলিয়া যায়। ভুলিয়া গিয়া সে মহাশ্বেতার হাত চাপিয়া ধরে। প্রথম দিকে তাহার ঘায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইত, আজকাল আলো ও বাতাস লাগাইবার জন্য খুলিয়া রাখা হয়। ডাক্তার দিনে পাঁচ-ছয়বার ধুইয়া যতক্ষণ সম্ভব রোদে ঘাগুলি মেলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্যাণ্ডেজ শুধু রাত্রির জন্য।

মহাশ্বেতা তাহার তিনটা চামড়া-তোলা ফাটিয়া যাওয়া আঙুলের দিকে চাহিয়া থাকে। আঙুলগুলি তাহার হাতে লাগিয়া আছে বলিয়া বারেকের জন্যও সে শিহরিয়া ওঠে না। মনে হয় যতীন অনুরোধ করিলে তাহার হাতে কনুই-এর অল্প নীচে টাকার মতো চওড়া যে ক্ষতটি ছোটো ছোটো রক্তাভ গোটায় উর্বর হইয়া আছে, মহাশ্বেতা সেখানে চুম্বন করিতে পারে।

যতীন হাত সরাইয়া লয়। রাগ করিয়া বলে ঃ 'তুমি আমায় ঘেন্না করছ শ্বেতা?'

মহাশ্বেতা একথা অনুমোদন করিবার সুরে রাগিয়া বলে ঃ 'কখন আবার ঘেন্না করলাম?'

'তবে অমন করে তাকাও কেন?'

'কেমন করে তাকাই?'

এরকম অবস্থায় এ ধরনের পালটা প্রশ্ন মানুষের সহ্য হয়? যতীন উঠিয়া বারান্দায় গিয়া বেলা বারোটার কড়া রোদে পাতিয়া রাখা ইজিচেয়ারটিতে কাত হইয়া এলাইয়া পড়ে। বৈশাখী সূর্যের এ অম্লান কিরণ ভালোমানুষের হয়তো পাঁচ মিনিটের বেশি সহ্য হয় না। কিন্তু যতীনের অনুভব-শক্তি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সেই রোদে নিজেকে মেলিয়া রাখিয়া পড়িয়া থাকে। রোদ সরিয়া গেলে ইজিচেয়ারটাও সে সরাইয়া লইয়া যায়। ডাক্তারের কাছে সে সূর্যালোকের মধ্যে অদৃশ্য আলোর গুণের কথা শুনিয়াছে। সে আলোককে যতীন প্রাণপণে কাজে লাগায়। অপচয় করিতে পারে না।

খানিক পরে ডাকিয়া বলে ঃ 'এদিকে শোনো শ্বেতা।'

মহাশ্বেতা আসিলে বলে ঃ 'এইখানে বোসো।'

মহাশ্বেতা যতীনের কাছে ছায়ায় বসে। নিকটবর্তী রোদের ঝাঁজে তাহার ঘর্মাক্ত দেহ শুকাইয়া উঠিয়া জ্বালা করিতে থাকে। কিন্তু সে উঠিয়া যায় না। জ্যোতির্ময়ী পতিব্রতার মতো স্বামীর কাছে বসিয়া ঝিমায়।

যতীন বলে ঃ 'আমার তেষ্টা পেয়েছে।'

মহাশ্বেতা তাহাকে জল আনিয়া দেয়।

যতীন বলে ঃ 'আমার আর একটা বালিশ চাই।'

মহাশ্বেতা তাহাকে আর একটা বালিশ আনিয়া দেয়।

যতীন বলে ঃ 'এনে দিলেই হল বুঝি? মাথার নীচে দিয়ে দাও।'

মহাশ্বেতা বালিশটা তাহার মাথার নীচে দিয়া দেয়।

যতীন রুক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলে ঃ 'কী ভাবছ শুনি?'

মহাশ্বেতা বলে ঃ 'কী ভাবব?'

বৈশাখী দুপুরটি গুমোটে জমিয়া ওঠে।

রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া মহাশ্বেতা দেখিতে পায় যতীন তার বিছানায় উঠিয়া আসিয়াছে। দেখিয়া মহাশ্বেতা চোখ বোজে। সারারাত্রি আর সে চোখ খোলে না।

এ জগতে সবই যখন ভঙ্গুর, মনুষ্যত্বের ভঙ্গুরতায় বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই! মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বভাবও ভাঙে গড়ে। আজ যে রাজা ছিল কাল সে ভিখারি হইলে যদি বা এটুকু বোঝা যায় যে লোকটা চিরকাল ভিখারি ছিল না, তার বেশি আর কিছুই বোঝা যায় না।

সংকীর্ণ কারাগারে নিজের বিযাক্ত চিন্তার সঙ্গে দিবারাত্রি আবদ্ধ থাকিয়া যতীন দিনের পর দিন অমানুষ হইয়া উঠিতে লাগিল। বীভৎস রোগটা তাহার না কমিয়া বাড়িয়াই চলিল, তার সুশ্রী রমণীয় চেহারা কুৎসিত হইয়া গেল। বাহিরের এই কদর্যতা তাহার ভিতরেও ছাপ মারিয়া দিল। তার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা একত্র থাকাও মুহ্যমানা মহাশ্বেতার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। মেজাজটা যতীনের একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছে। মাথায় রক্ত চলাচলের মধ্যে তাহার কি গোল বাঁধিয়াছে বলা যায় না, চোখ দুটি মেজাজের সঙ্গে মানাইয়া দিবারাত্রি আরক্ত হইয়া আছে। গলার আওয়াজ তাহার চাপা ও কর্কশ হইয়া উঠিয়াছে, মাথার চুলগুলি অর্ধেকের বেশি উঠিয়া গিয়া পাতলা হইয়া আসিয়াছে। নাকের রংটা তাহার তামাটে হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মুখের ও দেহের মাংস দেখিলে মনে হয় কতকালের বাসি হইয়া ভিতর হইতে পচন ধরিয়া গাঁজিয়া উঠিয়াছে। কোণঠাসা হিংস্র জন্তুর মতো উগ্র ভীতিকর ব্যবহারে মহাশ্বেতাকে সে সর্বদার জন্য সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে শুরু করিয়াছে।

মানুষের স্তরে আর যে তাহার স্থান নাই যতীন তাহা বুঝিতে পারে। মানুষের শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা পাওয়ার আশা এ জীবনের মতো তাহার ঘুচিয়া গিয়াছে। সে কাছে আসিতে দেয় না বলিয়া কেহ তাহার খোঁজখবর নেয় না। এই আত্মপ্রবঞ্চনাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে সে রাজি নয়। মহাশ্বেতার নির্বাক ও নির্বিকার আত্মসমর্পণকে সে অসাধারণ ঘৃণার অস্বাভাবিক প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। মানুষকে দিবার যতীনের আর কিছুই নাই। সে তাই মানুষের উপর রাগিয়াছে। সে তাই স্বার্থপর হইতে শিখিয়াছে। ব্যথা পাইয়াছে বলিয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে সে কুণ্ঠিত নয়।

নাগাল সে পায় শুধু মহাশ্বেতার। মহাশ্বেতাকেই তাহার ব্যাধি ও ব্যাধিগ্রস্ত মনের ভার বহন করিতে হয়।

সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তার অবসন্ন শিথিল ভাবটাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। মনে হয়, আত্মরক্ষার ঘুমন্ত প্রবৃত্তিগুলি আর তাহার ঘুমাইয়া নাই। এবার সে একটু বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। চিরটাকাল সহমরণে যাইবে না।

যতীনকে সে বলে ঃ 'কোথাও যাবে?'

যতীন বলে ঃ 'না।'

'সমুদ্রের জল লাগালে হয়তো কমতো।'

যতীন কুটিল সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলে ঃ 'কমতো? তোমার মাথা হত! ডাক্তার ওকথা বলেনি।'

মহাশ্বেতা রাগ করিয়া বলে ঃ 'ডাক্তারের কথা শুনে তো সবই হচ্ছে।'

খানিক পরে সে আবার বলে ঃ 'ঠাকুর দেবতার কাছে একবার হত্যা দিয়ে দেখলে হত। হয়তো প্রত্যাদেশটেশ কিছু পেতে।'

যতীন আরক্ত চোখে মহাশ্বেতার সুস্থ সবল দেহটির দিকে চাহিয়া থাকে।

'নিজের ছেলে খেয়ে ঠাকুর দেবতার অত ভক্তি কেন? প্রত্যাদেশ! তোমার মতো পাপিষ্ঠার স্বামীকে ঠাকুর প্রত্যাদেশ দেন না।'

ব্যাপারটা মাসখানেকের পুরানো। যতীন ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনিয়াছে। কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় সে বিশ্বাস করে নাই। মহাশ্বেতাকে সন্দেহ করিয়াছে, সন্দেহটা মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে নিজের তাহাতে প্রত্যয় জন্মাইয়াছে এবং উগ্র উত্তেজনায় একটা পুরাদিন পাগল হইয়া থাকিয়াছে।

মহাশ্বেতা কিছু প্রকাশ করে না। জেরার জবাবে এমন সব কথা বলে যে যতীন বিশ্বাস করিতে পারে না। জোড়াতালি দিবার চেষ্টাটা তাহার ধরা পড়িয়া যায়। তা ছাড়া মহাশ্বেতা এমন এমন ভাব দেখায় যেন এটা সম্পূর্ণভাবে তাহারই ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা। এমনও যদি হয় যে এ ব্যাপারে তাহার হাত ছিল, দৈবের চেয়ে সে-ই বেশি দায়ী, বলিবার অধিকার যতীনের নাই। সে তাহার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা তুলিয়া অনর্থক উদ্বিগ্ন হইতেছে। মহাশ্বেতার কপালে দুঃখ ছিল, সব দিক দিয়া বঞ্চিত হওয়ার বিধিলিপি ছিল, সে দুঃখ পাইয়াছে, বঞ্চিত হইয়াছে। যতীনের কী? সে কেন ব্যস্ত হয়?

তার স্বামী বলিয়া যতীন দেবতার প্রত্যাদেশও পাইবে না একথাটা মহাশ্বেতার সহ্য হয় না। সে বলে ঃ 'ছেলে ছেলে করে তো মরছ। শুনে জেনেছ ছেলে?'

যতীনের চোখে প্রত্যাদেশকারীর দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে।

'ছেলে নয়? ওরা যে বলল ছেলে?'

'আমার চেয়ে ওরা যে বেশি জানে!'

যতীন তখন আর কিছু বলে না। চুপচাপ ভাবিতে থাকে। পরদিন দুপুরে যতীনের রোদটুকু হরণ করিয়া আকাশ ভরিয়া মেঘ জমিলে মহাশ্বেতাকে কাছে, খুব কাছে আহ্বান করে। বাহিরে ব্যাকুল বর্ষণ শুরু হইলে হঠাৎ সে বহুদিনের ভুলিয়া যাওয়া অভিমানের সুরে বলে ঃ 'মেয়ের বুঝি দাম নেই?'

মহাশ্বেতা অবাক হইয়া বলে ঃ 'তুমি এখনো সে কথা ভাবছ?'

যতীন বলে ঃ 'কি করেছিলে? গলা টিপে তুমি তাকে মারতে পার নি শ্বেতা। না, তাও পেরেছিলে?'

মহাশ্বেতা বলে ঃ 'আবোল-তাবোল কথার কত জবাব দেব? যা বোঝো না তাই নিয়ে কেবল বকবক করবে। বেঁচে থাকলে কত দুঃখ পেত ভেবে আমি মন ঠাণ্ডা করেছি। তুমি পার না?—কী বৃষ্টিটাই নাবল। দেখি একটু!'

মহাশ্বেতা উঠিয়া গিয়া জানালায় দাঁড়ায়। বাহিরে অবিশ্রান্ত জল পড়ে আর ঘরে যতীন অবিরত গাল দেয়। মহাশ্বেতা চোখ দিয়া বর্ষা দ্যাখে আর কান দিয়া স্বামীর কথা শোনে। যতীন যখন বলিতে থাকে যে এ কাজ যে মেয়েমানুষ করিতে পারে সে যে আর কোনো

অন্যায় করিতে পারে না, একথা স্বয়ং ভগবান তাহাকে বলিলেও সে বিশ্বাস করিবে না, তখন মহাশ্বেতা একটু হাসে।

একদিন তাহাদের এই কথোপকথন হইয়াছিল ঃ

'কী পাপে আমার এমন হল শ্বেতা?'

'তোমার পাপ কেন হবে? আমার কপাল।'

আজ কথা বলিবার ধারা উলটিয়া গিয়াছে। যতীন আজ প্রাণপণে চেঁচাইয়া বলে ঃ 'তোমার পাপে আমার এমন দশা হয়েছে, ছেলেখেকো রাক্ষসী। তুমি মরতে পার নি? না, সাধ-আহ্লাদ এখনো মেটেনি? এখনো বুঝি একজন খুব ভালোবাসছে?'

এই সন্দেহটাই এখন যতীনের আক্রমণ করার প্রধান অস্ত্রে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মহাশ্বেতার মুখ দেখিলে কারও একথা মনে হওয়া উচিত নয় যে সে সুখে আছে। যতীনের দেখিবার ভঙ্গি ভিন্ন। মহাশ্বেতার মুখের ম্লালিমা তার চোখে রূপৈশ্বর্যের মতো লাগে, ওর চোখের ফাঁকা দৃষ্টি যে আজকাল শ্রান্তিতে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে সেটা তার মনে হয় পরিতৃপ্তি। ওর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা যতীনের কাছে হইয়া উঠিয়াছে সাজসজ্জা। তার দৃষ্টির আড়ালে ওর নেপথ্য জীবনটির পরিসর বাড়াইয়া তোলা যতীনের কাছে গভীর সন্দেহের ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাকে একা ফেলিয়া সমস্ত দুপুরটা সে কাটায় কোথায়? অন্য ঘরে বিশ্রাম করে? যতীন বিশ্বাস করে না। বিশ্রামের জন্য অন্য ঘরেরই যদি তার প্রয়োজন, যতীনের পাশের ঘরখানা কী দোষ করিয়াছে? নির্জন দুপুরে নীচের তলায় কোনার একটা ঘর ছাড়া ওর বিশ্রাম করা হয় না, বাহির হইতে যে ঘরে সকলের অগোচরে মানুষ আসা যাওয়া করিতে পারে?

'অত বোকা নই আমি, বুঝলে?'

পালটা প্রশ্ন করার অভ্যাসটা মহাশ্বেতার এখনও একেবারে যায় নাই। সে বলে ঃ 'তোমাকে বোকা কে বলেছে?'

যতীন গোঁ ধরিয়া বলে ঃ 'ওসব চলবে না। আমার বাড়িতে বসে ওসব তোমার চলবে না, এই তোমাকে আমি বলে দিলাম! এখনও মরিনি আমি!'

'কী সব বলছ?'

'বলছি তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। ওরে বাপরে, চাদ্দিক দিয়ে আমার একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেল যে!'

যতীন হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। মহাশ্বেতা ছবির মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার বিকৃত ক্রন্দন চাহিয়া দ্যাখে। যতীনের আকুলতা যত তীব্র হইয়া ওঠে সে যেন ততই শান্ত হইয়া যায়। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে তাহার চোখে পলক পড়ে, ঘরের দেওয়ালে ঝাপসা ছবিগুলি মন্থরগতিতে তাহার চারিদিকে পাক খায়। বাহিরের শব্দগুলি তাহার কানে আসিয়া বাজিতে থাকে, সে একটু একটু করিয়া তাহা অনুভব করে। তাহার মনে হয়, কে যেন কোথায় কাঁদিতেছে।

পাগলামি মহাশ্বেতারও আসিয়াছে বইকি। তাহা অপরিহার্য। সাধারণ অবস্থায় মানুষ যাহা করে না সেসব করার নাম পাগলামি। সাধারণ অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে যাহার জীবন, ওসব তাহাকে করিতে হয়। মস্তিষ্কের কতগুলি অভিনব অভ্যাস জন্মিয়া যায়। বন্ধ্যাকে

কারো মনে হয় শত্রু, প্রিয়কে কারো মনে হয় অপ্রিয়, জীবনকে কারো মনে হয় সীমান্তোলিত কৌতুক। দুঃখ দেখিলে কেহ কাঁদিয়াই মরিয়া যায়, কেহ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবে বিকালে চা পান করা হয় নাই বলিয়া মাথাটা ঝিমঝিম করিতেছে, আকাশে কী আশ্চর্য একটা পাখি উড়িয়া গেল?

মহাশ্বেতা রাত্রে এ ঘরে থাকে না। পাশের ঘরে সে বিছানা পাতে।

যতীন প্রশ্ন করে, কেন? সে মুখে কিছু বলে না, ঘরে ঢুকিয়া খিল তুলিয়া দিয়া সমস্ত রাত্রি জবাবটা সুস্পষ্ট করিয়া রাখে।

যতীন রুদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বলে ঃ 'রিভলবারে গুলি ভরে রাখলাম। কাল সকালে ঘর থেকে বেরুলেই তোমাকে গুলি করব।'

বলে ঃ 'এ অপমান সহ্য হয় না শ্বেতা! তুমি আমাকে এমন করে ঘেন্না করবে?'

এ ঘরে নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত যতীন জাগিয়া থাকে, ও-ঘরে মহাশ্বেতা শূন্য বিছানায় নিষ্পন্দ অনুসন্ধানে জীবনের অবলম্বন খোঁজে। কত কথা সে ভাবিবার চেষ্টা করে কিন্তু ভাবিতে পারে না, কত কথা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারে না ; সব গোলমাল হইয়া যায়। কুমারী জীবনের স্মৃতি একটা অচিন্তনীয় অনুভূতির মতো মস্তিষ্কের বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, বিবাহের পর যে চারটা বছর যতীন সুস্থ ছিল, সুরূপ ছিল, সে-সময়ের কথাটা ভাবিতে আরম্ভ করা মাত্র মহাশ্বেতার চিন্তাশক্তি অসাড় হইয়া যায়। জীবনের সেই আদিম নিষ্পাপ উৎসব হইতে সে একেবারে উপস্থিত হয় যতীনের গলিত দেহ ও বিকৃত জীবনকে কেন্দ্র করা পচা ভাপসানো জীবনে, যেখানে একটি নবজাত শিশু, একটি পরিপুষ্ট বিস্ময়, জন্মিয়া মরিয়া যায়। বারবার জন্মিয়া বারবার মরিয়া যায়।

যতীনের মনে যত আলো ছিল সব নিভিয়া গিয়াছে। গাঢ় অন্ধকারে তাহার মনে এককালীন হাস্যকর কত কুসংস্কারের যে জন্ম হইয়াছে, সংখ্যা হয় না। কয়েকদিন ভাবিয়াই প্রত্যাদেশে তাহার অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। দেবতা একদিন যার কাছে ছিল অলস কল্পনা, ধর্ম ছিল বার্ধক্যের ক্ষতিপূরণ, জ্ঞান ছিল অনমনীয় যুক্তি, আজ সে আশা করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেবতার যদি দয়া হয়, হয়তো আবার সুস্থ হইয়া ওঠার পথ দেবতাই তাহাকে বলিয়া দিবেন।

কিন্তু কোন্ দেবতা? তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, কামাখ্যা, কোথায় তাহার প্রত্যাদেশ আসিবে?

যতীন নিজে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। মহাশ্বেতাকে সে পরামর্শ করিতে ডাকে। 'কোথায় গিয়ে হত্যে দেওয়া ভালো শ্বেতা?'

মহাশ্বেতা সবচেয়ে দূরবর্তী একটি পীঠস্থানের নাম স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলে ঃ 'কামাখ্যায় যাও।'

'আমি যাব?' যতীন স্তম্ভিত হইয়া যায় ঃ 'এ অবস্থায় আমি কী করে যাব?'

মহাশ্বেতা বলে ঃ 'কে যাবে তবে?'

'কেন তুমি যাবে। স্বামীর অসুখ হলে স্ত্রী গিয়েই হত্যে দেয়, প্রত্যাদেশ নিয়ে আসে।'

মহাশ্বেতা বলে ঃ 'আমি? আমি গেলে প্রত্যাদেশ পাব না। ঠাকুর দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই।'

'বিশ্বাস নেই?' মন্তব্যটা যতীনের অবিশ্বাস্য মনে হয়।

'এক ফোঁটাও নয়। হত্যে দেবার কথা ভাবলে আমার হাসি আসে।'

যতীন রাগিয়া ওঠে।

'তা পাবে না? হাসি তো পাবেই! হাসি নিয়েই যে মেতে আছ। এদিকে স্বামী মরছে, ওদিকে আর একজনের সঙ্গে হাসির হর্‌রা চলছে। আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ!'

মহাশ্বেতা বলে ঃ 'কার সঙ্গে হাসির হর্‌রা চলছে?'

'তাই যদি জানব তুমি তবে এখনও এ বাড়িতে আছ কী করে?' যতীন পচন-ধরা নাক দিয়া সশব্দে নিশ্বাস গ্রহণ করে, গলিত আঙুলগুলি মহাশ্বেতার চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া আর্তনাদের মতো বলিতে থাকে ঃ 'ভেবো না, ভেবো না, তোমারও হবে! আমার চেয়ে আরও ভয়ানক হবে। এতো পাপ কারও সয় না!'

হিংস্র ক্রোধের বশে যতীন আঙুলের ক্ষতগুলি মহাশ্বেতার হাতে জোরে জোরে ঘষিয়া দেয়। আগুন দিয়া আগুন ধরানোর মতো সংক্রামক ব্যাধিটাকে সে যেন মহাশ্বেতার দেহে চালান করিয়া দিয়াছে এমনই একটা উগ্র আনন্দে অভিভূত হইয়া বলে ঃ 'ধরলো বলে, তোমাকেও ধরলো বলে! আমাকে ঘেন্না করার শাস্তি তোমার জুটল বলে। আর দেরি নেই।'

এই অভিশাপ দেওয়ার পর মহাশ্বেতা যতীনকে একরকম ত্যাগ করিল। সেবা সে প্রায় বন্ধ করিয়া আনিয়াছিল, এবার কাছে আসাও কমাইয়া দিল। সকালে একবার যদি কিছুক্ষণের জন্য আসিয়া যতীনকে সে দেখিয়া যায়, সারাদিন আর তাহার দেখা মেলে না। রাত্রে শোয়ার আগে একবার শুধু উঁকি দিয়া যায়। মুহূর্তের জন্য। পরিহাসের মতো।

যতীন ক্ষেপিয়া উঠিয়া মহাশ্বেতাকে শেষ পর্যন্ত বাড়ি হইতেই তাড়াইয়া দিত কিনা বলা যায় না, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে সে নিজেই প্রত্যাদেশ আনিতে কামাখ্যায় চলিয়া গেল। যতীনের পীড়াপীড়িতে, ক্রুদ্ধ আদেশ ও সকরুণ মিনতিতে, মহাশ্বেতা সঙ্গে যাইতে রাজি হইয়াছিল। কিন্তু যাত্রা করার সময় তাহাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। যতীনের এক পিসি বলিল ঃ মহাশ্বেতা কালীঘাটে গিয়াছে। যতীনের চাকরকে সঙ্গে করিয়া যতীনের মোটরে এই খানিক আগে মহাশ্বেতা কালীঘাটে চলিয়া গিয়াছে।

গোড়াপত্তন কালীঘাটেই হইয়াছিল। মহাশ্বেতা যে যতীনকে বলিয়াছিল ঠাকুর দেবতায় সে বিশ্বাস করে না এ কথাটা তাহার সত্য নয়! সত্য হইলে যতীনের কামাখ্যা যাওয়ার দিন অত টাকা খরচ করিয়া সে পূজা দিত না, একধামা পয়সা ভিখারিদের বিতরণ করিত না।

এ কাজটা মহাশ্বেতা নিজেই করিয়াছিল। মন্দিরে ঢুকিবার পথে দুদিকে সারি দিয়া ভিখারি বসিয়া ছিল। চাকর আর মোটরচালকের হাতে পয়সার ধামাটা তুলিয়া দিয়া আগে আগে চলিতে চলিতে মহাশ্বেতা দুদিকে মুঠা মুঠা পয়সা বিলাইয়াছিল। সে হইয়াছিল এক মহাসমারোহের ব্যাপাব। শুধু ভিখারি নয়, ভিক্ষা দেওয়া দেখিতে রাস্তায় লোক জমা হইয়া গিয়াছিল অনেক।

ভিখারিদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীও ছিল বইকি! হাতে-পায়ে কারো ছিল চট বাঁধা, কারো

নাক গলিয়া গিয়া একটা গহ্বরে পরিণত হইয়াছিল, কারো সমস্ত মুখের ফাঁপানো মাংস বড়ো বড়ো গোটায় ভরিয়া ছিল, কারো কবজির কাছ হইতে দুটি হাত বহুকাল আগে খসিয়া গিয়া ঘা শুকাইয়া হইয়াছিল মসৃণ। এদের পয়সা দিবার সময় মহাশ্বেতার একটি মুষ্টিতে কুলায় নাই! এদের দিয়া একধামা পয়সায় কুলানো যায় নাই।

বাড়ি ফিরিয়া সেইদিন বিকালে মহাশ্বেতা কুষ্ঠাশ্রম খুলিয়াছে।

চাকর সেদিন পথ হইতে পাঁচজন ভিখারিকে ধরিয়া আনিয়াছিল। তাদের মধ্যে দুজন হাজার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের লোভেও এখানে থাকিতে রাজি হয় নাই। বাকি তিনজন সেই হইতে আরাম করিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। খায় দায় ঘুমায়, আর মহাশ্বেতাকে ক্ষণে ক্ষণে ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করায়, আর তাদের কাজ নাই। সাতদিনের মধ্যে মহাশ্বেতার আশ্রমবাসীদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে একুশজন।

আত্মীয়স্বজন সকলকে সে ভিন্ন বাড়িতে স্থানান্তরিত করিয়াছে। মাহিনা করা কয়েকজন চাকর দাসী মেথর আর বাড়ি-ভরা কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে সে এখানে বাস করে একা। সকালে বিকালে এদের দেখিয়া যাওয়ার জন্য সে একজন ডাক্তার ঠিক করিয়াছে। দুজন অভিজ্ঞ নার্সের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

ডাক্তার বলিয়াছে ঃ 'এখানে আপনাকে কুষ্ঠাশ্রম খুলতে দেবে না।'

'কেন?'

'শহরের মাঝখানে এ ধরনের আশ্রম কি খুলতে দেয়?'

মহাশ্বেতা আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছে ঃ 'ওরা তো শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি বাড়ির মধ্যে ভরে বিপদ আরও কমিয়েছি।'

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিয়াছে ঃ 'তবু দেবে না। তবে কি জানেন, এসব হল সৎ কাজ। সহজে কেউ বাধা দিতে চায় না। পাড়ার লোকে নালিশ করবে, সে নালিশের তদবির হবে, তারপর আপনার কাছে নোটিশ আসবে। তখনও দুমাস আপনি চুপ করে থাকতে পারবেন। ফের আর একটা নোটিশ এলে তখন ধীরে-সুস্থে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবেন।

ডাক্তারের এত কথার জবাবে মহাশ্বেতা বলিয়াছে ঃ 'কুষ্ঠ কি ভয়ানক রোগ ডাক্তারবাবু!'

ডাক্তার তাহার বিপুল অভিজ্ঞতায় আবার অল্প একটু হাসিয়াছে ঃ 'এরকম কত রোগ সংসারে আছে! মানুষকে একেবারে নষ্ট করে দেয়, বংশের রক্তধারার সঙ্গে পুরুষানুক্রমে মিশে থাকে এমন রোগ একটা নয়, মিসেস দত্ত।'

বংশ! পুরুষানুক্রম! কে জানে ডাক্তার কতখানি টের পাইয়াছিল? যতীন শুধু সন্দেহ করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, ভাবিয়াছিল তাকেই মহাশ্বেতা বঞ্চনা করিয়াছে। ডাক্তার জানিয়াও নির্বিকার হইয়া আছে। হয়তো মনে মনে ডাক্তার সমর্থনও করে। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে একটু পার্থক্য থাকিবেই।

নার্স ঠিক হওয়ার আগেই যতীন ফিরিয়া আসিল। সে ঠিক প্রত্যাদেশ পায় নাই, কেমন একটা স্বপ্ন দেখিয়াছে যে কুণ্ড হইতে একটি সাদা ফুল আনিয়া মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে সে নীরোগ হইতে পারে। বাড়ি ফেরার আগেই যতীন মাদুলি ধারণ করিয়াছে।

বাড়ির ব্যাপার দেখিয়া তাহার চমক লাগিয়া গেল।

'এ সব কী করেছ শ্বেতা?'

মহাশ্বেতার মন অনেকটা শান্ত হইয়া আসায় বুদ্ধিটাও তাহার বেশ পরিষ্কার ছিল। সে বলিল ঃ 'তোমার কল্যাণের জন্যই করেছি। কালীঘাটে একজন সন্ন্যাসীর দেখা পেলাম, অমন তেজালো সন্ন্যাসী আমি জীবনে কখনও দেখিনি। চোখ যেন আগুনের মতো আলো দিচ্ছে। তিনি বললেন ঃ 'কুষ্ঠাশ্রম কর, তোর স্বামী ভাল হয়ে যাবে।'

মাদুলি ধারণের প্রভাব তখনও যতীনের মনে প্রবল হইয়া আছে। সে অভিভূত হইয়া বলিল ঃ 'সত্যি?'

'তোমার কাছে মিছে বলছি? তুমি সে সন্ন্যাসীকে দ্যাখো নি। দেখলে তোমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠত! আমাকে কথাগুলি বলে কোনদিকে যে চলে গেলেন কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

যতীন আপশোশ করিয়া বলিল ঃ 'একটা ওষুদটষুদ যদি চেয়ে নিতে শ্বেতা?'

বাড়ির যে অংশ যতীনের ছিল সে আবার সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। মাদুলি আর সন্ন্যাসীর ভরসায় মেজাজটা সে অনেকখানি নরম করিয়াই রাখিল।

কিন্তু মহাশ্বেতা কাছে ভেড়ে না। কামাখ্যা যাওয়ার আগে যেমন ছিল তেমনই দূরে দূরে থাকে। কুষ্ঠাশ্রম লইয়া সে মাতিয়া উঠিয়াছে। একুশটি অধিবাসীর সংখ্যা পঁচিশে পৌঁছিলে তার যেন আনন্দের সীমা থাকে না। দিবারাত্রি সে পথে কুড়ানো এই বিকৃত গলিত মানুষগুলির সেবা করে। মায়ের মতো তাহার মমতা, মায়ের মতো তাহার সেবা। এই পঁচিশটি অসুস্থ পচা পাঁজর দিয়া যেন তাহার বুক তৈরি হইয়াছে, তার হৃদয়ের সবটুকু উষ্ণতা ওরা পায়।

যতীন একদিন কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল ঃ 'তুমি খালি ওদেরই সেবা কর শ্বেতা। আমার দিকে তাকিয়েও দ্যাখো না।'

মহাশ্বেতা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু বলিতে পারিল না।

সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠরোগাক্রান্তগুলিকে ভালবাসে।

এতে জটিল মনোবিজ্ঞান নাই। সহজ বুদ্ধির অনায়াসবোধ্য কথা।

মহাশ্বেতা দেবী তো নয়? সে শুধু কুষ্ঠরোগীর বউ।

টিকটিকি

দোতলা বাড়ি। শহরের যে অঞ্চল বেজায় শহুরে বলে খ্যাত সেইখানে। তিনদিকে গাদা করা বাড়ির চাপ, একদিকে রাজপথের চটুল ফাজলামি, আবেস্টনীকে লক্ষ করলে সন্দেহ হয় সমস্তটাই বুঝি হাই মায়োপিয়ার লীলা। তা ছাড়া, এমন চেহারা বাড়িটার যে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা অসবর্ণ রহস্যের মতো কুৎসিত। সস্তা মেয়েমানুষ যেন পথিকের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, আমি ভীরু ও সরলা, খাঁটি গাঁয়ের মেয়ে, তবে অসতী। বে-আবরু সমতল পিঠে পুরানো বাদামি রঙের আবরণটা চোখেই পড়তে চায় না, প্রাচীনতার ছাপ এত বেশি।

দোতলা বাড়ি বটে, একতলা-দোতলায় কিন্তু সিঁড়ির যোগাযোগ নেই। তিনটি সদর দরজার ডাইনেরটি দিয়ে ঢুকলেই খাঁচাবন্দি দোতলার সিঁড়ি। অকারণ নড়াচড়ার একটু স্থান অবশ্য আছে, কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠা অথবা পথে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই কোনোদিকেই। দোতলায় থাকেন ইতিহাসের প্রফেসার, সদর দরজাটির পাশে ছোট পিতলের ফলকে যিনি এম. এ.। একতলায় থাকেন জ্যোতিষার্ণব, বাকি দুটি সদর দরজার উপরে কাঠের ফ্রেম লাগানো রঙিন টিনের মস্ত সাইনবোর্ডে যিনি প্রথিতযশা। দুটি দরজাই একটি ঘরের, যার বেশির ভাগ জ্যোতিষার্ণবের গণনালয়, বাকিটুকু অন্দরের প্যাসেজ। তিনটি সদর দরজার মাঝেরটি দিয়ে ঢুকলেই ডাইনে দোতলার সিঁড়ি আড়াল করা দেয়াল আর বাঁয়ে দুটি বই-ভরা আলমারির বে-আবরু পিঠ। এগিয়ে এগিয়ে যখন অন্দরের দরজা ডিঙিয়ে জ্যোতিষার্ণবের আবছা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে অন্দরে পদার্পণ না করে প্রায় আর উপায় থাকে না, তখন দেখা যায়, আলমারির দেয়াল একেবারে অন্দরের দেয়ালে গিয়ে ঠেকেনি, ফাঁক আছে হাতখানেক। এই ফাঁকটুকু দিয়ে জ্যোতিষার্ণব নিজে আর তার নিজের লোক অন্দর থেকে গণনালয়ে যাতায়াত করে।

বাইরের লোক আসে তিন নম্বর সদর দরজা দিয়ে। এসে ডবল চৌকির ময়লা ফরাশেই হোক আর অয়েলক্লথ-মোড়া টেবিলের সামনে কাঠের চেয়ারেই হোক, বসে। বসে চারিদিকে তাকায়, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা, আশা-নিরাশার ভারে বিব্রত চোরের মতো। যা চোখে পড়ে তাই মনকে নাড়া দেয়, দেয়ালের টিকটিকি পর্যন্ত। সস্তা মেয়েমানুষ যেন সমস্ত পরপুরুষের দৃষ্টি নিয়ে নিজের সমালোচনা করছে, আমার কী উপায় হবে?

আসলে, এছাড়া প্রশ্নও নেই জগতে। সবকিছুতেই এই সমস্যার ছাপ মারা। ভবিষ্যৎ কি সবকিছুকে গ্রাস করে নেই?

জ্যোতিষার্ণবের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেবার সময় তার ছেলেমেয়ের মা মাথা কাত করে, চোখ উলটে দেয়, মোটা আলগা ঠোঁট দুটিকে টান করে হাসে। জ্যোতিষার্ণবের অপরাধ, সাত বছর আগে এই ভঙ্গি তাকে ভুলিয়েছিল। তবে কেবল ভঙ্গি নয়। সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করে, 'আমি মরলে তোমার কী উপায় হবে?'

জিজ্ঞাসা করে সকালবেলা আর মরে যায় সেই সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে, তবু মনে হয় প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেই যেন সে মরে গেল।

অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ যার নখদর্পণে সেও বুঝতে পারে না ব্যাপারখানা কী। তার ছেলেমেয়ের মা মরণের কথা বলবে মনে করার আগেই মাথার উপর কড়িকাঠে যে টিকটিকিটার লেজ নড়তে আরম্ভ করেছিল, তার ছেলেমেয়ের মা মরণের কথা বলার পরে সেই টিকটিকিটাই যে আর একটা টিকটিকিকে তার ছেলেমেয়ের মা হতে ডেকেছে, এইটুকু কেবল জ্যোতিষার্ণব জানে না। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? আর সব তো তার জানা আছে, যা কিছু মানুষের জানা দরকার। ওই জ্ঞানটুকু লাভ করলেই কী তার মনের এ ধাঁধা মিটে যেত যে, তার ছেলেমেয়ের মা মরবে বলে টিকটিকিটা ডেকেছিল অথবা টিকটিকিটা ডেকেছিল বলেই তার ছেলেমেয়ের মা মরে গেছে?

ছেলেমেয়েরা ছোটো। বড় ছেলেটি প্রথমভাগের বানান শেখে, ছোটো ছেলেটি শেখে কথা বলতে। এদের মাঝখানেরটি মেয়ে, বোবা বলে সে কথা বলতে শেখেনি। মার সম্বন্ধে তাই প্রশ্ন করে শুধু বড় ছেলেটি।

'মা কোথায় গেছে বাবা?'

'স্বর্গে।'

ব'লে প্রমাণের জন্য জ্যোতিষার্ণব কান পেতে থাকে। টিকটিকি বাড়িতে আট-দশটার কম নয়, কিন্তু একটাও জ্যোতিষার্ণবের কথায় সায় দেয় না। নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে বোকা মনে করার লজ্জায় করুণভাবে একটু হেসে জ্যোতিষার্ণব নিজে নিজেই কয়েকবার মাথা নাড়ে। স্বর্গে যদি গিয়েও থাকে তার ছেলেমেয়ের মা, এতদিনে সেখানে পৌঁছে গেছে। অতীত ঘটনার সঙ্গে কি সম্পর্ক টিকটিকির যে তার ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে গেছে সে একথা বললে সঙ্গে সঙ্গে সায় না দিয়ে টিকটিকি থাকতে পারবে না? তা ছাড়া স্বর্গে যাওয়া না-যাওয়া তো জীবনের ঘটনা নয় মানুষের। মরে মানুষ যে-স্বর্গে যায় ইহলোকে কী সে-স্বর্গ আছে? স্বর্গই নেই ইহলোকে!

মনে মনে এত গভীর ও জটিল যুক্তিতর্ক নাড়াচাড়া করেও কিন্তু সন্দেহ যায় না। তার ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে যায়নি বলেও তো চুপ করে থাকতে পারে ত্রিকালদর্শী টিকটিকিগুলি? স্বর্গে গিয়ে থাকলে অন্যগুলি না হোক, যে টিকটিকিটা তার ছেলেমেয়ের মার মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছিল, সেটা অন্তত একবার ডেকে উঠত। হোক না অতটুকু জীব, একবার যে অতখানি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে তার কি এতটুকু কাণ্ড-জ্ঞান নেই? জ্যোতিষার্ণবের বিপদ এই, সে জানে তার ছেলেমেয়ের মার স্বর্গে যাওয়া নিষেধ। অবিবাহিতা বউদের জন্য স্বর্গ নয়। কিন্তু কুমারী জীবন থেকে একজন পুরুষের সঙ্গে যারা জীবন কাটিয়ে দেয়, তাদের জন্যও কি স্বর্গে যাওয়ার কড়া ব্যবস্থা একটু শিথিল হয় না? তার ছেলেমেয়ের মার পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে এইটুকুই আশাভরসা জোতিষার্ণবের।

মার জন্য ছোটো ছেলেটা ককায়। মেয়েটা বোবাকান্না কাঁদে। বড়ো ছেলেটা কাঁদে আর জিজ্ঞাসা করে, 'মা কোথায় গেছে বাবা?'

জিজ্ঞাসা করে গণনালয়ে, তিনজন ক্লায়েন্টের সামনে। জ্যোতিষার্ণব দেয়ালে টাঙানো যোগিনীচক্রের পাশে নিস্পন্দ টিকটিকিটার দিকে একবার তাকিয়েই উঠে দাঁড়ায়। ক্লায়েন্টদের সবিনয়ে বলে, 'একটু বসুন, আসছি।'

ব'লে ছেলেকে নিয়ে অন্দরে শোবার ঘরে ঢুকে দেয়ালে আর সিলিং-এ ব্যাকুল দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ায় তার টিকটিকিকে। সেদিন ঘরে যা কিছু ছিল আজও তার সবই আছে, কেবল নেই শৃঙ্খলা আর সেই টিকটিকিটা। শৃঙ্খলা সত্যই নেই, শৃঙ্খলা লুকিয়ে থাকে না, কিন্তু টিকটিকি তো ফাঁকেফোকরে জিনিষপত্রের আড়ালে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে, অতটুকু জীব টিকটিকি? একটু আশ্বস্ত হয় জ্যোতিষার্ণব। ছেলেকে বলে, 'কী বলছিলি তুই খোকা?'

বাপের কোলে উঠে ছেলের মন এতক্ষণে শান্ত হয়েছে।

'কখন বাবা?'

'আপিসে ঢুকে কী বললি না আমাকে?'

'কিছু বলিনি তো।'

ছোট বোন আর ভাইটি বাপের যে লোমশ বুকখানায় আজকাল রাজত্ব করে, সেখানে উঠে স্মৃতিভ্রংশ হবার বয়স খোকার পার হয়ে যায়নি। তবে বয়সের তুলনায় ওজনটা তার হয়েছে অস্বাভাবিক। ছেলেকে জ্যোতিষার্ণব মেঝেতে নামিয়ে দেয়। মৃদুস্বরে সন্তর্পণে বলে, 'তোর মার কথা কী জিজ্ঞেস করলি না?'

'মা কোথায় গেছে বাবা?'

বোমা নিয়ে খেলা করবার মতো অসহায় সাহসের সঙ্গে জ্যোতিষার্ণব বলে, 'নরকে।' বলে কান পেতে থাকে। কানে আসে ছোটো ছেলেটার কান্না, দোতলায় ইতিহাসের প্রফেসারের স্ত্রীর হঠাৎ গাওয়া দুলাইন গান, রাজপথের চটুল ফাজলামি।

বড়ো ছেলেটা বাপের মুখ দেখেই বোধহয় কেঁদে উঠবার উপক্রম করেছিল।

জ্যোতিষার্ণব চোখ রাঙিয়ে বলে, 'কাঁদিস না।'

খোকা কাঁদে না।

'শোন, আমি ভুল বলেছি। তোর মা এখনও নরকে যায়নি, যাবে। বুঝলি? যাবে, ভবিষ্যতে যাবে।'

আবার জ্যোতিষার্ণব কান পেতে থাকে। বড়ো ছেলেটা কেঁদে ওঠা মাত্র হাত চাপা দেয় তার মুখে। কানে আসে ছোটো ছেলেটার থেমে আসা ছাড়া ছাড়া কান্না, দোতলায় ইতিহাসের প্রফেসারের স্ত্রীর থেমে আসা দুলাইন গানের দুর্বোধ্য গুনগুনানো সুর, রাজপথের চটুল ফাজলামি আর টিকটিকির ডাক।

সেই টিকটিকিটার নয়। সে যাকে সেদিন তার ছেলেমেয়ের মা হতে ডেকেছিল, সেটার। দুটি টিকটিকির আকারে, চামড়ার রঙে, চালচলনে পার্থক্য অবশ্য আছে অনেক, কিন্তু সব টিকটিকিরই এক রা।

মনে যার ব্যথা থাকে তার শখ চাপে মনের কথা বলবার। মনের ব্যথা যে মনকে কামড়ায় এটা তার একটা লক্ষণ। ছেলেমেয়ের মা যার নরকে যাবে, মনে তার ব্যথা থাকা স্বাভাবিক। জ্যোতিষার্ণব তাই হাত দেখাতে, ঠিকুজি মেলাতে, ভাগ্য গনাতে, মাদুলি-কবচ বিধান-ব্যবস্থা নিতে, পূজাপার্বণ শান্তিস্বস্ত্যয়ন নির্বাহের আহ্বান জানাতে যারা আসে, তাদেরও যেমন মনের কথা বলে, শুধু দেখা করতে যে বন্ধুরা আসে, তাদের তেমনই মনের কথা বলে। জ্যোতিষ-বচনের মতো মনের কথা বলার কথা তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে।

এযুগের মানুষের অবিশ্বাসপ্রবণতা দিয়ে আরম্ভ করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও যে কেউ কিছু বিশ্বাস করতে চায় না, এ পর্যন্ত আসতে আসতে জ্যোতিষার্ণবের মুখ বড়ো বিমর্ষ হয়ে যায়। গভীর আর্ত বিষাদের ছাপ। তা ছাড়া গলাও কাঁপে। ফরাশে বা চেয়ারে যেখানেই তার শ্রোতা বসে থাক, কথার চেয়ে কথার সুর আর জ্যোতিষার্ণবের চেয়ে তার মুখের ভাব শ্রোতাকে বিচলিত করে বেশি। জ্যোতিষার্ণবের ভণ্ডামিতে আর যেন বিশ্বাস থাকে না, অন্তত তখনকার মতো।

প্রমাণ? বিশ্বাসের জন্য প্রমাণ চাই? আমার নিজের জীবনেই কত বড় বড় প্রমাণ ঘটেছে। এইতো সেদিন আমার স্ত্রী মারা গেলেন, আমি কি জানতাম না তিনি ওই দিন ওই সময় মারা যাবেন?

'জানতেন?'

গণনালয়ের টিকটিকিটা সব সময় নিজেকে প্রকাশ করে রাখে। হস্তরেখার প্রকাণ্ড ম্যাপ, রাশিচক্র, বর্ষচক্র, পতাকীচক্র, যোগিনীচক্রের ছবি, সুকেশিনীর ছবিযুক্ত কেশতৈলের দেয়ালপঞ্জি-বিজ্ঞাপন, দেয়ালে বসানো তাক, জানালার চতুষ্কোণ গহ্বর, ফাঁকা দেয়াল, ছাদ, কড়িবরগার আড়াল, সমস্ত জায়গা পাঁতিপাঁতি করে খুঁজে তাকে আবিষ্কার করতে হয় না, এদিক ওদিক একটু তাকালেই নজরে পড়ে। জ্যোতিষার্ণব খানিকক্ষণ আনমনে তাকিয়ে থাকে টিকটিকিটাব দিকে, তারপর মাথা হেলিয়ে বলে, 'প্রথমে জানতাম না। নিজের লোকের মৃত্যুর দিন গণনা করতে নেই, মানুষের মন তো, মন বিচলিত হয়ে পড়ে। সেদিন সকালবেলা হল কি, তামাশা করে আমায় বললেন, আমি মরে গেলে তোমার কি উপায় হবে? মানে, সংসার তো একরকম চালাতেন তিনি, তাই হঠাৎ পরিহাস করে বললেন আর কি যে, তিনি যদি মরে যান এসব কাজকর্মই বা কে করবে, ছেলেমেয়ে মানুষই বা কে করবে। যেই বললেন কথাটা, সঙ্গে সঙ্গে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল।'

'টিকটিকি?'

'হ্যাঁ, টিকটিকি। মনে কেমন খটকা বাধল। হস্তরেখা বিচার করে ওঁর বয়স জিজ্ঞেস করলাম। বয়স অবশ্য আমি জানতাম, বিয়ের সময় থেকেই জানতাম, তবু জিজ্ঞেস করলাম। তারপর বললাম, তোমার কুষ্ঠিটা বার করো তো, কালো তোরঙ্গের তলায় আছে। উনি হাসতে হাসতে কুষ্ঠি বার করে দিলেন। তখনও আমার মন বলছে, থাকগে কাজ নেই, মরণ যদি ওঁর ঘনিয়ে এসে থাকে, কি হবে আগে থেকে জেনে? লাভ তো কিছুই হবে না, মাঝখান থেকে কিছুদিন অতিরিক্ত মনোকষ্ট ভোগ করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণনা না করে পারলাম না। গণনার ফল দেখে মাথা ঘুরে গেল। সেদিন গোধূলিবেলা পর্যন্ত ওঁর আয়ু। ওঁর দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন একটা শবের দিকে তাকিয়ে আছি, ঠিক পিছনে আবছা মতন—'

শ্রোতা স্তব্ধ। গলা শুকিয়ে গেছে। ভয়ে নয়, প্রকৃত তৃষ্ণায়। কিন্তু এখন জল চাওয়া যায় না।

'জানতাম কোনো লাভ নেই, ওঁর বাবা ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান সত্যবাদী পণ্ডিত, তবু একবার জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়ের সময় তোমার বয়স তো দু-এক বছর কম করে বলা হয়নি? কুষ্ঠি ঠিক আছে তো? বিয়ের সময় যদি—থাকগে ওসব কথা। আপনাকে যা বলছিলাম, পার্শ্বমুখ নক্ষত্র—'

নয়টি পার্শ্বমুখ নক্ষত্রের একটির নাম রেবতী। ছমাস পরে জ্যোতিষার্ণব ছেলেমেয়েদের

মানুষ করার জন্য রেবতীকে বিয়ে করে আনে। মরে গেলে স্বর্গে যাবার অধিকার নিয়েই রেবতী এ বাড়িতে আসে বটে, বাড়িতে কিন্তু একটিও টিকটিকির দেখা সে পায় না।

তবু সাবধানের মার নেই ভেবে জ্যোতিষার্ণব বউকে সতর্ক করে দেয়, 'দ্যাখো, কোনো দিন মরার কথা মুখে এনো না।'

রেবতী তখনও পার্শ্বমুখী, সোজা জ্যোতিষার্ণবের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। জ্যোতিষার্ণব হরদম তাকায়। নিজে যোটক বিচার করে সে রেবতীকে বিয়ে করেছে। বিপদ দুজনের নক্ষত্র নিয়ে। তার নিজের শতভিষা নক্ষত্র আর রেবতীর উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র তাদের মিলনকে করেছে রাক্ষস ও নরের মিলনের মতো।

এখন এই যে জ্যোতিষার্ণব, আমি এর জীবনে উদিত হয়েছিলাম, কি এ-ই আমার জীবনে উদিত হয়েছিল, আজও আমি এ সমস্যার মীমাংসা করতে পারিনি।

কত আর বয়স তখন আমার হবে, রেবতীর চেয়ে অনেক ছোটো। কিছুদিনের জন্য থাকতে গিয়েছি ইতিহাসের প্রফেসারের বাড়ি, কি ভীষণ ভাবটাই যে হয়ে গেল রেবতীর সঙ্গে। বয়সের তুলনায় কি প্রকাণ্ড তখন আমার দেহ, কত পরিণত মন,—কারও স্ত্রীর সঙ্গে ভাব হওয়াটাই তখন আমার পক্ষে পরমাশ্চর্য। অথচ রেবতীর সঙ্গে সারাদিন এত বেশি কড়ি আর তাস খেলতাম যে, ইতিহাসের প্রফেসারের স্ত্রী অভিমানে আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলত না।

তাতে আমার সুবিধাই ছিল। আমায় যে ভালোবাসে তার সঙ্গে কথা বলতে আমার বড় কষ্ট হয়। মনে হয়, শব্দ দিয়ে অনেক দামি কী যেন আদায় করে নিচ্ছি।

আমি রেবতীর সঙ্গে কড়ি খেলি, জ্যোতিষার্ণব দুবার ঘুরে গিয়ে তৃতীয়বার কাছে এসে উবু হয়ে বসে।

'দেখি হে ছোকরা তোমার হাতটা। আরে বাস রে, এ কী হাত, এত হিজিবিজি রেখা পেলে কোথায়? ভালো করে দেখতে হবে তো হাতটা তোমার। বাঁচবে অনেক দিন, তবে—'

রেবতী আমার হাত কেড়ে নেয়।

'খুব হয়েছে, ছেলেমানুষকে ভয় না দেখালেও চলবে।'

অন্দর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় গণনালয়ে জ্যোতিষার্ণব আমায় পাকড়াও করে, শোনায় ভূতের গল্প। প্রথমে কান দিয়ে আরম্ভ করে শেষে লোমকূপগুলিকেও শোনার কাজে লাগিয়ে দিই। ক্ষুধাতৃষ্ণার তাগিদটা চাপা পড়ে যায়, তাকিয়ে দেখি রেবতী এসে আলমারির পাশের ফাঁকটাতে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যোতিষার্ণবের গল্প শেষ হতে বলি, 'আরেকটা।'

রেবতী ম্লান মুখে চুপ করে থাকে।

জ্যোতিষার্ণব হাসির ভান করে বলে, 'এ বাড়ির টিকটিকিগুলি যদি মেরে ফ্যালো, তাহলে বলব। একটা টিকটিকির জন্যে একটা গল্প। এ ঘরেই তো তিনটে আছে, লাঠিটা দিয়ে মারো না একটা?'

আমি বলি, 'লাঠি দিয়ে বুঝি টিকটিকি মারে? দাঁড়ান, আমার তির-ধনুক নিয়ে আসি।'

রেবতী বলে, 'মানিক, মেরো না, টিকটিকি মারতে নেই।'

আমি একটু দাঁড়াই। হিসাব করে দেখি যে রেবতীর মতো মেয়ে যখন একবার আমাকে ভালোবেসেছে, কথা না শুনলেও ভালো না বেসে সে পারবে না। আমার সঙ্গে কড়ি আর পাতাবিন্তি খেলবার জন্য সে যেরকম পাগল হয়ে উঠেছে, সে পাগলামি যাবার নয়। গল্প না বলে আমায় কষ্ট দেবার সুযোগ পেলে জ্যোতিষার্ণব কিন্তু কিছুতেই সে সুযোগ ছাড়বে না। সোজা দোতলায় গিয়ে আমার বাঁশের ধনুক আর শরের তির নিয়ে আসি। তির আমার সাংঘাতিক মারণাস্ত্র, ডগায় দুটি আলপিন বসানো আছে।

এককোণে একটা টিকটিকি ছিল, ফরাশে উঠে দাঁড়ালে আমার তিরের আয়ত্তে আসে এইরকম স্থানে। নিস্পন্দ শরীর, নিস্পলক চোখ, ধূসর জীবটিকে দেখলেই মায়া হয়।

রেবতী আবার বলে, 'মানিক মেরো না, মারতে নেই।'

রেবতীকে আমি ত্যাগ করিনি, কিন্তু তার কথার কোনো দাম আমার কাছে নেই। আকর্ণ সন্ধান করে চার ইঞ্চি তফাৎ থেকে বাণ নিক্ষেপ করি। এমন আশ্চর্য জীব টিকটিকি যে শিকারিকে গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখলেও নড়ে না।

বাণবিদ্ধ টিকটিকি নীচে পড়ে যায়। বাণটি টেনে খুলে নিয়ে দেখি দুটি আলপিন বিঁধে টিকটিকিটার চোখের পাশে দুটি রক্তের ফোঁটা জমেছে—যেন নূতন দুটি চোখ। মানুষের রক্তের মতো লাল রক্ত টিকটিকির নয়—

জ্যোতিষার্ণব হাসি চেপে হাসতে আরম্ভ করে।

'চারচোখো করে দিলে! টিকটিকিকে চারচোখো করে দিলে? তোমাকেও চারচোখো হতে হবে মানিক।'

সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে কোথায় যেন একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে। কে জানে বাণবিদ্ধ টিকটিকির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক। ছেলেমেয়ের বাপ-মা হবার জন্য তারা যদি পরস্পরকে কোনোদিন ডাকাডাকি করে থাকে, সে খবর কেবল তারাই জানে।

রেবতী নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বলে, 'ফের? ফের ছেলেমানুষকে ভয় দেখাচ্ছ?' বলে জ্যোতিষার্ণবের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে নিজেই ভয়ে মুষড়ে যায়।

স্কুলে বোর্ডের লেখা দেখতে না পাওয়ায় এক মাসের মধ্যে আমাকে চশমা নিতে হয়। চশমা চোখ নয়, কিন্তু বন্ধুরা আমায় চারচোখো বলে কত যে তামাশা করে ঠিক নেই।

তারপর ইতিহাসের প্রফেসারের বাড়িতে আমি কোনোদিন যাইনি। চারচোখে রেবতীকে একবার চোখেও দেখিনি। রেবতীর কথা মনে হলেই সেই বাণবিদ্ধ টিকটিকিটার দুটি ধূসর চোখ, তার চোখ দুটির পাশে দুটি ফ্যাকাসে রক্তবিন্দুর ছবি মনে ভেসে আসে, দারুণ বিতৃষ্ণায় আমার মন ভরে যায়। রেবতীর প্রতি বিতৃষ্ণা,—রেবতীর কোনো দোষ ছিল না, তবু।

হয়তো রেবতী জ্যোতিষার্ণবের ছেলেমেয়ের মা হয়েছে। হয়তো টিকটিকির জন্য জ্যোতিষার্ণবের প্রথম ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে যেতে না পারলেও, টিকটিকির জন্যই রেবতীর স্বর্গে যাবার পথ বন্ধ হবার বিপদ কেটে গিয়েছে, এবং স্বর্গে যাবার প্রতীক্ষায় সে পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করছে।

এদিকে আমার বেড়েছে চশমার পাওয়ার। কখনো দেয়ালের টিকটিকি না দেখবার ইচ্ছা হলে আমার চোখ বুজতে হয় না—চশমাটা খুলে ফেললেই চলে।

হলুদ পোড়া

সে বছর কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তিনদিন আগে পরে গাঁয়ে দু-দুটো খুন হয়ে গেল। একজন মাঝবয়সি জোয়ান মদ্দ পুরুষ এবং ষোলো-সতেরো বছরের একটি রোগা ভীরু মেয়ে।

গাঁয়ের দক্ষিণে ঘোষেদের মজা পুকুরের ধারে একটা মরা গজারি গাছ বহুকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানটি ফাঁকা, বনজঙ্গলের আবরু নেই। কাছাকাছি শুধু কয়েকটা কলাগাছ। ওই গজারি গাছটার নীচে একদিন বলাই চক্রবর্তীকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মাথাটা আটচির হয়ে ফেটে গেছে, খুব সম্ভব অনেকগুলি লাঠির আঘাতে।

চারিদিকে হইচই পড়ে গেল বটে, কিন্তু লোকে খুব বিস্মিত হল না। বলাই চক্রবর্তীর এইরকম অপমৃত্যুই আশেপাশের দশটা গাঁয়ের লোক প্রত্যাশা করেছিল, অনেকে কামনাও করছিল। অন্যপক্ষে শুভ্রা মেয়েটির খুন হওয়া নিয়ে হইচই হল কম, কিন্তু মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রইল না। গেরস্থ ঘরের সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে, গাঁয়ের লোকের চোখের সামনে আর দশটি মেয়ের মতো বড় হয়েছে, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গেছে এবং মাসখানেক আগে যথারীতি বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে ছেলে বিয়োবার জন্য। পাশের বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত কোনোদিন কল্পনা করার ছুতো পায়নি যে মেয়েটার জীবনে খাপছাড়া কিছু লুকানো ছিল, এমন ভয়াবহ পরিণামের নাটকীয় উপাদান সঞ্চিত হয়েছিল! গাঁয়ে সব শেষের সাঁঝের বাতিটি বোধহয় যখন সবে জ্বালা হয়েছে, তখন বাড়ির পিছনে ডোবার ঘাটে শুভ্রার মতো মেয়েকে কে বা কারা যে কেন গলা টিপে মেরে রেখে যাবে ভেবে উঠতে না পেরে গাঁ-সুদ্ধ লোক যেন অপ্রস্তুত হয়ে রইল।

বছর দেড়েক মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি ছিল, গাঁয়ের লোকের চোখের আড়ালে। সেখানে কি এই ভয়ানক অঘটনের ভূমিকা গড়ে উঠেছিল?

দুটো খুনের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে? বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে গাঁয়ের কেউ তেমনভাবে জখম পর্যন্ত হয়নি, যখন হল পরপর একেবারে খুন হয়ে গেল দুটো! তার একটি পুরুষ, অপরটি যুবতী নারী; দুটি খুনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করার জন্য প্রাণ সকলের ছটফট করে। কিন্তু বলাই চক্রবর্তী শুভ্রাকে কবে শুধু চোখের দেখা দেখেছিল তাও গাঁয়ের কেউ মনে করতে পারে না। একটুখানি বাস্তব সত্যের খাদের অভাবে নানা জনের কল্পনা ও অনুমানগুলি গুজব হয়ে উঠতে উঠতে মুষড়ে যায়।

বলাই চক্রবর্তীর সম্পত্তি পেল তার ভাইপো নবীন। চল্লিশ টাকার চাকরি ছেড়ে শহর থেকে সপরিবারে গাঁয়ে এসে ক্রমাগত কোঁচার খুঁটে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে সে পাড়ার লোককে বলতে লাগল, 'পঞ্চাশ টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছি। কাকাকে যারা অমন মার মেরেছে তাদের যদি ফাঁসিকাঠে ঝুলোতে না পারি—'

চশমার কাঁচের বদলে মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁটে সে নিজের চোখও মুছতে লাগল।

ঠিক একুশ দিন গাঁয়ে বাস করার পর নবীনের স্ত্রী দামিনী সন্ধ্যাবেলা লণ্ঠন হাতে রান্নাঘর থেকে উঠান পার হয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছে, কোথা থেকে অতি মৃদু একটু দমকা বাতাস বাড়ির পুব কোণের তেঁতুল গাছের পাতাকে নাড়া দিয়ে তার গায়ে এসে লাগল। দামিনীর

হাতের লণ্ঠন ছিটকে গিয়ে পড়ল দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায়, উঠানে আছড়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দামিনীর দাঁতে দাঁত লেগে গেল। দালানের আনাচে কানাচে ঝড়ো হাওয়া যেমন গুমরে গুমরে কাঁদে, দামিনী আওয়াজ করতে লাগল সেইরকম।

শুভ্রার দাদা ধীরেন স্থানীয় স্কুলে মাস্টারি করে। গাঁয়ে সে-ই একমাত্র ডাক্তার পাশ না-করা। ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পাশ করে সাত বছর গাঁয়ের স্কুলে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছে। প্রথম দিকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সাতচল্লিশ খানা বই নিয়ে লাইব্রেরি, সাতজন ছেলেকে নিয়ে তরুণ সমিতি, বই পড়ে পড়ে সাধারণ রোগে বিনামূল্যে ডাক্তারি, এইসব আরম্ভ করেছিল। গেঁয়ো একটি মেয়েকে বিয়ে করে ছ-বছরের চারটি ছেলেমেয়ের জন্ম হওয়ায় এখন অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে। লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা তিনশ'তে উঠে থেমে গেছে, তার নিজের সম্পত্তি হিসাবে বইয়ের আলমারি তার বাড়িতেই তালাবন্ধ হয়ে থাকে, চাঁদা কেউ দেয় না, তবে দু-চারজন পড়া বই আর একবার পড়ার জন্য মাঝে মাঝে চেয়ে নিয়ে যায়। বছরে দু-তিনবার তরুণ সমিতির মিটিং হয়। চার আনা আট আনা ফি নিয়ে এখন সে ডাক্তারি করে, ওষুধও বিক্রি করে।

ধীরেনকে যখন ডেকে আনা হল, কলসি কলসি জল ঢেলে দামিনীর মূর্ছা ভাঙা হয়েছে। কিন্তু সে তাকাচ্ছে অর্থহীন দৃষ্টিতে, আপন মনে হাসছে আর কাঁদছে এবং যারা তাকে ধরে রেখেছিল তাদের আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ধীরেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল, 'শা'পুরের কৈলাস ডাক্তারকে একবার ডাকা দরকার। আমি চিকিৎসা করতে পারি, তবে কি জানেন, আমি তো পাশ করা ডাক্তার নই, দায়িত্ব নিতে ভরসা হচ্ছে না।'

বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল বলাই চক্রবর্তীর অনুগ্রহে বহুকাল সপরিবারে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি বললেন, 'ডাক্তার? ডাক্তার কি হবে? তুমি আমার কথা শোন বাবা নবীন, কুঞ্জকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাও।'

গাঁয়ের যারা ভিড় করেছিল তারা প্রায় সকলেই বুড়ো ঘোষালের কথায় সায় দিল।

নবীন জিজ্ঞেস করল, 'কুঞ্জ কত নেয়?'

ধীরেন বলল, 'ছি, ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না নবীন। আমি বলছি তোমায়, এটা অসুখ,—অন্য কিছু নয়। লেখাপড়া শিখেছ, জ্ঞানবুদ্ধি আছে, তুমিও কি বলে কুঞ্জকে চিকিৎসার জন্য ডেকে পাঠাবে?'

নবীন আমতা আমতা করে বলল, 'এসব খাপছাড়া অসুখে ওদের চিকিৎসাই ভালো ফল দেয় ভাই।'

বয়সে নবীন তিন-চার বছরের বড়, কিন্তু এককালে দুজনে একসঙ্গে স্কুলে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করত। বোধহয় সেই খাতিরেই কৈলাস ডাক্তার ও কুঞ্জ মাঝি দুজনকে আনতেই নবীন লোক পাঠিয়ে দিল।

কুঞ্জই আগে এল। লোক পৌঁছবার আগেই সে খবর পেয়েছিল চক্রবর্তীদের বউকে অন্ধকারের অশরীরী শক্তি আয়ত্ত করেছে। কুঞ্জ নামকরা গুণী। তার গুণপনা দেখবার লোভে আরও অনেকে এসে ভিড় বাড়িয়ে দিল।

'ভর-সাঁঝে ভর করেছেন, সহজে ছাড়বেন না।'

ওই বলে সকলকে ভয় দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার অভয় দিয়ে কুঞ্জ বলল, 'তবে ছাড়তে হবেই শেষ তক। কুঞ্জ মাঝির সাথে তো চালাকি চলবে না।'

ঘরের দাওয়া থেকে সকলকে উঠানে নামিয়ে দেওয়া হল। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে কুঞ্জ দাওয়ায় জল ছিটিয়ে দিল। দামিনীর এলো চুল শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল দাওয়ার একটা খুঁটির সঙ্গে। দামিনীর না রইল বসবার উপায়, না রইল পালাবার ক্ষমতা। তাকে আর কারও ধরে রাখবার প্রয়োজন রইল না। নড়তে গিয়ে চুলে টান লাগায় দামিনী আর্তনাদ করে উঠতে লাগল।

কুঞ্জ টিটকারি দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'রও, বাছাধন রও। এখনি হয়েছে কী! মজাটি টের পাওয়াচ্ছি তোমায়!'

ধীরেন প্রথম দিকে চুপ করে ছিল। বাধা দিয়ে লাভ নেই। গাঁয়ের লোক কথা শোনে না, বিরক্ত হয়। এবার সে আর ধৈর্য ধরতে পারল না।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, নবীন?'

'তুমি চুপ করো ভাই।'

উঠানে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন পুরুষ ও নারী এবং গোটা পাঁচেক লণ্ঠন জড়ো হয়েছে। মেয়েদের সংখ্যা খুব কম, যারা এসেছে বয়সও তাদের বেশি। কমবয়সি মেয়েরা আসতে সাহস পায়নি, অনুমতিও পায়নি। যদি ছোঁয়াচ লাগে, নজর লাগে, অপরাধ হয়! মন্ত্রমুগ্ধের মতো এতগুলি মেয়ে-পুরুষ দাওয়ার দিকে তাকিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে, এই দুর্লভ রোমাঞ্চ থেকে তাদের বঞ্চিত করার ক্ষমতা নবীনের নেই। দাওয়াটি যেন স্টেজ, সেখানে যেন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত রহস্যকে সহজবোধ্য নাটকের রূপ দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে, ঘরের দুয়ারে কুঞ্জ যেন আমদানি করেছে জীবনের শেষ সীমানার ওপারের ম্যাজিক। এমন ঘরোয়া, এমন বাস্তব হয়ে উঠেছে দামিনীর মধ্যে অদেহী ভয়ঙ্করের এই ঘনিষ্ঠ আবির্ভাব! ভয় সকলে ভুলে গেছে। শুধু আছে তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতূহলভরা পরম উপভোগ্য শিহরণ।

এক পা সামনে এগিয়ে, পাশে সরে, পিছু হটে, সামনে পিছনে দুলে দুলে, কুঞ্জ দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়াতে থাকে। মালসাতে আগুন করে তাতে সে একটি দুটি শুকনো পাতা আর শিকড় পুড়তে দেয়, চামড়া পোড়ার মতো একটা উৎকট গন্ধে চারিদিক ভরে যায়। দামিনীর আর্তনাদ ও ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসছিল, এক সময়ে খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সে বোজা বোজা চোখে কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইল।

তখন একটা কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে কুঞ্জ তার নাকের কাছে ধরল। দামিনীর ঢুলুঢুলু চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গে ঘন ঘন শিহরণ বয়ে যেতে লাগল।

'কে তুই? বল, তুই কে?'

'আমি শুভ্রা গো, শুভ্রা। আমায় মেরো না।

'চাটুয্যে বাড়ির শুভ্রা? যে খুন হয়েছে?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আমায় মেরো না।'

নবীন দাওয়ার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জ বলল, 'ব্যাপার বুঝলেন কর্তা?'

উঠান থেকে চাপা গলায় বুড়ো ঘোষালের নির্দেশ এল, 'কে খুন করেছিল শুধোও না কুঞ্জ? ওহে কুঞ্জ, শুনছো? কে শুভ্রাকে খুন করেছিল শুধিয়ে নাও চট করে।'

কুঞ্জকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না, দামিনী নিজে থেকেই ফিশফিশ করে জানিয়ে দিল, 'বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।'

নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার তাকে প্রশ্ন করা হল কিন্তু দামিনীর মুখ দিয়ে এ ছাড়া আর কোনো জবাব বার হল না যে, সে শুভ্রা এবং বলাই তাকে খুন করেছে। তারপর একসময় তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল, নাকে হলুদ পোড়া ধরেও আর তাকে কথা বলানো গেল না। কুঞ্জ অন্য একটি প্রক্রিয়ার আয়োজন করছিল কিন্তু কৈলাশ ডাক্তার এসে পড়ায় আর সুযোগ পেল না। কৈলাসের চেহারাটি জমকালো, প্রকাণ্ড শরীর, একমাথা কাঁচাপাকা চুল, মোটা ভুরু আর মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। এসে দাঁড়িয়েই ষাঁড়ের মতো গর্জন করতে করতে সে সকলকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করল, কুঞ্জর আগুনের মালসা তার দিকেই লাথি মেরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'দাঁড়া হারামজাদা, তোকে ফাঁসিকাঠে ঝুলোচ্ছি। ওষুদ দিয়ে বউমাকে আজ মেরে ফেলে থানায় তোর নামে রিপোর্ট দেব, তুই খুন করেছিস।'

কৈলাস খুঁটিতে বাঁধা চুল খুলে দামিনীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলাইয়ের দাদামশায়ের আমলের প্রকাণ্ড খাটের বিছানায় শুইয়ে দিল। প্যাঁট করে তার বাহুতে ছুঁচ ফুটিয়ে গায়ে ঢুকিয়ে দিল ঘুমের ওষুধ।

দামিনী কাতরভাবে বলল, 'আমায় মেরো না গো, মেরো না। আমি শুভ্রা। চাটুয্যে বাড়ির শুভ্রা।' কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

দামিনীর মুখ দিয়ে শুভ্রা বলাই চক্রবর্তীর নাম করায় অনেক বিশ্বাসীর মনে যে ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছিল, বুড়ো ঘোষালের ব্যাখ্যা শুনে সেটা কেটে গেল। শুভ্রার তিনদিন আগে বলাই চক্রবর্তী মরে গিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু শুধু জ্যান্ত মানুষ কি মানুষের গলা টিপে মারে? আর কিছু মারে না? শ্মশানে মশানে দিনক্ষণ প্রভৃতির যোগাযোগ ঘটলে পথ ভোলা পথিকের ঘাড় তবে মাঝে মাঝে মটকে দেয় কিসে!

ব্যাখ্যাটা দেওয়া উচিত ছিল কুঞ্জ গুণীর। বুড়ো ঘোষাল আগেই সকলকে শুনিয়ে দেওয়াতে জোর গলায় তাকে সমর্থন করেই নিজের মর্যাদা বাঁচানো ছাড়া তার উপায় রইল না। তবে কথাটাকে সে ঘুরিয়ে দিল একটু অন্যভাবে, যার ফলে অবিশ্বাসীর মনে পর্যন্ত খটকা বাধা সম্ভব হয়ে উঠল। বলাই চক্রবর্তীই শুভ্রাকে খুন করেছে বটে কিন্তু সোজাসুজি নিজে নয়। কারণ, মরার এক বছরের মধ্যে সেটা কেউ পারে না, ওই সময়ের মধ্যে শ্রাদ্ধ শান্তি না হলে তবেই সোজাসুজি মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা জন্মায়। বলাই চক্রবর্তী একজনকে ভর করে তার মধ্যস্থতায় শুভ্রাকে খুন করেছে তার রক্তমাংসের হাত দিয়ে।

না, যাকে সে ভর করেছিল তার কিছু মনে নেই। মনে কি থাকে!

এক রাত্রে অনেক কান ঘুরে পরদিন সকালে এই কথাগুলি ধীরেনের কানে গেল। অগ্রহায়ণের উজ্জ্বল মিঠে রোদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, বর্ষার পরিপুষ্ট গাছে আর

আগাছার জঙ্গলে যেন পার্থিব জীবনের ছড়াছড়ি। বাড়ির পিছনে ডোবাটি কচুরিপানায় আচ্ছন্ন, গাঢ় সবুজ অসংখ্য রসালো পাতা, বর্ণনাতীত কোমল রঙের অপরূপ ফুল। তালগাছের গুঁড়ির ঘাটটি কার্তিক মাসেও প্রায় জলে ডুবে ছিল, এখন জল কমে অর্ধেকের বেশি ভেসে উঠেছে। টুকরো বসিয়ে ধাপগুলি এবার ধীরেন বিশেষ করে শুভ্রার জন্য বানিয়ে দিয়েছিল, সাত মাসের গর্ভ নিয়ে ঘাটে উঠতে নামতে সে যাতে পা পিছলে আছাড় না খায়। পাড়ার মানুষ বাড়ি বয়ে গাঁয়ের গুজব শুনিয়ে গেল। আবেষ্টনীর প্রভাবে উদ্ভট কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে ধীরেনের মন থেকে বাতিল হয়ে গেল। ক্ষুব্ধ হবার অবসরও সে পেল না। ডোবার কোনদিক থেকে কীভাবে কে সেদিন সন্ধ্যায় ঘাটে এসেছিল, কেন এসেছিল, এই পুরোনো ভাবনা সে ভাবছিল অনেকক্ষণ থেকে। তাই সে ভাবতে লাগল। একমাত্র এই ভাবনা তাকে অন্যমনস্ক করে দেয়। ক্ষোভ ও বিষাদের তার এত প্রাচুর্য এখন যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হতে না পারলে তার অসহ্য কষ্ট হয়। অন্য কোন বিষয়ে তার মন বসে না।

ভাতের থালা সামনে ধরে দিয়ে শান্তি বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয় তাই হবে। নইলে—'

কটমট করে তাকিয়ে ধীরেন ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ। যা খুশি মনে হোক তোমার, আমায় কিছু বলবে না। খপরদার।'

স্কুলে যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল মুখে তারা কিছু বলল না, কিন্তু তাদের তাকানোর ভঙ্গি যেন আরও স্পষ্ট জিজ্ঞাসা হয়ে উঠল ঃ কথাটা তুমি কীভাবে নিয়েছ শুনি? পুরুতঠাকুর তাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে দোষ মোচনের জন্য দরকারি ক্রিয়াকর্মের বিষয় আলোচনা করলেন, উপদেশ দিলেন, বিশেষ করে বলে দিলেন যে স্কুল থেকে ফিরবার সময় তার বাড়ি থেকে সে যেন তার নিজের ও বাড়ির সকলের ধারণের জন্য মাদুলি নিয়ে যায়। স্কুলে পা দেওয়ার পর থেকে ধীরেনের মনে হতে লাগল, সে যেন বাইরের কোন বিশিষ্ট অভ্যাগত, স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছে, তার সাত বছরের অভ্যস্ত অস্তিত্বকে আজ এক মুহূর্তের জন্য কেউ ভুলতে পারছে না।

প্রথম ঘণ্টাতেই ক্লাস ছিল। অর্ধেক ছেলে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, বাকি অর্ধেক নিজেদের মধ্যে গুজগাজ ফিশফিশ করছে। নিজেকে জীবন্ত ব্যঙ্গের মতো মনে হচ্ছিল। বইয়ের পাতায় চোখ রেখে ধীরেন পড়াতে লাগল। চোখ তুলে ছেলেদের দিকে তাকাতে পারল না।

ঘণ্টা কাবার হতেই হেডমাস্টার ডেকে পাঠালেন।

'তুমি একমাসের ছুটি নাও ধীরেন।'

'এক মাসেব ছুটি?'

'মথুরবাবু এইমাত্র বলে গেলেন। আজ থেকেই ছুটি পাবে, আজ আর তোমার পড়িয়ে কাজ নেই।'

মথুরবাবু স্কুলের সেক্রেটারি। মাইল খানেক পথ হাঁটলেই তার বাড়ি পাওয়া যায়। চলতে চলতে মাঝপথে ধীরেনের মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। কদিন থেকে হঠাৎ চেতনায় ঝাঁকি লেগে মাথাটা তার এইরকম ঘুরে উঠছে। চিন্তা ও অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তনের

সঙ্গে এই ঝাঁকি লাগে। অথবা এমনই ঝাঁকি লেগে তার চিন্তা ও অনুভূতি বদলে যায়।

গাছতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। মথুরবাবু এখন হয়তো খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করছেন, এখন তাঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি, একমাসের ছুটি দেওয়া হয়েছে। একমাসের মধ্যে মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করার অনেক সময় সে পাবে। আজ গিয়ে হাতে পায়ে না ধরাই ভালো। মথুরবাবুর যদি দয়া হয়, যদি তিনি বুঝতে পারেন যে তার বোন খুন হয়েছে বলে, দামিনীর ঘোষণার ফলে তার বোনের কাল্পনিক কেলেঙ্কারি নিয়ে চারিদিকে হইচই হচ্ছে বলে তাকে দোষী করা উচিত নয়, তাহলে মুশকিল হতে পারে। ছুটি বাতিল করে কাল থেকে কাজে যাবার অনুমতি হয়তো তিনি দিয়ে বসবেন। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি, এখন সে বুঝতে পেরেছে, নিয়মিতভাবে প্রতিদিন স্কুলে ছেলেদের পড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। মথুরবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হচ্ছে। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে সে মাঠের পথ ধরে বাড়ি চলেছে। বাড়ি গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোতে হবে। দুর্বল শরীরটা বিছানায় লুটিয়ে দিয়ে ভারী মাথাটা বালিশে রাখতে হবে।

সারা দুপুর ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে ছটফট করে কাটিয়ে শেষবেলায় ধীরেন উঠানে বেরিয়ে এল। মাজা বাসন হাতে নিয়ে শান্তি ঘাট থেকে উঠে আসছিল। ডোবার ধারে প্রকাণ্ড বাঁশ ঝাড়টার ছায়ায় মানুষের মতো কী যেন একটা নড়াচড়া করছে!

ধীরেন আর্তনাদ করে উঠল, 'কে ওখানে? কে?'

শান্তির হাতের বাসন ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল। উঠিপড়ি করে কাছে ছুটে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় কে? কোনখানে?'

বাঁশঝাড় থেকে চেনা গলার আওয়াজ এল।—'আমি মাস্টারবাবু। বাঁশ কাটছি।'

'কে তোকে বাঁশ কাটতে বলেছে?'

শান্তি বলল, 'আমি বলেছি। ক্ষেন্তিপিসি বলল, নূতন একটা বাঁশ কেটে আগা মাথা একটু পুড়িয়ে ঘাটের পথে আড়াআড়ি ফেলে রাখতে। ভোরে উঠে সরিয়ে দেব, সন্ধের আগে পেতে রাখব। তুমি যেন আবার ভুল করে বাঁশটা ডিঙিয়ে যেও না।'

সন্ধ্যার আগেই শান্তি আজকাল রাঁধাবাড়া আর ঘরকন্নার সব কাজ শেষ করে রাখে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর ধীরেনকে সঙ্গে না নিয়ে বড়ঘরের চৌকাঠ পার হয় না। ছেলেমেয়েদেরও ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। সন্ধ্যা থেকে ঘরে বন্দী হয়ে ধীরেন আকাশপাতাল ভাবে আর মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে ছেলেমেয়েদের আলাপ শোনে।

'ছোটপিসি ভূত হয়েছে।'

'ভূত নয়, পেতনি। ব্যাটাছেলে ভূত হয়।'

ঘরের মধ্যেও কারণে-অকারণে শান্তি ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে। কাল প্রথম রাত্রে একটা প্যাঁচার ডাক শুনে ধীরেনকে আঁকড়ে ধরে গোঙাতে গোঙাতে বমি করে ফেলেছিল।

বড়ো ঘরের দাওয়ার পুব প্রান্তে বসে তামাক টানতে টানতে দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। এখানে বসে ডোবার ঘাট আর দুধারের বাঁশঝাড় ও জঙ্গল দেখা যায়। জঙ্গলের পর সেনেদের কলাবাগান। সেনেদের কাছারি ঘরের পাশ দিয়ে দূরে বোসেদের মজা পকুরের

তীরে মরা গজারি গাছটার ডগা চোখে পড়ে। অন্ধকার হবার আগেই কুয়াশায় প্রথমে গাছটা তারপর সেনেদের বাড়ি আবছা হয়ে ঢাকা পড়ে গেল।

'তুমি কি আর ঘাটের দিকে যাবে?' শান্তি জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'তবে বাঁশটা পেতে দাও।'

'বাঁশ পাততে হবে না।'

শান্তি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমার চোখ লাল হয়েছে। টকটকে লাল।'

'হোক।'

শোবার ঘর আর রান্নাঘরের ভিটের সঙ্গে দুটি প্রান্ত ঠেকিয়ে শান্তি নিজেই বাঁশটা পেতে দিল। কাঁচা বাঁশের দুপ্রান্তের খানিকটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অশরীরী কোন কিছু এ বাঁশ ডিঙোতে পারবে না। ঘাট থেকে শুভ্রা যদি বাড়ির উঠানে আসতে চায়, এই বাঁশ পর্যন্ত এসে ঠেকে যাবে।

আলো জ্বালার আগেই ছেলেমেয়েদের খাওয়া শেষ হল। সন্ধ্যাদীপ না জ্বেলে শান্তির নিজের খাওয়ার উপায় নেই, ভালো করে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে তাড়াতাড়ি দীপ জ্বেলে ঘরে ঘরে দেখিয়ে শাঁখে ফুঁ দিল। দশ মিনিটের মধ্যে নিজে খেয়ে ধীরেনের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে, রান্নাঘরে তালা দিয়ে, কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিকালে আজকাল সে মাছ রান্না করে না, এঁটোকাঁটা নাকি অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করে। খাওয়ার হাঙ্গামা খুব সংক্ষেপে, সহজে এবং অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

'ঘরে আসবে না?'

'না।'

তখনও আকাশ থেকে আলোর শেষ আভাসটুকু মুছে যায়নি। দু-তিনটি তারা দেখা দিয়েছে, আরও কয়েকটি দেখা দিতে দিতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে, আর এক মিনিট কি দু-মিনিটের মধ্যে রাত্রি শুরু হয়ে যাবে। জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় সন্ধ্যা। ভর সন্ধ্যাবেলা শুভ্রা দামিনীকে আশ্রয় করেছিল। আজ সন্ধ্যা পার হলে রাত্রি আরম্ভ হয়ে গেলে চেষ্টা করেও শুভ্রা হয়তো তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। আর দেরি না করে এখুনি শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

চোরের মতো ভিটে থেকে নেমে বাঁশ ডিঙিয়ে ধীরেন পা টিপে টিপে ডোবার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

অদ্ভুত বিকৃত গলার ডাক শুনে শান্তি লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাঁশের ওপারে দাঁড়িয়ে হিংস্র জন্তুর চাপা গর্জনের মতো গম্ভীর আওয়াজে ধীরেন তার নিজের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। গেঞ্জি আর কাপড়ে কাদা ও রক্তমাখা। ঠোঁট থেকে চিবুক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'বাঁশটা সরিয়ে দাও।'

'ডিঙিয়ে এসো। বাঁশ ডিঙিয়ে চলে এসো। কী হয়েছে? পড়ে গেছ নাকি?'

'ডিঙোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।'

বাঁশ ডিঙোতে পারছে না! মাটিতে শোয়ানো বাঁশ! শান্তির আর এতটুকু সন্দেহ রইল না। আকাশ-চেরা তীক্ষ্ণ গলায় সে আর্তনাদের পর আর্তনাদ শুরু করে দিল।

তারপর প্রতিবেশী এল, পাড়ার লোক এল, গাঁয়ের লোক এল। কুঞ্জও এল। তিন-চার কলস জল ঢেলে ধীরেনকে স্নান করিয়ে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলা হল। মন্ত্র পড়ে, জল ছিটিয়ে, মালসার আগুনে পাতা ও শিকড় পুড়িয়ে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় ধীরেনকে কুঞ্জ নিঝুম করে ফেলল।

তারপর মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্রকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুই? বল্ তুই কে?'

ধীরেন বলল, 'আমি বলাই চক্রবর্তী। শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।'

কে বাঁচায়, কে বাঁচে!

সেদিন আপিস যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম মৃত্যু দেখল—অনাহারের মৃত্যু।

এতদিন শুধু শুনে আর পড়ে এসেছিল ফুটপাথে মৃত্যুর কথা, আজ চোখে পড়ল প্রথম। ফুটপাথে হাঁটা তার বেশি প্রয়োজন হয় না। নইলে দর্শনটা অনেক আগেই ঘটে যেত সন্দেহ নেই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু-পা হেঁটেই সে ট্রামে ওঠে, নামে গিয়ে প্রায় আপিসেরই দরজায়। বাড়িটাও তার শহরের এমন এক নিরিবিলি অঞ্চলে যে সে পাড়ায় ফুটপাথও বেশি নেই, লোকে মরতেও যায় না বেশি। চাকর ও ছোটভাই তার বাজার ও কেনাকাটা করে।

কয়েক মিনিটে মৃত্যুঞ্জয়েব সুস্থ শরীরটা অসুস্থ হয়ে গেল। মনে আঘাত পেলে মৃত্যুঞ্জয়ের শরীরে তার প্রতিক্রিয়া হয়, মানসিক বেদনাবোধের সঙ্গে চলতে থাকে শারীরিক কষ্টবোধ। আপিসে পৌঁছে নিজের ছোট কুঠরিতে ঢুকে সে যখন ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল, তখন সে রীতিমতো কাবু হয়ে পড়েছে। একটু বসেই তাই উঠে গেল কলঘরে। দরজা বন্ধ করে বাড়ি থেকে পেট ভরে যত কিছু খেয়ে এসেছিল, ভাজা, ডাল, তরকারি, মাছ, দই আর ভাত, প্রায় সব বমি করে উগরে দিল।

পাশের কুঠরি থেকে নিখিল যখন খবর নিতে এল, কলঘর থেকে ফিরে মৃত্যুঞ্জয় কাঁচের গ্লাসে জল পান করছে। গ্লাসটা খালি করে নামিয়ে রেখে সে শূন্যদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল।

আপিসে সে আর নিখিল প্রায় সমপদস্থ। মাইনে দুজনের সমান, একটা বাড়তি দায়িত্বের জন্য মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চাশ টাকা বেশি পায়। নিখিল রোগা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং একটু আলসে প্রকৃতির লোক। মৃত্যুঞ্জয়ের দু-বছর আগে বিয়ে করে আট বছরে সে মোটে দুটি সন্তানের পিতা হয়েছে। সংসারে তার নাকি মন নেই। অবসর জীবনটা সে বই পড়ে আর একটা চিন্তাজগৎ গড়ে তুলে কাটিয়ে দিতে চায়।

অন্য সকলের মতো মৃত্যুঞ্জয়কে সেও খুব পছন্দ করে। হয়তো মৃদু একটু অবজ্ঞার সঙ্গে ভালোও বাসে। মৃত্যুঞ্জয় শুধু নিরীহ শান্ত দরদি ভালোমানুষ বলে নয়, সৎ ও সরল বলেও নয়, মানবসভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে পচা ঐতিহ্য-আদর্শবাদের কল্পনা-তাপস বলে। মৃত্যুঞ্জয় দুর্বলচিত্ত ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী হলে কোন কথা ছিল না, দুটো খোঁচা দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুললেই তার মনের পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার বেরিয়ে এসে তাকে অবজ্ঞেয় করে দিত। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শ্লথ, নিস্তেজ নয়। শক্তির একটা উৎস আছে তার মধ্যে, অব্যয়কে শব্দরূপ দেবার চেষ্টায় যে শক্তি বহুক্ষয় হয়ে গেছে মানুষের জগতে তারই একটা অংশ। নিখিল পর্যন্ত তাই মাঝে মাঝে কাবু হয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে। মৃদু ঈর্ষার সঙ্গেই সে তখন ভাবে যে নিখিল না হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হলে মন্দ ছিল না।

মৃত্যুঞ্জয়ের রকম দেখেই নিখিল অনুমান করতে পারল বড় একটা সমস্যার সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়েছে এবং শার্সিতে আটকানো মৌমাছির মতো সে মাথা খুঁড়ছে সেই ঃ সমস্যার অকারণ অর্থহীন অনুচিত কাঠিন্যে।

'কি হল হে তোমার?' নিখিল সন্তর্পণে প্রশ্ন করল।

'মরে গেল! না খেয়ে মরে গেল!' আনমনে অর্ধভাষণে যেন আর্তনাদ করে উঠল মৃত্যুঞ্জয়।

আরও কয়েকটি প্রশ্ন করে নিখিলের মনে হল, মৃত্যুঞ্জয়ের ভিতরটা সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ফুটপাথে অনাহারে মৃত্যুর মতো সাধারণ সহজবোধ্য ব্যাপারটা সে ধারণা করতে পারছে না। সেটা আশ্চর্য নয়। সে একসঙ্গে পাহাড়প্রমাণ মালমশলা ঢোকাবার চেষ্টা করছে তার ক্ষুদ্র ধারণাশক্তির থলিটিতে। ফুটপাথের ওই বীভৎসতা ক্ষুধা অথবা মৃত্যুর রূপ? না খেয়ে মরা কি ও কেমন? কত কষ্ট হয় না খেয়ে মরতে, কি রকম কষ্ট? ক্ষুধার যাতনা বেশি, না মৃত্যুযন্ত্রণা বেশি—ভয়ঙ্কর?

অথচ নিখিল প্রশ্ন করলে সে জবাবে বলল অন্য কথা।—'ভাবছি, আমি বেঁচে থাকতে যে লোকটা না খেয়ে মরে গেল, এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি? জেনে শুনেও এতকাল চারবেলা করে খেয়েছি পেট ভরে। যথেষ্ট রিলিফওয়ার্ক হচ্ছে না লোকের অভাবে, আর এদিকে ভেবে পাই না কি করে সময় কাটাব। ধিক্। শত ধিক্ আমাকে।'

মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ ছলছল করছে দেখে নিখিল চুপ করে থাকে। দরদের চেয়ে ছোঁয়াচে কিছুই নেই এ জগতে। নিখিলের মনটাও খারাপ হয়ে যায়। দেশের সমস্ত দরদ পুঞ্জীভূত করে ঢাললেও এ আগুন নিভবে না ক্ষুধার, অন্নের বদলে বরং সমিধে পরিণত হয়ে যাবে। ভিক্ষা দেওয়ার মতো অস্বাভাবিক পাপ যদি আজও পুণ্য হয়ে থাকে, জীবনধারণের অন্নে মানুষের দাবি জন্মাবে কিসে? রূঢ় বাস্তব নিয়মকে উলটে মধুর আধ্যাত্মিক নীতি করা যায়, কিন্তু সেটা হয় অনিয়ম। চিতার আগুনে যত কোটি মড়া-ই এ পর্যন্ত পোড়ানো হয়ে থাক, পৃথিবীর সমস্ত জ্যান্ত মানুষগুলিকে চিতায় তুলে দিলে আগুন তাদেরও পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

বিক্ষুব্ধ চিত্তে এইসব কথা ভাবতে ভাবতে নিখিল সংবাদপত্রটি তুলে নিল। চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে নজরে পড়ল, ভালভাবে সদ্গতির ব্যবস্থা করে গোটা কুড়ি মৃতদেহকে স্বর্গে পাঠানো হয়নি বলে একস্থানে তীক্ষ্ণধার হা-হুতাশভরা মন্তব্য করা হয়েছে।

কদিন পরেই মাইনের তারিখ এল। নিখিলকে প্রতিমাসে তিন জায়গায় কিছু কিছু টাকা পাঠাতে হয়। মানি অর্ডারের ফর্ম আনিয়ে কলম ধরে সে ভেবে ঠিক করবার চেষ্টা করছে তিনটি সাহায্যই এবার পাঁচ টাকা করে কমিয়ে দেবে কিনা। মৃত্যুঞ্জয় ঘরে এসে বসল। সেদিনের পর থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে আছে। নিখিলের সঙ্গেও বেশি কথা বলেনি।

'একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই।' মৃত্যুঞ্জয় একতাড়া নোট নিখিলের সামনে রাখল।—'টাকাটা কোনো রিলিফ ফান্ডে দিয়ে আসতে হবে।'

'আমি কেন?'

'আমি পারব না।'

নিখিল ধীরে ধীরে টাকাটা গুনল।

'সমস্ত মাইনেটা?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়িতে তোর ন-জন লোক। মাইনের টাকায় মাস চলে না। প্রতিমাসে ধার করছিস।'

'তা হোক। আমায় কিছু একটা করতেই হবে ভাই। রাতে ঘুম হয় না, খেতে বসলে

খেতে পারি না। একবেলা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমার আর টুনুর মা-র একবেলার ভাত বিলিয়ে দি।'

নিখিল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। জ্বর হলে যেমন দেখায়, মৃত্যুঞ্জয়ের গোলগাল মুখখানা তেমনই থমথম করছে। ভেতরে সে পুড়ছে সন্দেহ নেই।

'টুনুর মার যা স্বাস্থ্য, একবেলা খেয়ে দিন পনের-কুড়ি টিকতে পারবে।'

মন্তব্য শুনে মৃত্যুঞ্জয় ঝাঁঝিয়ে উঠল—'আমি কি করব? কত বলেছি, কত বুঝিয়েছি, কথা শুনবে না। আমি না খেলে উনিও খাবেন না। এ অন্যায় নয়? অত্যাচার নয়? মরে তো মরবে না খেয়ে।'

নিখিল ভাবছিল বন্ধুকে বুঝিবে বলবে, এভাবে দেশের লোককে বাঁচানো যায় না। যে অন্ন পাওয়া যাচ্ছে সে অন্ন তো পেটে যাবেই কারো না কারো। যে রিলিফ চলছে তা শুধু একজনের বদলে আর একজনকে খাওয়ানো। এতে শুধু আড়ালে যারা মরছে তাদের মরতে দিয়ে চোখের সামনে যারা মরছে তাদের কয়েকজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সান্ত্বনা। কিন্তু এসব কোন কথাই সে বলতে পারল না, গলায় আটকে গেল।

সে শুধু বলল, 'ভূরিভোজনটা অন্যায়, কিন্তু না খেয়ে মরাটা উচিত নয় ভাই। আমি কেটে ছেঁটে যতদূর সম্ভব খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি। বেঁচে থাকতে যতটুকু দরকার খাই এবং দেশের সমস্ত লোক মরে গেলেও যদি সেইটুকু সংগ্রহ করার ক্ষমতা আমার থাকে, কাউকে না দিয়ে নিজেই আমি তা খাব। নীতিধর্মের দিক থেকে বলছি না, সমাজধর্মের দিক থেকে বিচার করলে দশজনকে খুন করার চেয়ে নিজেকে না খাইয়ে মারা বড় পাপ।'

'ওটা পাশবিক স্বার্থপরতা।'

'কিন্তু যারা না খেয়ে মরছে তাদের যদি এই স্বার্থপরতা থাকত? এক কাপ অখাদ্য গ্রুয়েল দেওয়ার বদলে তাদের যদি স্বার্থপর করে তোলা হতো? অন্ন থাকতে বাংলায় না খেয়ে কেউ মরত না। তা সে অন্ন হাজার মাইল দূরেই থাক আর একত্রিশটা তালা লাগানো গুদামেই থাক।'

'তুই পাগল নিখিল। বদ্ধ পাগল।' বলে মৃত্যুঞ্জয় উঠে গেল।

'তারপর দিন দিন কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল মৃত্যুঞ্জয়। দেরি করে আপিসে আসে, কাজে ভুল করে, চুপ করে বসে ভাবে, একসময় বেরিয়ে যায়। বাড়িতে তাকে পাওয়া যায় না। শহরের আদি অন্তহীন ফুটপাত ধরে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ডাস্টবিনের ধারে, গাছের নীচে, খোলা ফুটপাথে যারা পড়ে থাকে, অনেক রাত্রে দোকান বন্ধ হলে যারা হামাগুড়ি দিয়ে সামনের রোয়াকে উঠে একটু ভাল আশ্রয় খোঁজে, ভোর চারটে থেকে যারা লাইন দিয়ে বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয় তাদের লক্ষ করে। পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা খুঁজে বার করে অন্নপ্রার্থীর ভিড় দেখে। প্রথম প্রথম সে এইসব নবনারীর যতজনের সঙ্গে সম্ভব আলাপ করত। এখন সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। সকলে এক কথাই বলে। ভাষা ও বলার ভঙ্গি পর্যন্ত তাদের এক ধাঁচের। নেশায় আচ্ছন্ন অর্ধচেতন মানুষের প্যানপ্যানানির মতো ঝিমানো সুরে সেই এক ভাগ্যের কথা, দুঃখের কাহিনী। কারও বুকে নালিশ নেই, কারও মনে প্রতিবাদ নেই। কোথা থেকে কীভাবে কেমন করে সব ওলটপালট হয়ে গেল তারা জানেনি, বোঝেনি, কিন্তু মেনে নিয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির অবস্থা শোচনীয়। টুনুর মা বিছানা নিয়েছে, বিছানায় পড়ে থেকেই সে বাড়ির ছেলেবুড়ো সকলকে তাগিদ দিয়ে দিয়ে স্বামীর খোঁজে বার বার বাইরে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এই বিরাট শহরের কোথায় আগন্তুক মানুষের কোন্ জঞ্জালের মধ্যে তাকে তারা খুঁজে বার করবে! কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে তারা ফিরে আসে, টুনুর মাকে মিথ্যা করে বলে যে মৃত্যুঞ্জয় আসছে—খানিকপরেই আসছে। খবর দিয়ে বাড়ির সকলে কেউ গম্ভীর, কেউ কাঁদো কাঁদো মুখ করে বসে থাকে, ছেলেমেয়েগুলি অনাদরে অবহেলায় ক্ষুধার জ্বালায় চেঁচিয়ে কাঁদে।

নিখিলকে বারবার আসতে হয়। টুনুর মা তাকে সকাতর অনুরোধ জানায়, সে যেন একটু নজর রাখে মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে, একটু যেন সে সঙ্গে থাকে তার।

নিখিল বলে, 'আপনি যদি সুস্থ হয়ে উঠে ঘরের দিকে তাকান তাহলে যতক্ষণ পারি সঙ্গে থাকব, নইলে নয়।'

টুনুর মা বলে, 'উঠতে পারলে আমিই তো ওর সঙ্গে ঘুরতাম ঠাকুরপো।'

'ঘুরতেন?'

'নিশ্চয়। ওঁর সঙ্গে থেকে থেকে আমিও অনেকটা ওঁর মত হয়ে গেছি। উনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন, আমারও মনে হচ্ছে যেন পাগল হয়ে যাব। ছেলেমেয়েগুলির জন্য সত্যি আমার ভাবনা হয় না। কেবলই মনে পড়ে ফুটপাতের ওই লোকগুলির কথা। আমাকে দু-তিনদিন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে টুনুর মা আবার বলে, 'আচ্ছা, কিছুই কি করা যায় না?—এই ভাবনাতেই ওঁর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা ধারণা জন্মেছে, যথাসর্বস্ব দান করলেও কিছুই ভালো করতে পারবেন না। দারুণ একটা হতাশা জেগেছে ওঁর মনে। একেবারে মুষড়ে যাচ্ছেন দিনকে দিন।'

নিখিল শোনে আর তার মুখ কালি হয়ে যায়।

মৃত্যুঞ্জয় আপিসে যায় না। নিখিল চেষ্টা করে তার ছুটির ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছে। আপিসের ছুটির পর সে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যায়—মৃত্যুঞ্জয়ের ঘোরাফেরার স্থানগুলি এখন অনেকটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেও মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কাটিয়ে দেয়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে তাকে উলটো কথা শোনায়, নিজের আগেকার যুক্তিতর্কগুলি নিজেই খণ্ড খণ্ড করে দেয়। মৃত্যুঞ্জয় শোনে কিন্তু তার চোখ দেখেই টের পাওয়া যায় যে কথার মানে সে আর বুঝতে পারছে না, তার অভিজ্ঞতার কাছে কথার মারপ্যাঁচ অর্থহীন হয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে নিখিলকে হাল ছেড়ে দিতে হয়।

তারপর মৃত্যুঞ্জয়ের গা থেকে ধূলিমলিন সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে যায়। পরনের ধুতির বদলে আসে ছেঁড়া ন্যাকড়া, গায়ে তার মাটি জমা হয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। দাড়িতে মুখ ঢেকে যায়। ছোট একটি মগ হাতে আরও দশজনের সঙ্গে সে পড়ে থাকে ফুটপাথে আর কাড়াকাড়ি মারামারি ক'রে লঙ্গরখানার খিচুড়ি খায়। বলে, 'গাঁ থেকে এইছি। খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও!'

সাড়ে সাত সের চাল

আঁধার রাত। গাঁয়ের নিঝুম পথ।

বেলেমাটির কাঁচা নরম পথে সন্ন্যাসী হেঁটে চলেছিল। পথের এই গুণের কথা সন্ন্যাসীর মনে ছিল না। স্টেশন থেকে তিন মাইল দূর সালাতি পেরিয়ে আরও চার মাইল হেঁটে পলাশমতিতে পৌঁছবার কষ্ট সন্ন্যাসীর কল্পনায় ভয়ানক হয়ে উঠেছিল। দেহ বড় দুর্বল, কোমর আর হাঁটুতে ব্যথা, মনে মনে সর্বাঙ্গের পুঞ্জীভূত ব্যথিত অবসাদ। প্রথমটা সন্ন্যাসী স্টেশনেই শুয়ে থাকবে ভেবেছিল। চার পয়সা দিয়ে এক ভাঁড় চা খেয়ে স্টেশনের শেডটার নীচে চিত্রপাত হয়ে রাতটা কাটিয়ে ভোরে বাড়ির দিকে রওনা হবে।

কিন্তু সন্ন্যাসী হিসেবি লোক, কল্পনা করতেও ভারী পটু। সে হিসেব করে দেখল, সাত মাইল পথ তাকে হাঁটতেই হবে, রাতেই হোক বা ভোরেই হোক! এক কাপ চা খেয়ে খিদেকে মেরে ফেললেও মরা খিদে রাতভোর জীবনীশক্তি শুষে শুষে আরও একটু কাহিল করে ফেলবে তাকে। ঘুম ভাঙতে হয়তো তার বেলা হয়ে যাবে। জিরিয়ে জিরিয়ে বাড়ি পৌঁছতে হয়তো এত দেরি হবে যে সঙ্গে তার সাড়ে সাত সের চাল থাকা সত্ত্বেও বাড়ির লোকের মধ্যাহ্নভোজনটা ফসকে যাবে।

হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী কল্পনা করে—না খেতে পেয়ে কজন তার বাড়িতে ইতিমধ্যে মরে গেছে কে জানে! কজন মরোমরো হয়ে আছে তাই বা কে জানে! দু-একজন হয়তো ঠিক এমন অবস্থায় পৌঁছেছে—তাদের মধ্যে সোনা বউঠান একজন হতে পারে—তার সাড়ে সাত সের চালের দু-মুঠো নিয়ে সিদ্ধ করে আজ মাঝরাত্রেও দিতে পারলে যারা জীবনমরণের সীমারেখায় টলমল করার বদলে বেঁচে যাওয়ার দিকেই কোনোমতে টলে পড়তে পারবে। আবার লড়াই করতে পারবে তারপর। কাল পর্যন্ত দেরি করলে হয়তো—

সর্বনাশ!

সঙ্গে কিছু ছোলাও আছে। সন্ন্যাসী তাই কিছু ছোলা চিবিয়ে এক ভাঁড় চা খেয়ে রাত্রেই রওনা দিয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদকে মোটে ক্ষয় করেছে চারটি তিথি। এখন জবর জ্যোৎস্নায় নরম পথে হেঁটে মনের মতো কষ্ট পাওয়া অসম্ভব। শালা, কি টানেই বাড়িটা টানছে তাকে, অনেকেই হয়তো যেখানে ভূত হয়ে গেছে মরে, সোনা বউঠান শুদ্ধ।

প্রথম গাঁ সালাতিতে বরাবর একপাল কুকুর থাকত। পথিকে গাঁ ভেদ করে যেতে গেলেই তাদের সমবেত চিৎকারে ঘুমন্ত রাত চিরকাল জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কোনোদিন কাউকে তারা কামড়ায়নি, তাড়াও করেনি, শুধু হল্লা করেছে প্রাণপণে। তবু ভয় একটু করেছে পথিকের, হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরেছে শক্ত করে। সন্ন্যাসীর হাতে লাঠি ছিল না, গাঁয়ে ঢুকবার আগে একটা ভাঙা বাড়ির বেড়া থেকে একখণ্ড বাখারি সে সংগ্রহ করে নিয়েছিল। কিন্তু থপথপ পা ফেলে গাঁয়ের সীমানা সে পার হয়ে গেল, কুকুরের সে প্রচণ্ড কলরব তার কানে এল না। দু-চারটে খেঁকি কুকুর শুধু নির্জীব ভাঙা আওয়াজে একটু সাড়া জানিয়েই চুপ হয়ে গেল।

মানুষ ও কুকুরের একসঙ্গে মরবার ও গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যাবার এই অতি ঠাণ্ডা খবর অনুভব করতে গিয়ে সন্ন্যাসীর জ্বরো অনুভূতি ছ্যাঁতছ্যাঁত করে উঠল—গাঁ পেরিয়ে যাবার পর। এখানে পথের দুপাশে শুধু মাঠ আর জলা। সামলে নিতে থমকে দাঁড়িয়ে এলোমেলো নিশ্বাস নিতে নিতে সন্ন্যাসী চারিদিকে তাকায়, স্পষ্ট বুঝতে পারে চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল এই নির্জন বিস্তৃতির মধ্যে মনটা তার ছোটো হয়ে গেল। তারই আতঙ্কে মনটা কুঁচকে গেল, ভাঁজ হয়ে গেল। শালা, চোখেও যে ঝাপসা দেখছে!

মাথা ঘুরে পড়ে যাবার আগেই সন্ন্যাসী কায়দা করে বসে পড়ে পথে কনুই ঠেকিয়ে মাথাটা নামিয়ে দিল হাতের তালুতে। কতকাল সে পেট ভরে খায়নি, প্রাণপাত করে শুধু খেটেছে। মাঝে মাঝে এরকম হয়, তার খানিক পরেই কেটে যায়।

খানিক পরে উঠে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী আবার চলতে শুরু করল। হঠাৎ ভয়াবহ বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হল শরীর যেন তার হালকা হয়ে গেছে, তার কোন বোঝা নেই! চালের পুঁটুলি কাঁধে নেই, সেই পুঁটুলির বাড়তি কাপড়টুকুতে বাঁধা ছোলাগুলিও সেই সঙ্গে গেছে। কোথায় পড়ল? কখন পড়ল? কুরু কুরু কুরু করতে লাগল সন্ন্যাসীর পিঠের খানিকটা মেরুদণ্ড। তার হিসাব, তার কল্পনা, সব ভোঁতা হয়ে গেছে। মাথা ঘুরে পড়তে গিয়ে যেখানে বসে পড়েছিল সেইখানেই যে পুঁটুলি দুটির থাকার সম্ভাবনা বেশি, এটুকু খেয়াল করে আশান্বিত হবার ক্ষমতাটুকুও তার নেই।

একটা মৃতদেহকে ধরে দাঁড় করিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার মতো নিজের দেহটাকে সে উলটো দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। একটু গিয়েই পুঁটুলিটা পড়ে আছে দেখেও তার বিশেষ ভাবান্তর হল না। পুঁটুলির পাশে বসে মস্ত একটা আটকানো নিশ্বাস ফেলে সে শুধু নিশ্চল হয়ে আবার খানিকক্ষণ বিশ্রাম করল।

পলাশমতির কাছে পৌঁছে সন্ন্যাসীর মনে হল, সে যেন আবার আগের গাঁ সালাতিতেই ঢুকতে যাচ্ছে। পথের ধারে সালাতির যে প্রথম ভাঙা বাড়ির ভাঙা বেড়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাখারি সংগ্রহ করেছিল, পলাশমতিতে প্রবেশপথের ধারেও তেমনই একটি ভাঙা বাড়ি আছে, কেবল বেড়ার কিছুই অবশিষ্ট নেই। কানা বাঞ্ছার বাড়ি। দেখলেই টের পাওয়া যায় বাড়িটা শূন্য, মানুষ নেই।

'বাঞ্ছা!'

সাড়া না পেয়ে অনুমানকে প্রত্যয় করে সন্ন্যাসী এগিয়ে গেল। দু-একটি দুঃস্থ কুকুরের তেমনই ক্ষীণ আওয়াজ কানে আসছে। কোন বাড়িতে মানুষ আছে, কোন বাড়িতে নেই নির্ণয় করতে সে সময় নষ্ট করবে না। সোজা বাড়ি চলে যাবে—নিজের বাড়িতে কে বেঁচে আছে, কে মরে গেছে দেখতে। বামুনপাড়ার নতুন পুকুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হল কে যেন জিজ্ঞাসা করল, 'কে?', সন্ন্যাসী সাড়া দিল না। ঘোষালদের আমবাগান থেকে শুকনো পাতায় চারপেয়ে কোন কিছুর চলার মচমচ শব্দের সঙ্গে তীব্র একটা পচা গন্ধ ভেসে এল। পরের পাড়ার তিনটি বাড়ি পেরিয়ে তাদের টিনের চালার তিনটি ঘরওয়ালা বাড়ি। আট-নবছর মেরামত হয়নি। তবে যা কিছু থাকবার কথা প্রায় সবই আছে, ভেঙে পড়েনি

এখনও। বেড়া নেই। পাশের ছোটো কলাবাগান আর সবজি খেতের বেড়ার চিহ্ন লোপ পেয়েছে। সামনে লাউ কুমড়ার মাচা দুটি হয়েছে অদৃশ্য।

দেখে একটু স্বস্তি বোধ করল সন্ন্যাসী। বেড়া আর মাচা নিশ্চয় উনানে পুড়েছে। উনানে আগুন জ্বলেছে তার বাড়িতে, রান্না হয়েছে। হয়তো সবাই বেঁচে আছে বাড়িতে, একজনও মরেনি। কোনমতে কুড়িয়ে পেতে এক মুঠো দুমুঠো খেয়ে মরোমরো অবস্থায় ছেলেবুড়ো মেয়েমদ্দ সবাই বেঁচে আছে।

'মনাদা!'

প্রথমবার একটু আস্তেই ডাকল সন্ন্যাসী। তারপর জোরে।

'মনাদা।'

সাড়া নেই।

'সুবল কাকা।'

সাড়া নেই।

'সুখী পিসি!'

সাড়া নেই।

সন্ন্যাসী একটু দম নিল।

'সোনা বো'ঠান।'

সাড়া নেই।

'সোনা বো'ঠান! সোনা বো'ঠান!'

গলা চিরে গেল, বুক ফেটে গেল। তবুও তো সাড়া নেই। তখন সন্ন্যাসীর চোখে পড়ল দরজার কড়ায় আটকানো তালার দিকে। তালাটা একটা কড়ায় ঝুলছে, আরেকটি কড়া ভেঙে খসে এসেছে দরজা থেকে।

ভিতরের দুটি ঘরের একটিতে দরজার উপরে শিকলে তালা আঁটা, দরজার পাট থেকে ভেঙে খসে এসে শিকলটা ঝুলছে। অন্য ঘরটির দুয়ার সপাটে খোলা।

কোনো ঘরে কেউ নেই। তালা দিয়ে সবাই পালিয়েছে। সবাই? দাওয়ায় সাড়ে সাত সের চালের পুঁটুলি নামিয়ে সন্ন্যাসী হিসাব আর কল্পনা দিয়ে ব্যাপারটার হদিস পেতে বসল। সবাই যখন বেঁচে ছিল তখন সবাই পালিয়েছে, সোনা বউঠান সুদ্ধু? না, অনেকে যখন মরে গিয়েছিল তখন পালিয়েছে বাকি যারা ছিল?

কোথায় পালিয়ে কোথায় মরেছে বাড়ির সবাই, সোনা বউঠান সুদ্ধু?

ভাবতে ভাবতে ঝিমোতে ঝিমোতে একসময় দাওয়া থেকে হুমড়ি দিয়ে উঠোনে পড়ে সন্ন্যাসী নিঃশব্দে মরে গেল।

দুঃশাসনীয়

আগে, কিছুকাল আগে, বেশিদিনের কথা নয়, গভীর রাতেও হাতিপুর গ্রামে এলে লোকালয়ের বাস্তব অনুভূতিতে স্বস্তি মিলত। মানুষের দেখা না মিলুক, মাঠ, খেত, ডোবা, পুকুর, ঝোপঝাড়, জলা অপরিসীম রহস্যে ভরাট হয়ে থাক, হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠুক হঠাৎ, জঙ্গলের আড়ালে শুকনো পাতা মচমচিয়ে হাঁটুক রাত্রিচর পশু, বটপুকুরের পুবোত্তর কোণের তালবন থেকে খোনা কান্না ভেসে আসুক আবদেরে শকুন ছানার, দীপচিহ্নহীন ছায়ান্ধকারে নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে থাক সারাটি গ্রাম—এসবই জোগাতো ভরসা, রাতদুপুরে ঘুমন্ত গ্রামের এই সঙ্গত লাগসই পরিবেশ ও পরিচয়। গ্রাম তো এইরকমই বাংলার, রাত্রে সব গ্রাম। গা ছমছম করতো ভয়ের সংস্কারে, ভয় পাবার ভয়ে, সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে নয়।

আজ তারা হাতিপুরে এলে ভয় পাবে, সন্ধ্যার পর বাংলার গাঁগুলির স্বাভাবিক পরিবেশ আজ কি দাঁড়িয়েছে যারা জানে না। বাংলার গাঁয়ের কথা ভেবে শহরে বসে যেসব ভদ্রলোকের মাথা চিন্তায় ফেটে যাচ্ছে তাদের কথাই ধরা যাক। বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে যে অভূতপূর্ব ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চলছে সে বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ এইরকম কোনো ভদ্রলোক আজকাল একটু রাত করে হাতিপুরে এলে ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে মূর্ছা যাবে। এরা বড়ই সংস্কারবশ, মন প্রায় অবশ। অতএব, দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু—নিরুদ্ধার, এ-জ্ঞান জন্মেই আছে। তারপর সেই গাঁয়ে চারিদিকে ছায়ামূর্তির সঞ্চরণ চোখে দেখে এবং মর্মে অনুভব করে তাদের কি সন্দেহ থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে তারা ছায়ামূর্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে।

গাছপালার আড়ালে একটা ছনের বাড়ি। বাড়ির সামনে ভাঙা বেড়া কাত হয়েও দাঁড়িয়ে আছে। বেড়ার ওপাশ থেকে নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে হনহন করে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে জমকালো কতগুলো গাছের ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে, নয়তো কাছাকাছি এসে পড়ে থমকে দাঁড়াবে, চোখের পলকে একটা চাপা উলঙ্গিনি বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। ডোবাপুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসি কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, দিদি, মাসি, খুড়ি বলে পরস্পরকে ডেকে হাসবে, কাঁদবে, অভিশাপ দেবে অদেষ্টকে, আর কথা শেষ না করেই ফিরে যাবে এদিকে ওদিকে এ-কুঁড়ে ও-কুঁড়ের পানে বিড়বিড় করে বকতে বকতে। বিদেশির সামনে পড়ে গেলে চকিতে ঝোপের আড়ালে অন্তরাল খুঁজে নিয়ে ভীত করুণ প্রতিবাদের সুরে ছায়া বলবে, 'কে? কে গো ওখানে?'

কোনো ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোনো ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোনো ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরুসভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।

সারাটা দিন সূর্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনি করে রাখে, ছায়াগুলি বাড়ির ভিতরে বা ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কোনো কোনো ছায়া থাকে একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে, বাপ ভাই স্বামী শ্বশুরের সামনে বার হতে পারে না—স্ত্রীলোকসুলভ লজ্জায়। কোনো বাড়িতে কয়েকটি ছায়া থাকে একসঙ্গে, মা, মাসি, খুড়ি, পিসি, মেয়ে, বোন, শাশুড়ি,

বউ ইত্যাদি বিবিধ সম্পর্ক সে ছায়াগুলির মধ্যে—এক একজন তারা পালা করে বাইরে বেরোয়। কারণ, বাইরে বেরোবার মতো আবরণ একখানিই তাদের আছে।

ভোলা নন্দী কোমরের ঘুনসির সঙ্গে দু-আঙুল চওড়া পট্টি এঁটে তার পাঁচ-হাতি ধুতিখানা বাড়ির মেয়েদের দান করেছে। কাপড়খানা যে কোনো সাধারণ গতরের স্ত্রীলোকের কোমরে একপাক ঘুরে বুক ঢেকে কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে—কাঁধে সর্বক্ষণ অবশ্য ধরে রাখতে হয় হাত দিয়ে, নইলে বিপদ। ভোলার বউ ঘাটে যায়। ঘাট থেকে ঘুরে এসে ভিজে কাপড়টি খুলে দেয়। ভোলার মেজছেলে পটলের বউ পাঁচী বা ভোলার মেয়ে শিউলি কাপড়টি পরে ঘাটে যায়।

'কৎকাল এমনি কয়েদ হয়ে থাকবো মা?'

পাঁচী হু হু করে কেঁদে ওঠে।

'আর সয় না।'

ব'লে শালকাঠের মোটা খুঁটিতে মাথাটা ঠকাশ করে ঠুকে দেয়। 'আর সয় না, আর সয় না গো!' বলতে বলতে মাথা ঠুকতে থাকে খুঁটিতে খুঁটিতে, গড়াগড়ি দেয় আগের গোবর-লেপা গুঁড়ো গুঁড়ো মাটিতে, ধূলায় ধূসর হয়ে যায় তার অপুষ্ট দেহ ও পরিপুষ্ট স্তন। হায়, ধুলো মাটি ছাই কাদা মেখেও যদি আড়াল করা যেত মেয়েমানুষের লজ্জাজনক পোড়া দেহের লজ্জা!

বৈকুণ্ঠ মালিক মাঠে মাঠে ভীষণ খাটে, নিজেকে আর বউটাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে। সন্ন্যাসীবাবুর দালানের পর আমবাগান, তার এপাশে রাস্তা এবং ওপাশে ঘুপচিমারা পথের ইয়ার্কি, তার কাছে দু-বিঘে বিচ্ছিন্ন ধানজমির লাগাও বৈকুণ্ঠের মোট আড়াইখানা কুঁড়ে নিয়ে তিন পুরুষের বসত বাটি। আড়াইখানা কুঁড়ের মধ্যে ঘর বলা যায় একটাকে, তার ঝাঁপের দরজা, বাঁশের দেওয়াল, বাঁশের দুয়ার, বাঁশের খিল। ঝাঁপে থপথপ থাপড় মেরে বৈকুণ্ঠ প্রায় পিত্তি-ফাটা তেতো গলায় বলে, 'বাড়াবাড়ি করছিস ছোটবউ, বাড়াবাড়ি করছিস বড়! মোর কাছে তোর লজ্জাডা কি?'

তার বউ মানদা ভেতর থেকে বলে, 'মুখপোড়া বজ্জাত! বোনকে কাপড় দিয়ে বউয়ের সাথে মশকরা? যমের অরুচি, লক্ষ্মীছাড়া।'

সুন্দর সকাল, সুন্দর সন্ধ্যা—কচুর পাতায় শিশির-ফোঁটায় মুক্তা হীরা। সকাল থেকে সন্ধ্যাতক ঝাঁপের দু-পাশে এমনই গালাগালি চলে দুজনের মধ্যে। বাড়ির তিনদিকে মাঠ ভরে শন উঁচু হয়ে আছে আড়াই থেকে তিন হাত। ছুটে গিয়ে ডুব দিলে লজ্জাশরম সব ঢাকা পড়ে যায়—আকাশের দিকে চেয়ে প্রাণভরে কাঁদা যায় নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে। এই শনের বনের মাঝখানের পায়ে-হাঁটা পথ ধরে বেনারসি শাড়ি পরা গোকুলের বোন মালতী বিপিন সামন্তের পিছু পিছু হু-কুনের ছাউনির দিকে চলতে থাকে গর্বে ফাটতে ফাটতে, তাই তাকিয়ে দ্যাখে মানদা ঘরের বেড়ার ফোকর-জানালায় চোখ রেখে। দাসু কামারের মেয়েটা আজ ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। ও-ও তো রাতের ছায়া ছিল কাল রাত্রিতক, সারাদিন ঘরে লুকিয়ে থেকে চুপিচুপি ঘাটে আসত দুটো-চারটে বাসন আর কলসি নিয়ে। ধোপদুরস্ত সাদা থান কাপড়টা কোথা পেল ও সধবা মাগি?

শন খেতের রঙ্গমঞ্চে রঘু একটু মশকরা করে বেনারসি পরা মালতীর সঙ্গে, তা দেখে যেন যাত্রাদলের মেয়ে সাজা ছেলে সখির মতো ভড়কে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় রাণুর হাপুসকাঁদা ষোল বছরের কাঁচা মেয়ে। এদিক ওদিক চায়। হঠাৎ পিছু ফিরে হাঁটতে থাকে হনহনিয়ে, ফাঁদ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে হরিণী যেন পালাচ্ছে যেদিকে পালানো চলে। ইস্ কি সাদা ওর পরনের ধুতিটা!

'অ বিন্দু! দাঁড়া।' রঘু ডাকে।

বিন্দী দাঁড়ায়। ফাঁদছাড়া হরিণী তো নয় আসলে, মানুষের মেয়ে। দাঁড়িয়ে মুখ ফেরায়। বলে, 'কাল—কাল যাব সামন্ত মশায়। বড় ডর লাগছে আজ।'

বেনারসি পরা মালতী বলে, 'ইহিরে, খুকি মোর ডর লাগছে। দে তবে, দে কাপড় খুলে। খোল কাপড়। যাবি তো চ, নয় কাপড় খুলে দিয়ে ঘরে যা।'

বৈকুণ্ঠ বলে, 'ঝাঁপ ভাঙবো ছোটবউ।'

মানদা বলে, 'ভাঙো—মাথা ভাঙবো তোমার আমি।'

সন্ধ্যার পর মানদা ঝাঁপ খোলে। সন্ধ্যার পর সোয়ামির কাছে মেয়েমানুষের লজ্জা কি?

ভূতির ছেলে কানুর বয়স বছর বারো। ভূতির স্বামী গদাধর কাজ আর কাপড়ের খোঁজে বেরিয়েছে আজ এগারো দিন। খিদেয় কাতর হয়ে কানু ভূতির কয়েদখানার বাইরে থেকে কেঁদে বলে, 'মা, ওমা! খিদে পায় যে?'

ভূতি বলে ভেতর থেকে, 'শিকেয় হাঁড়িতে পান্তো আছে, খে-গে যা নিয়ে।'

'পাড়তে পারি না যে। তুই দে।'

ভূতি দিশেহারা হয়ে ভাবে, 'যাবো? ছেলে মাকে ন্যাংটো দেখলে কি আসে যায়? মা কালীও তো ন্যাংটো। ওমা কালী, তুই-ই বল মা, যাবো? বল মা, মোর হিদয়ে থেকে একটা কিছু বল।'

কিন্তু সেদিন হঠাৎ তাকে উলঙ্গ দেখে কানু যেমন হিহি করে হেসেছিল, আজও যদি তেমনি করে হাসে? চোখ ফেটে জল আসতে চায় ভূতির, জল পড়ে না। জল শুকিয়ে গেছে চোখের। চোখ শুকনো, জ্বালা করে আজকাল কাঁদতে চাইলে।

হঠাৎ ছেঁড়া মাদুরটা চোখে পড়ে।

'দাঁড়া একটু।'

মাদুরটা সে নিজের গায়ে জড়ায়। এক হাতে শক্ত করে ধরে থাকে গায়ে জড়ানো মাদুরটা, আর এক হাতে দুয়ার খুলে রসুই ঘরে গিয়ে শিকে থেকে নামাতে যায় পান্তার হাঁড়িটা। পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে যায় হাঁড়িটা, পান্তা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। তখন মাদুরটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে ভূতি, এঁটো ভাত আর ভাত ভেজানো এঁটো জলের মধ্যেই ধপ করে বসে দু-হাতে মুখ ঢেকে শুরু করে কান্না। আর এমনই আশ্চর্য কাণ্ড, এবার তার শুকনো চোখ থেকে জল বেরিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা মিশতে থাকে মেঝেয় ভাত ভেজানো জলে।

রাবেয়া বলে আনোয়ারকে, 'আজ শেষ। আজ যদি না কাপড় আনবে তো তোমায় আমায় খতম। পুকুরে ডুবব, খোদার কসম।'

রাবেয়া কদিন থেকেই এ ভয় দেখাচ্ছে, তবু তার বিবর্ণ মুখ, রুক্ষ চুল আর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে আনোয়ারের বুক কেঁপে যায়। চাষির ঘরের বউ দুর্ভিক্ষের দিনগুলি না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কাটিয়ে দিয়েছে, কথা বলেনি, শাকপাতা কুড়িয়ে এনে খুদকুঁড়োর সাশ্রয়

করে তাকে বাঁচিয়ে লড়াই করেছে নিজে বাঁচবার জন্য। আজ কাপড়ের জন্য সে কামনা করছে মরণ? খেতে দিতে না পারার দোষও গ্রাহ্য করেনি। পরতে দিতে না পারার দোষ ও সইতে নারাজ, দিনভর ফুঁসে ফুঁসে গঞ্জনা দিচ্ছে। বিবিকে যে পরনের কাপড় দিতে পারে না সে কেমন মরদ, তার আবার সাদি করা কেন?

অনুনয় করে আনোয়ার বলে, 'আজিজসাব্ খপর আনতে গেছেন। হাতিপুরের কাপড়ের ভাগ মিলবে আজকালের মধ্যে। একটা দিন সবুর কর আর।'

'সবুর! আর কত সবুর করব? কবরে যেয়ে সবুর করব এবার।' সেমিজ না পরলে দু-ফেরতা শাড়ি পরা রাবেয়ার অভ্যাস। এক ফেরতা কাপড় জড়িয়ে মানুষের সামনে সে বার হয়নি কোনোদিন। পায়খানার চটের পর্দাটা গায়ে জড়িয়ে নিজেকে তার বিবসনা মনে হচ্ছে। কাপড় যদি নেই, ঘোষবাবুর বাড়ির মেয়ারা এবেলা ওবেলা রঙিন শাড়ি বদলে নিয়ে পরে কী করে, আজিজ সায়েবের বাড়ির মেয়েরা চুমকি বসানো হালকা শাড়ির তলার মোটা আবরণ পায় কোথায়? সবাই পায়, পায় না শুধু তার স্বামী! আল্লা, এ কোন মরদের হাতে সে পড়েছিল!

রাত্রের ছায়ামূর্তি হয়ে রাবেয়া গিয়ে দেখে আমিনা জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে, তার গায়ে দুটো বস্তা চাপানো, চুনের বস্তা! বস্তার নীচেই আমিনার গায়ের চামড়া জ্বরে যেন পুড়ে যাচ্ছে।

আমিনা বলে ফিসফিসিয়ে, 'গা জ্বলছে—পুড়ে যাচ্ছে! আজ ঠিক মরব। এ বস্তা মুড়ে কবর দেবে মোকে।'

আবদুল আজিজ আর সুরেন ঘোষ হাতিপুরের একুশ-শ চাষি ও কামার কুমোর জেলে জোলা তাঁতি আর আড়াই-শ ভদ্র স্ত্রী-পুরুষের কাপড় জোগাবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। মাস দেড়েক আগে উলঙ্গ হাতিপুর সোজাসুজি সদরে গিয়ে মহকুমা হাকিম গোবর্ধন চাকলাদারকে লজ্জিত করেছিল। এভাবে সিধে আক্রমণের উসকানি যুগিয়েছিল শরৎ হালদারের মেজ ছেলে বঙ্কু আর তার সতেরজন সাঙ্গোপাঙ্গ। সতেরো মাইল দূরে স্বদেশসেবক তপনবাবুর কাপড়ের কল কয়লার অভাবে অচল হয়েও সাড়ে তিন-শ তাঁত কী করে সচল আছে আর খালি গুদামে কেন অনেক শ' গাঁট ধুতি শাড়ি জমে আছে, এসব তথ্য আবিষ্কার করায় বঙ্কু আর তার সাতজন সাঙ্গোপাঙ্গ মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার দায়ে হাজতে আছে সোয়ামাস। মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা তারা না করে থাকলে অবশ্য বিচারে খালাস পাবে, মিথ্যা হয়রানির জন্য ক্ষতিপূরণের পালটা নালিশও রুজু করতে পারবে আইন অনুসারে কিন্তু গুরুতর নালিশ যখন হয়েছে ওদের নামে, হাজতে ওদের থাকতে হবে। জামিন দেওয়ার অনেক বাধা। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে জামিনের কথা।

ঘোষ আর আজিজ সভা ডেকে ঘোষণা করেছে হাতিপুরের জন্য কাপড়ের 'কোটা' তারা যা আদায় করেছে, এবার কাপড়ের ভাবনা কারও ভাবতে হবে না। মনোহর শা-র প্রস্তাবে নিজেদের তারা হাতিপুরের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে। বিশ্বাস না করেও হাতিপুরের লোক ভেবেছে, দেখা যাক। আশা ছেড়ে দিয়েও হাতিপুরের নরনারী ভেবেছে, উপায় কী।

দুজনে আজ সদরে গিয়েছিল, কবে হাতিপুরে এসে পৌঁছবে হাতিপুরের জন্য নির্দিষ্ট করা

কাপড়ের ভাগ তারই খবর জানতে। গাঁয়ের লোক উন্মুখ হয়ে পথ চেয়ে আছে তাদের। ছায়ারা ঘরে ঘরে লুকিয়ে আছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও আগ্রহ ও উত্তেজনার শেষ নেই।

বিকালে ছোটোখাটো একটি জনতা জমে উঠল গ্রামের পুব প্রান্তে কাঁথি সড়কের বাস-থামা মোড়ে।

ঘোষকে একা বাস থেকে নামতে দেখে জনতা একটু ঝিমিয়ে গেল। ভিড় দেখে ঘোষও গেল একটু ভড়কে।

'কী হল ঘোষমশায়, কাপড়ের কী হল?'

'গোলমাল হয়েছে একটু।'

'গোলমাল? কিসের গোলমাল?'

'কলকাতা থেকে মাল আসেনি। ভাইসব, আমরা জীবনপাত করে—'

বঙ্কুর সাঙ্গোপাঙ্গদের একজন, সরকারদের অবিনাশ, সেসময়টা কলেরায় মরোমরো হয়ে থাকায় মারপিটের নালিশে হাজতে যেতে পারেনি। সে বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'শনিবার ক্ষেত্র সামন্তের চালান এসেছে, সাত ওয়াগন। আমি দেখেছি, পুলিশ দাঁড়িয়ে গাঁট নামিয়ে গুনে গুনে চালান দিল।'

'ও সদরের জন্যে। হাতিপুরের 'কোটা' আসেনি।

'কবে আসবে?'

'আসবে। আসবে। ছুটোছুটি করে মরছি দেখতে পাচ্ছ তো ভাই তোমাদের জন্যে?'

হতাশ ম্রিয়মাণ জনতা গাঁয়ে ফিরে যাবার উপক্রম করছে, কাপড়ের গাঁট বোঝাই প্রকাণ্ড এক লরি রাস্তা কাঁপিয়ে এসে থামবার উপক্রম করে তাদের সামনে রাস্তার সেই মোড়ে। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে আজিজ, তার পাশে সুরেন ঘোষের ভাই নরেন ঘোষ। সুরেন ঘোষ মরিয়া হয়ে পাগলের মতো হাত নেড়ে ইশারা করে, আজিজ জনতার দিকে তাকিয়ে তার ইশারা দ্যাখে, ড্রাইভারকে কী যেন বলে, থামতে থামতে আবার গর্জন করে লরিটা জোরে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অল্প দূরে পথের বাঁকের আড়ালে। লাল ধুলায় সৃষ্টি হয় মেঘারণ্য।

জনতা ঘুরে দাঁড়ায়, এক-পা দু-পা এগিয়ে এসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বাস তখনও ছাড়েনি। বাস থেকে নেমে এসেছে খাকি পোশাক-পরা সুদেব, কোমরে চামড়ার চওড়া বেল্টটা তার কী চকচকে! লাল পাপড়ি-আঁটা একজন চা আনতে যায় সুবলের দোকান থেকে—চা এবং একটা কিসের যেন চ্যাপটা শিশি আর সোডার বোতল। ঘোষের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে সুদেব ধরায়, টান মেরে ধোঁয়া ছাড়ে যেন ভেতরে কাঁচা কয়লায় আগুন ধরেছে মানুষের ভিড় দেখার উত্তেজিত রাগে।

'কিসের ভিড়?'

'কাপড় চায়।'

'হাঃ হাঃ। পরশু পচেটপুরে সার্চে গেছলাম নন্দ জানার বাড়ি। বাড়ির সামনে যেতেই হাত জোড় করে বলল কী করে ভেতরে যাবেন হুজুর, মেয়েরা সব ন্যাংটো। ওরা রসুইঘরে যাক, সারা বাড়ি তল্লাশ করুন। আমায় যেন বোকা পেয়েছে। রসুইঘরে ফেরারি ছোঁড়াটাকে সরিয়ে সারা বাড়ি সার্চ করাবে। আমি বললাম, বেশ। তারপর সোজা রসুইঘরের দরজা

ভেঙে একদম ভেতরে। আরে বাপরে বাপ, সে যেন লাখ শালিকের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেল মশায়। সব কটাই প্রায় বুড়ি, কিন্তু একটা যা ছিল মিঃ ঘোষ, কি বলব আপনাকে! পাতলা একটা উড়নি পরেছে, একদম জালের মতো, গায়ের রং দেখে তো আমি মিস্টার—'

হাতিপুরের মানুষ হাতিপুরে ফিরে যায় ধীরে ধীরে। এদিকের আশা ফুরিয়ে যাওয়ায় হতাশার চেয়ে চিন্তা সকলের বেশি। এভাবে যখন হল না তখন এবার কী করা যায়। কেউ যদি উপায় বাতলে দিত।

'জান নয় দিলাম রে আব্বাস.' আনোয়ার বলে ভুরু কুঁচকে, 'কী জন্যি জানটা দিব তা বল?'

ভোলা বলে, 'লুট করে তো আনতে পারি দু-এক জোড়া, কিন্তু তারপর?'

তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আকাশে ছোট চাঁদটি উঠেই আছে, দিন দিন একটু একটু বড় হবে। কদিন পরে জ্যোৎস্নার তেজ বাড়লে বন্দিনী ছায়াগুলির কী উপায় হবে কে জানে। চাঁদ ডুবলে তবে যদি বাড়ির বাইরে যাওয়া চলে, রোজ পিছিয়ে যেতে থাকবে শেষরাত্রির দিকে চাঁদ ডুববার সময়। বিলের ধারে বাঁধানো সড়কে নানারঙা শাড়ি পরা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাবুরা কজন হাওয়া খাচ্ছেন। কাপড় তৈরির কলেই যে হাতিপুরের লোক কাজ করে ওই তার প্রমাণ। কিন্তু আরও কত লোকেও তো কাজ করে সতেরো মাইল দূরে কাপড় তৈরির কলে, তবে কেন ও অবস্থা তাদের? সবাই ভাববার চেষ্টা করে।

হাতিপুরের ঘরে ঘরে খবর রটে যায়, কাপড় পাওয়া যাবে না।

'তবে যে ঢেঁটরা দিয়ে গেল কাপড় পাওয়া যাবে?' সকলে প্রশ্ন করল সন্ত্রস্ত হয়ে।

রসুল মিয়ার দালানের সামনের রোয়াকে এক ঘণ্টা ধরনা দিয়ে পড়ে থেকে আনোয়ার বাড়ি গেল সন্ধ্যার পরে। শাড়ি না পাক, কথা সে আদায় করেছে। বাড়তি শাড়ি ঘরে ছিল কিন্তু রসুল মিয়াও একটু ভয় পেয়ে গেছেন। অবস্থাটা একটু ভাল করে বুঝতে চান আগে। কদিন পরে তিনি একখানা শাড়ি অন্তত আনোয়ারকে দেবেন, আজ হবে না। তাই হোক, তাও মন্দের ভালো। রসুল মিয়ার কথার খেলাপ হবে না আশা করা যায়। রাবেয়াকে এই কথাটা অন্তত বলা যাবে।

রাবেয়া খানিক পরে ঘাট থেকে ফিরে আসে। অদ্ভুতরকম শান্ত মনে হয় আজ তাকে। আনোয়ার গোড়ায় তাকে দুঃসংবাদটা দেয়।

রাবেয়া বলে, 'জানি।' তারপর আনোয়ার রসুল মিয়ার কাছে দু-চারদিনের মধ্যে শাড়ি পাবার ভরসার খবরটা জানায়।

এবারও রাবেয়া বলে, 'জানি।'

দাওয়ায় এসে রাবেয়া তার কাছেই বসে। তেল নেই, দীপহীন অন্ধকার বাড়ি। অন্ধকার বলেই বুঝি পায়খানার ছেঁড়া চটের পর্দা জড়িয়ে নিজের কাছে রাবেয়া লজ্জা কম পায়। তাই বোধহয় সে শান্ত হয়ে বসে কথা বলে আনোয়ারের সঙ্গে, ফুঁসে না, শাসায় না, খোঁচায় না। মনে মনে গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আনোয়ার অনেকদিন পরে সাহস করে হাত বাড়িয়ে রাবেয়ার হাত ধরে।

রাবেয়া বলে, 'খাবে নি? চল।'

'চল।'

দাওয়ার গাঢ় অন্ধকার থেকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় উঠানের আবছা অন্ধকারে নেমে রাবেয়া একটু দাঁড়ায়। তারপর আনোয়ারকে অবাক করে গায়ে জড়ানো চটটা খুলে ছুঁড়ে দেয় উঠানের কোণে।

'ঘিন্না লাগে বড়। গা কুটকুট করছে।'

আনোয়ারের একটু ধাঁধা লাগে, একটু ভয় করে।

'ফের নেয়ে নি।'

ঘর থেকে ভরা কলসি এনে রাবেয়া মাথায় উপুড় করে ঢেলে দেয়। গায়ের ছেঁড়া কুর্তিটা খুলে চিপে নিয়ে চুল ঝেড়ে গা মোছে।

'পানি ঢেলে দিলি সব?'

'ফের আনব।'

আনোয়ারকে খাইয়ে নিজে খেয়ে সানকি আর কলসি নিয়ে রাবেয়া ঘাটে গেল, আর ফিরল না। কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলি ইঁট পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁটে বেঁধে পুকুরের জলের নীচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।

মাসিপিসি

শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাঁটা। জল নেমে গিয়ে কাদা আর ভাঙা ইটপাটকেল ও ওজনে ভারী আবর্জনা বেরিয়ে পড়েছে। কংক্রিটের পুলের কাছে খালের ধারে লাগানো সালতি থেকে খড় তোলা হচ্ছে পাড়ে। পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটো বড় সালতি বোঝাই আঁটি-বাঁধা খড় তিনজনের মাথায় চড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে ওপরের মস্ত গাদায়। ওঠানামার পথে ওরা খড় ফেলে নিয়েছে কাদায়। সালতি থেকে ওদের মাথায় খড় তুলে দিচ্ছে দুজন। একজনের বয়স হয়েছে, আধপাকা চুল, রোগা শরীর। অন্যজন মাঝবয়সি, বেঁটে, জোয়ান, মাথায় ঠাসা কদম-ছাঁটা রুক্ষ চুল।

পুলের তলা দিয়ে ভাঁটার টান ঠেলে এগিয়ে এলো সরু লম্বা আরেকটা সালতি, দুহাত চওড়া হয় কি না হয়। দু-মাথায় দাঁড়িয়ে দু-জন প্রৌঢ়া বিধবা লগি ঠেলছে, ময়লা মোটা থানের আঁচল দু-জনেরই কোমরে বাঁধা। মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সি একটি বউ। গায়ে জামা আছে, নকশা-পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি। আঁটোসাঁটো থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ।

মাসিপিসি ফিরছে কৈলেশ, বুড়ো লোকটি বলল।

কৈলাশ বাহকের মাথায় খড় চাপাতে ব্যস্ত ছিল। চটপট শেষ আঁটিটা চাপিয়ে দিয়ে সে যখন ফিরল, মাসিপিসির সালতি ক-হাতের মধ্যে এসে গেছে।

ও মাসি, ওগো পিসি, রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।

সামনের দিকে লগি পুঁতে মাসিপিসি সালতির গতি ঠেকায়। আহ্লাদী সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটাটা টেনে দেয়। সামনে থেকে মাসি বলে বিরক্তির সঙ্গে, বেলা আর নেই কৈলেশ। পিছন থেকে পিসি বলে, অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলেশ।

মাসিপিসির গলা ঝরঝরে, আওয়াজ একটু মোটা, একটু ঝংকার আছে। কৈলাশের খপরটা গোপন, দুজনে লম্বা লম্বা সালতির দু-মাথায় থাকলে সম্ভব নয় চুপে চুপে। মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশটা চেপে ধরে থাকে, পিসি লগি হাতে নিয়েই পিছন থেকে এগিয়ে আসে সামনের দিকে। আহ্লাদী যেখানে ছিল সেখানে বসেই কান পেতে রাখে। কথাবার্তা সে সব শুনতে পায় সহজেই। কারণ, সে যাতে শুনতে পায় এমনি করেই বলে কৈলাশ।

বলি মাসি, তোমাকেও বলি পিসি, কৈলাশ শুরু করে, মেয়াকে একদম শ্বশুরঘর পাঠাবে না মনে করেছ যদি, সে কেমন ধারা কথা হয়? এত বড়ো সোমত্ত মেয়া, তোমরা দুটি মেয়েলোক বাদে ঘরে একটা পুরুষমানুষ নেই, বিপদ-আপদ ঘটে যদি তো––

মাসি বলে, খুনসুটি রাখো দিকি কৈলেশ তোমার, মোদ্দা কথাটা কি তাই কও, বললে না যে খপর আছে কি?

পিসি বলে, খপরটা কি তাই কও। বেলা বেশি নেই কৈলেশ।

মাসিপিসির সাথে পারা যাবে না জানে কৈলাশ। অগত্যা ফেনিয়ে রসিয়ে বলবার বদলে সে সোজা কথায় আসে, জগুর সাথে দেখা হল কাল! খড় তুলে দিতে সাঁঝ হয়ে গেল, তা দোকানে এট্টু—মানে আর কি চা খেতে গেছি চায়ের দোকানে, জগুর সাথে দেখা।

মাসি বলে, চায়ের দোকান না কিসের দোকান তা বুঝিছি কৈলেশ, তা কথাটা কি?

পিসি বলে, শুঁড়িখানায় পড়ে থাকে বারোমাস, সেথা ছাড়া আর ওকে কোথা দেখবে। হাতে দুটো পয়সা এলে তোমারও স্বভাব বিগড়ে যায় কৈলেশ। তা, কি বললে জগু?

কৈলাশ ফাঁপরে পড়ে আড়চোখে চায় আহ্লাদীর দিকে, হঠাৎ বেমক্কা জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে যে তা নয়, পুলের কাছেই চায়ের দোকান, মাসিপিসি গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক না সেখানে। তারপরেই জোর হারিয়ে বলে, মাল খাওয়া একরকম ছেড়ে দিয়েছে জগু। লোকটা কেমন বদলে গেছে মাসি, সত্যি কথা পিসি, জগু আর সে জগু নেই। বউকে নিতে চায় এখন। তোমরা নাকি পণ করেছ মেয়া পাঠাবে না, তাতেই চটে আছে। সম্মান তো আছে একটা মানুষের, কবার নিতে এলো তা মেয়া দিলে না, তাইতে নিতে আসে না আর। আমি বলি কী, নিজেরা যেচে এবার পাঠিয়ে দাও মেয়াকে।

মাসি বলে, পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা খেতে? কলকে-পোড়া ছ্যাঁকা খেতে? খুঁটির সাথে দড়ি বাঁধা হয়ে থাকতে দিনভোর রাতভোর?

পিসি বলে, লাথির চোটে ফের গভ্‌ভোপাত হতে? না মরতে?

গভ্‌ভোপাত? কৈলাশ বলে আশ্চর্য হয়ে, ফের গভ্‌ভোপাত? সত্যি নাকি মাসি? এ যে প্যাঁচালো ব্যাপার হলো পিসি?

মাসি বলে, কিসের প্যাঁচালো ব্যাপার কৈলেশ? মুয়ে নুড়ো জ্বালব তোমার ফের যদি বলবে তুমি বেয়াক্কেলে কথা। জগু আসেনি ঘনঘন ওকে নিতে? থাকেনি দুদিন চারদিন করে?

পিসি বলে, মেয়া না পাঠাই, জামাই এলে রাখিনি জামাই আদরে তাকে? ছাগলটা বেচে দিয়ে খাওয়াইনি ভালমন্দ দশটা জিনিস?

মাসি বলে, ফের আসুক, আদরে রাখব যদ্দিন থাকে। বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো। ঘরে এলে খাতির না করব কেন? তবে মেয়া মোরা পাঠাব না।

পিসি বলে, না কৈলেশ, মরতে মোরা মেয়াকে পাঠাব না।

বুড়ো রহমান একা খড় চাপিয়ে যায় বাহকদের মাথায়, চুপচাপ শুনে যায় এদের কথা। ছলছল চোখে এক একবার তাকায় আহ্লাদীর দিকে। তার মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মরেছে অল্পদিন আগে। কিছুতে যেতে চায়নি মেয়েটা, দাপাদাপি করে কেঁদেছে যাওয়া ঠেকাতে, ছোট অবুঝ মেয়ে। তার ভালোর জন্যেই তাকে জোর-জবরদস্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল রহমান। আহ্লাদীর সঙ্গে তার চেহারায় কোন মিল নেই। বয়সে সে ছিল অনেক ছোট, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা। তবু আহ্লাদীর ফ্যাকাশে মুখে তারই মুখের ছাপ রহমান দেখতে পায়, খড়ের আঁটি তুলে দেবার ফাঁকে ফাঁকে যখনই সে তাকায় আহ্লাদীর দিকে।

কৈলাশ বলে, তবে আসল কথাটা বলি। জগু মোকে বললে, এবার সে মামলা করবে বউ নেয়ার জন্যে। তার বিয়ে করা বউকে তোমরা আটকে রেখেছ বদ মতলবে, পয়সা কামাচ্ছো। মামলা করলে বিপদে পড়বে। সোয়ামি নিতে চাইলে বউকে আটকে রাখার আইন নেই। জেল হয়ে যাবে তোমাদের। আর যেমন বুঝলাম, মামলা জগু করবেই আজকালের মধ্যে। মরবে তোমরা জানো মাসি, জানো পিসি, মারা পড়বে তোমরা একেবারে।

আহ্লাদী একটা শব্দ করে অস্ফুট আর্তনাদের মতো। মাসি ও পিসি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কয়েকবার। মনে হয়, মনে তাদের একই কথা উদয় হয়েছে, চোখে চোখে চেয়ে সেটা শুধু জানাজানি করে নিল তারা।

মাসি বলল, জেলে নয় গেলাম কৈলেশ, কিন্তু মেয়া যদি সোয়ামির কাছে না যেতে চায় খুন হবার ভয়ে?

ব'লে মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশ ছেড়ে দিয়ে লগি গুঁজে দেয় কাদায়, পিসি তরতর করে পিছনে গিয়ে লগি কাদায় গুঁজে হেলে পড়ে, শরীরের ভারে সরু লম্বা সালতিটাকে এগিয়ে দেয় ভাঁটার টানের বিপক্ষে। বেলা একরকম নেই। ছায়া নামছে চারিদিকে।

শকুনরা উড়ে এসে বসছে পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়। একটা শকুন উড়ে গেল এ আশ্রয় ছেড়ে অল্প দূরে আরেকটা গাছের দিকে, ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কী তার পাখা ঝাপটানি।

মায়ের বোন মাসি আর বাপের বোন পিসি ছাড়া বাপের ঘরের কেউ নেই আহ্লাদীর। দুর্ভিক্ষ কোনোমতে ঠেকিয়েছিল তার বাপ। মহামারির একটা রোগে, কলেরায়, সে, তার বউ আর ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। মাসিপিসি তার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছে অনেকদিন, দুরছাই সয়ে আর কুড়িয়ে-পেতে খেয়ে নিরাশ্রয় বিধবারা যেমন থাকে। নিজেদের ভরণ-পোষণের কিছুটা তারা রোজগার করতো ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বেচে, হোগলা গেঁথে, শাকপাতা ফলমূল ডাঁটা কুড়িয়ে, এটা-ওটা জোগাড় করে। শাকপাতা খুদকুঁড়ো ভোজন, বছরে দুজোড়া থান পরন—খরচ তো এই। বছরেব পর বছর ধরে কিছু পুঁজি পর্যন্ত হয়েছিল দুজনের, রূপোর টাকা আধুলি সিকি। দুর্ভিক্ষের সময়টা বাঁচবার জন্য তাদের লড়তে হয়েছে সাংঘাতিকভাবে, আহ্লাদীর বাপ তাদের থাকাটা শুধু বরাদ্দ রেখে খাওয়া ছাঁটাই করে দিয়েছিল একেবারে পুরোপুরি। তারও তখন বিষম অবস্থা। নিজেরা বাঁচে কি বাঁচে না, তার ওপর জগুর লাথির চোটে গর্ভপাতে মরোমরো মেয়ে এসে হাজির। সে কোনদিক সামলাবে? মাসিপিসির সেবাযত্নেই আহ্লাদী অবশ্য সেবার বেঁচে গিয়েছিল, তার বাপ-মাও সেটা স্বীকার করেছে। কিন্তু কি করবে, গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শোধ করা যদি বা সম্ভব, অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে। পাল্লা দিয়ে মাসিপিসি আহ্লাদীর জীবনের জন্যে লড়েছিল, পেল যদি তো খেয়ে, না পেল যদি তো না খেয়েই।

অবস্থা যখন তাদের অতি কাহিল, চারিদিকে না খেয়ে মরা শুরু করেছে মানুষ, মরণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি, একদিন মাসি বলে পিসিকে, একটা কাজ করবি বেয়াইন? তাতে তোরও দুটো পয়সা আসে, মোরও দুটো পয়সা আসে।

শহরের বাজারে তরিতরকারি ফলমূলের দাম চড়া। গাঁ থেকে কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া-আসাও একার দ্বারা হবে না তার। পিসি রাজি হয়েছিল; এতে কিছু হবে কি না হবে ভগবান জানে, কিন্তু যদি হয় তবে রোজগারের একটা নতুন উপায় মাসি পেয়ে

যাবে আর সে পাবে না, তাকে না পেলে অন্য কারও সাথে হয়তো মাসি বন্দোবস্ত করবে, তা কি পারে পিসি ঘটতে দিতে।

সেই থেকে শুরু হয় গেরস্থের বাড়তি শাকসবজি ফলমূল নিয়ে মাসিপিসির সালতি বেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে বেচে আসা। গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্য বাগানের জিনিস বেচতে দেয়।

মাসিপিসির ভাব ছিল আগেও। অবস্থা এক, বয়স সমান, একঘরে বাস, পরস্পরের কাছে ছাড়া সুখদুঃখের কথা তারা কাকেই বা বলবে, কেইবা শুনবে। তবে হিংসা দ্বেষ রেষারেষিও ছিল যথেষ্ট, কোন্দলও বেধে যেত কারণে অকারণে। পিসি এ বাড়ির মেয়ে, এ তার বাপের বাড়ি। মাসি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। তাই মাসির ওপর পিসির একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব ছিল। এই নিয়ে পিসির অহংকার আর খোঁচাই সবচেয়ে অসহ্য লাগত মাসির। ধীর শান্ত দুঃখী মানুষ মনে হতো এমনি তাদের, কিন্তু ঝগড়া বাধলে অবাক হয়ে যেতে হতো তাদের দেখে। সে কি রাগ, সে কি তেজ, সে কি গোঁ! মনে হতো এই বুঝি কামড়ে দেয় একে অপরকে, এই বুঝি কাটে বঁটি দিয়ে।

শাকসবজি বেচে বাঁচবার চেষ্টায় একসঙ্গে কোমর বেঁধে নেমে পড়ামাত্র সব বিরোধ সব পার্থক্য উপে গিয়ে দুজনের হয়ে গেল একমন, একপ্রাণ। সে মিল জমজমাট হয়ে উঠল আহ্লাদীর ভার ঘাড়ে পড়ায়। নিজের নিজের পেট ভরানো শুধু নয়, নিজেদের বেঁচে থাকা শুধু নয়, তাদের দুজনেরই এখন আহ্লাদী আছে। খাইয়ে পরিয়ে যত্নে রাখতে হবে তাকে, শ্বশুরঘরের কবল থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, গাঁয়ের বজ্জাতদেব নজর থেকে সামলে রাখতে হবে, কত দায়িত্ব তাদের, কত কাজ, কত ভাবনা।

বাপ-মা বেঁচে থাকলে আহ্লাদীকে হয়তো শ্বশুরবাড়ি যেতে হতো, মাসিপিসিও বিশেষ কিছু বলতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু তারা তো নেই, এখন মাসিপিসিরই সব দায়িত্ব। বিনা পরামর্শে আপনা থেকেই তাদের ঠিক হয়ে ছিল, আহ্লাদীকে পাঠানো হবে না। আহ্লাদীকে কোথাও পাঠানোর কথা তারা ভাবতেও পারে না। বিশেষ করে ওই খুনেদের কাছে কখনও মেয়ে তারা পাঠাতে পারে, যাবার কথা ভাবলেই মেয়ে যখন আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে যায়?

বাপেব ঘরদুয়ার জমিজমাটুকু আহ্লাদীতে বর্তেছে, জগুর বউ নেবার আগ্রহও খুবই স্পষ্ট। সামান্যই ছিল তার বাপের, তারও সিকিমতো আছে মোটে, বাকি গেছে গোকুলের কবলে। তবু মুফতে যা পাওয়া যায় তাতেই জগুর প্রবল লোভ।

খালি ঘরে আহ্লাদীকে রেখে কোথাও যাবার সাহস তাদের হয় না। দুজনে মিলে যদি যেতে হয় কোথাও আহ্লাদীকে তারা সঙ্গে নিয়ে যায়।

মাসি বলে, ডরাসনি আহ্লাদী। ভাঁওতা দিয়ে আমাদের দমাবার ফিকির সব। নয়তো কৈলেশকে দিয়ে ওসব কথা বলায় মোদের?

পিসি বলে, দুদিন বাদে ফের আসবে দেখিস জামাই। তখন শুধোলে বলবে, কই না, আমি তো ওসব কিছু বলিনি কৈলেশকে!

মাসি বলে, চারমাসে পড়লি, আর কটা দিন বা! মা-মাসির কাছেই রইতে হয় এ সময়টা, জামাই এলে বুঝিয়ে বলব।

পিসি বলে, ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়, জানিস আহ্লাদী। তোর পিসে ছিল জগুর মতো, মাল টানত আর মোকে মারত। খোকাটা কোলে আসতে কী হয়ে গেল সেই মানুষ। চুপিচুপি এনে এটা ওটা খাওয়ায়, উঠতে বলি তো ওঠে, বসতে বলি তো বসে, রাতদুপুরে চুর হয়ে এসে হাতে-পায়ে ধরে বলে, একবারটি খোকাকে কোলে দে পদী—খোকা যেতে, পাগলের মতো দিবারাত্রির মাল খেয়ে খেয়ে নিজেও গেলো।

মাসি বলে, তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ি ননদ ছিল বাঘ। উঠতে বসতে কি ছ্যাঁচা খেয়েছি ভাবলে বুক কাঁপে। কিন্তু জানিস আহ্লাদী, মেয়েটা যেই কোলে এলো শাউড়ি ননদ যেন মোকে মাথায় করে রাখলে বাঁচে।

পিসি বলে, তুইও যাবি, সোয়ামির ঘব করবি। ডরাসনি, ডর কিসের?

বাড়ি ফিরে দীপ জ্বেলে মাসিপিসি রান্নাবান্না সারতে লেগে যায়। বাইরে দিন কাটলেও আহ্লাদীর পরিশ্রম কিছু হয়নি, শুয়ে বসেই দিন কেটেছে। তবু মাসিপিসির কথায় সে একটু শোয়। শরীর নয়, মনটা তার কেমন করছে। নিজেকে তার ছ্যাঁচড়া, নোংরা নর্দমার মতো লাগে। মাসিপিসির আড়ালে থেকেও সে টের পায় কীভাবে মানুষের পর মানুষ তাকাচ্ছে তার দিকে, কতজন কতভাবে মাসিপিসির সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে তরিতরকারির মতো তাকেও কেনা যায় কিনা যাচাই করার জন্য। গাঁয়েরও কতজন তার কতরকমের দর দিয়েছে মাসিপিসির কাছে। মাসিপিসিকে চিনে তারা অনেকটা চুপচাপ হয়ে গেছে আজকাল, কিন্তু গোকুল হাল ছাড়েনি। মাসিপিসিকে পাগল করে তুলেছে গোকুল। মায়ের বাড়া তার এই মাসিপিসি, কী দুর্ভোগ তাদের তার জন্য। মাসিপিসিকে এত যন্ত্রণা দেওয়ার চেয়ে সে নয় শ্বশুরঘরের লাঞ্ছনা সইত, জগুর লাথি খেত। ঈষৎ তন্দ্রার ঘোরে শিউরে ওঠে আহ্লাদী। একপাশে মাসি আর একপাশে পিসিকে না নিয়ে শুলে কি চলবে তার কোনোদিন?

রান্না সেরে খাওয়ার আয়োজন করছে মাসিপিসি, একেবারে ভাতটাত বেড়ে আহ্লাদীকে ডাকবে। ভাগাভাগি কাজ তাদের এমন সড়োগড়ো হয়ে গেছে যে বলাবলির দরকার তাদের হয় না, দুজনে মিলে কাজ করে যেন একজনে করছে। এবার ব্যঞ্জনে নুন দেবে একথা বলতে হয় না পিসিকে, ঠিক সময়ে নুনের পাত্র সে এগিয়ে দেয় মাসির কাছে। বলাবলি করছে তারা আহ্লাদীর কথা, আহ্লাদীর সুখদুঃখ, আহ্লাদীর সমস্যা, আহ্লাদীর ভবিষ্যৎ। জামাই যদি আসে, একটি কড়া কথা তাকে বলা হবে না, এতটুকু খোঁচা দেওয়া হবে না। উপদেশ দিতে গেলে চটবে জামাই, পুরুষমানুষ তো যতই হোক, এটা করা তার উচিত ওটা করা তার উচিত নয়, এসব কিছু বলা হবে না তাকে। জামাই এসেছে তাই আনন্দ রাখবার যেন ঠাঁই নেই এইভাব দেখাবে মাসিপিসি—আহ্লাদীকে শিখিয়ে দিতে হবে সোয়ামি এসেছে বলে সেও যেন আহ্লাদে গদগদ হবার ভাব দেখায়। যে কদিন থাকে জামাই সে যেন অনুভব করে, সে-ই এখানকার কর্তা, সে-ই সর্বেসর্বা।

বাইরে থেকে হাঁক আসে কানাই চৌকিদারের। মাসিপিসি পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, জোরে নিশ্বাস পড়ে দুজনের। সারাটা দিন গেছে লড়ে আর লড়ে। সরকারবাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে দুজনের। এখন

এলো চৌকিদার কানাই! হাঙ্গামা না করতে ও আসে না রাত্রে, গাঁয়ে লোক যখন ঘুমোচ্ছে।

রসুই-চালায় ঝাঁপ এঁটে মাসিপিসি বাইরে যায়। শুক্লপক্ষের একাদশীর উপোস করেছে তারা দুজনে গতকাল। আজ দ্বাদশী, জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। কানাইয়ের সাথে গোকুলের যে তিনজন পেয়াদা এসেছে তাদের মাসিপিসি চিনতে পারে, মাথায় লালপাগড়ি-আঁটা লোকটা তাদের অচেনা।

কানাই বলে, কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার।

মাসি বলে, এত রাতে?

পিসি বলে, মরণ নেই?

কানাই বলে. দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর সাথে। যেতে একবার হবে গো দিদিঠাকরুনরা! বেঁধে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।

মাসিপিসি মুখে মুখে তাকায়। পথের পাশে ডোবার ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তিন-চারজন ঘুপটি মেরে আছে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে মাসিপিসি। ওরা যে গাঁয়ের গুণ্ডা সাধু বৈদ্য ওসমানেরা তাতে সন্দেহ নেই, বৈদ্যের ফেটিবাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটায় পাতার ফাঁকের জ্যোৎস্না পড়ছে। তারা যাবে কাছারিতে কানাই আর পেয়াদা কনস্টেবলের সঙ্গে। ওরা এসে আহ্লাদীকে নিয়ে যাবে।

মাসি বলে, মোদের একজন গেলে হবে না কানাই?

পিসি বলে, আমি যাই চল।

কর্তা ডেকেছেন দুজনকে।

মাসিপিসি দুজনেই আবার তাকায় মুখে মুখে।

মাসি বলে, কাপড়টা ছেড়ে আসি কানাই।

পিসি বলে, সকড়ি হাত ধুয়ে আসি, একদণ্ড লাগবে না।

তাড়াতাড়িই ফিরে আসে তারা। মাসি নিয়ে আসে বঁটিটা হাতে করে, পিসির হাতে দেখা যায় রামদা-র মতো মস্ত একটা কাটারি।

মাসি বলে, কানাই, কত্তাকে বোলো, মেয়েনোকের এতরাতে কাছারিবাড়ি যেতে নজ্জা করে। কাল সকালে যাব।

পিসি বলে. এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়ি ডাকতে কত্তার নজ্জা করে না কানাই?

কানাই ফুঁসে ওঠে, না যদি যাও ঠাকরুনরা ভালোয় ভালোয়, ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।

মাসি বঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, বটে? ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে? এসো। কে এগিয়ে আসবে এসো। বঁটির এক কোপে গলা ফাঁক করে দেব।

পিসি বলে, আয় না বজ্জাত হারামজাদারা, এগিয়ে আয় না? কাটারির কোপে গলা কাটি দু-একটার।

দু-পা এগোয় তারা দ্বিধাভরে। মাসিপিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে সত্যিই তারা খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছে। মারাত্মক ভঙ্গিতে বঁটি আর দা উঁচু হয় মাসিপিসির।

মাসি বলে, শোন কানাই, এ কিন্তু এর্কি নয় মোটে। তোমাদের সাথে মোরা মেয়েলোক পারব না জানি, কিন্তু দুটো-একটাকে মারব জখম করব ঠিক।

পিসি বলে, মোরা নয় মরব।

তারপর বিনা পরামর্শেই মাসিপিসি হঠাৎ গলা ছেড়ে দেয়। প্রথমে শুরু করে মাসি, তারপর যোগ দেয় পিসি। আশেপাশে যত বাসিন্দা আছে সকলের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে তারা হাঁক দেয়, ও বাবাঠাকুর! ও ঘোষমশায়! ও জনার্দ্দন! ওগো কানুর মা, বিপিন, বংশী...

কানাই অদৃশ্য হয়ে যায় দলবল নিয়ে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় পাড়ায়, অনেকে ছুটে আসে, কেউ কেউ ব্যাপার অনুমান করে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয় বাইরে না বেরিয়ে।

এই হট্টগোলের পর আরও নিঝুম আরও থমথমে মনে হয় রাত্রিটা। আহ্লাদীকে মাঝখানে নিয়ে শুয়ে ঘুম আসে না মাসিপিসির চোখে। বিপদে পড়ে হাঁক দিলে পাড়ার এতলোক ছুটে আসে, এমনভাবে প্রাণ খুলে এতখানি জ্বালার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে গোকুল আর দারোগা ব্যাটার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে সাহস পায়, জানা ছিল না মাসিপিসির। তারা হাঁকডাক শুরু করেছিল খানিকটা কানাইদের ভড়কে দেবার জন্যে, এতলোক এসে পড়বে আশা করেনি। তাদের জন্য যতটা নয়, গোকুল আর দারোগার ওপর রাগের জ্বালাই যেন ওদের ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে মনে হল সকলের কথাবার্তা শুনে। কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে মাসিপিসি। বুকে নতুন জোর পায়।

মাসি বলে, জানো বেয়ান, ওরা ফের ঘুরে আসবে মন বলছে। এত সহজে ছাড়বে কি?

পিসি বলে, তাই ভাবছিলাম। মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে ফেলায় সোনাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়েছিল সেবার।

খানিক চুপচাপ ভাবে দুজন।

মাসি বলে, সজাগ রইতে হবে রাতটা।

পিসি বলে, তাই ভালো। কাঁথা কম্বলটা চুপিযে বাখি জলে, কী জানি কী হয়!

আস্তে আস্তে চুপিচুপি তারা কথা কয়, আহ্লাদীর ঘুম না ভাঙে। অতি সন্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে। আহ্লাদীর বাপের আমলের গরুটা নেই, মাটির গামলাটা আছে। ঘড়া থেকে জল ঢেলে মোটা কাঁথা আর পুরানো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে, চালায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় চাপা দিয়ে নেভানো সহজ হয়। ঘড়ায় আর হাঁড়িকলসিতে আরও জল এনে রাখে তারা ডোবা থেকে। বঁটি আর দা রাখে হাতের কাছেই। যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসিপিসি।

যাকে ঘুস দিতে হয়

মোটর চলে, আস্তে। ড্রাইভার ঘনশ্যাম মনে মনে বিরক্ত হয়, স্পিড দেবার জন্য অভ্যাস নিশপিশ করে ওঠে প্রত্যঙ্গে, কিন্তু উপায় নেই। বাবুর আস্তে চালাবার হুকুম। কাজে যাবার সময় গাড়ি জোরে চললে তার কোন আপত্তি হয় না, কিন্তু সস্ত্রীক হাওয়া খেতে বার হলে তারা দুজনেই কলকাতার পথে মোটর চড়ে—নিজেদের দামি মোটর চড়ে বেড়াবার অকথা আনন্দ রয়ে-সয়ে চেটেপুটে উপভোগ করতে ভালোবাসে।

এত বড়ো, এত দামি, এমন চকচকে মোটর গড়িয়ে চলেছে শহরের পিচঢালা পথে, শুধু এই সত্যটাই যেন একটানা শিহরণ হয়ে থাকে সুশীলার। তারপর আছে পুরোনো, সস্তা, বাজে মোটরগাড়ির চলা দেখে মুখ বাঁকানোর সুখ। আর আছে বোঝাই ট্রামবাসের দিকে তাকিয়ে তিন বছর আগেকার কল্পনাতীত স্বপ্নজগতে বাস্তব, প্রত্যক্ষ বিচরণের অনুভূতি। ট্রামের হাতল ধরে আর বাসের পিছনে মানুষকে ঝুলতে দেখে সুশীলার মায়া হয়, এক অদ্ভুত মায়া! যাতে গর্ব বেশি। তিন বছর আগে মাখনকেও তো এমনিভাবে ঝুলতে ঝুলতে কাজে যেতে হতো। স্বামীর অতীত সাধারণত্বের দুর্দশা আজ বড়ো বেশি মনে হওয়ায় ট্রামবাসের বাদুড়ঝোলা মানুষদের প্রতি উত্তপ্ত দরদ জাগে সুশীলার! মাখন সিগারেট ধরিয়ে এপাশে ধোঁয়া ছেড়ে ওপাশে সুশীলার দিকে আড়চোখে চেয়ে প্রায় সবিনয় নিবেদনের সুরে বলে, 'কে ভেবেছিল আমরা একদিন মোটর হাঁকাব?'

সুশীলা বিবেচনা করে জবাব দেয়। সে মধ্যবিত্ত ভালোঘরের মেয়ে, পরীক্ষায় ভালো পাস-করা গরিবের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হল। ওমা, এত ভালো ছেলের চাকরি কিনা একশো টাকার! কত অবজ্ঞা, অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা স্বামীকে দিয়েছে সুশীলার মনে পড়ে। চালাকও হয়েছে সে আজকাল একটু। ভেবেচিন্তে তাই সে বলে, 'আমি জানতাম।'

মাখনের মনে পড়ে সুশীলার আগের ব্যবহার। একটু খাপছাড়া সুরে সে জিজ্ঞাসা করে, 'জানতে?'

'জানতাম বইকি! বড়ো হবার, টাকা রোজগার করবার ক্ষমতা তোমার ছিল আমি জানতাম। তাই না অত খোঁচাতাম তোমাকে! টের পেয়েছিলাম, নিজেকে তুমি জানো না। তাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমায় মরিয়া করে জিদ্ জাগালাম—'

'সত্যি! তোমার জন্যে ছাড়া এত টাকা—ড্রাইভার, আস্তে চালাও।'

সুশীলা তখন বলে, 'কিন্তু যাই বলো, দাসসাহেব না থাকলে তোমার কিছুই হত না।'

মাখন হাসে, বলে, 'তা ঠিক, কিন্তু আমি না থাকলেও আর দাসসাহেব ফাঁপতো না। কি ঘুসটাই দিয়েছি শালাকে!'

'কত কনট্রাক্ট দিয়েছে তোমাকে!'

'এমনি দিয়েছে? অত ঘুস কে দিত?'

গাড়ি চলছে। আস্তে আস্তে গড়িয়ে চলছে। আর একখানা গাড়ি, দামি কিন্তু পুরোনো, পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে খানিক এগিয়ে স্পিড কমিয়ে প্রায় থেমে গেল। মাখনের গাড়ি কাছে গেলে পাশাপাশি চলতে লাগল দাসসাহেবের গাড়িটা।

'কোথায় চলেছেন?'

'একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।'

দাসসাহেবের দৃষ্টি তার মুখে বুকে কোমরে চলাফেরা করছে টের পায় সুশীলা। অন্দর থেকে উঁকি দিয়ে বৈঠকখানায় দাসসাহেবকে সে অনেকবার দেখেছে। লজ্জায় তার সর্বাঙ্গ কুঁচকে যায়। এই মহাপুরুষটি তার স্বামীকে ট্রামে ঝোলার অবস্থা থেকে এই দামি মোটরে চড়ার অবস্থায় এনেছেন। শ্বশুর ভাশুর ইত্যাদি গুরুজনের চেয়েও ইনি গুরুজন। ইনি দেবতার সামিল।

'আপনার স্ত্রী?'

'আজ্ঞে।'

দাসসাহেবের প্রশ্নের মানে মাখন বোঝে। তার মতো হঠাৎ লাখপতি কয়েকজনকে সে জানে, যারা মোটর হাঁকায় শুধু বাজারের স্ত্রীলোক নিয়ে—বাড়ির স্ত্রী বাড়িতেই থাকে।

সুশীলা ভাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি। যেরকম উনি বুড়িয়ে গেছেন অল্পদিনে! ওঁর কাছে আমাকে নেহাত কচিই দেখায়। দুটি গাড়িই ততক্ষণে থেমেছে। পিছনে অন্য গাড়ির হর্ন শুরু করেছে অভদ্র আওয়াজ।

দাসসাহেব নেমে এ গাড়িতে এসে ওঠে। ড্রাইভারকে বলে দেওয়া হয় এ গাড়ির পিছনে আসতে। দাসসাহেব ভেতরে ঢোকামাত্র মাখন আর সুশীলা টের পায় এই বিকেল বেলাই সে মদ খেয়েছে।

'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে তো পরিচয় করিয়ে দেননি?'

'এই যে দিচ্ছি। শুনছো, ইনি আমাদের মিঃ দাস।'

পরনের বেনারসির রংয়ের মতো সুশীলা সলজ্জ ভঙ্গিতে একটু হাসে, নববধূর মতো! বউয়ের মতোই যে তাকে দেখাচ্ছে সুশীলার তাতে সন্দেহ ছিল না। দাসসাহেব আলাপী লোক, অল্প সময়ে আলাপ জমিয়ে ফেলে। যে চাপা ক্ষোভ শুরু হয়েছিল মাখনের মনে, অল্পে অল্পে তলে তলে তা বাড়তে থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে একজন যখন কোথাও যাচ্ছে, বিনা আহ্বানে কেউ এভাবে গাড়ি চড়াও হয়ে তাদের ঘাড়ে চাপে না—অন্তত যাদের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা বজায় রাখবার কিছুমাত্র প্রয়োজনও মানুষটা যদি বোধ করে। বারবার এই কথাটাই মাখনের মনে হতে থাকে যে অন্য কেউ হলে তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার কথা দাস ভাবতে পারত না।

দাস বলে, 'চা খেয়েছেন?'

সুশীলা বলে, 'না।'

'আসুন না আমার ওখানে, চা-টা খাওয়া যাবে।'

মাখনের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাস যোগ দেয়, 'সেই কনট্রাক্টের কথাটাও আপনার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। আপনাকে খুঁজছিলাম।'

মাখনের দু-চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। সুশীলার নিশ্বাস আটকে যায়। আজ কদিন ধরে মাখন এই কনট্রাক্টটা বাগাবার চেষ্টা করছিল—প্রকাণ্ড কনট্রাক্ট, লাখ টাকার ওপর ঘরে আসবে! দাস যেন কেমন আমল দিচ্ছিল না তাকে, কথা তুললে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল। ঈশ্বরীপ্রসাদকে ঘনঘন আসা-যাওয়া করতে দেখে আর তার সঙ্গে দাসের দহরম-মহরম

দেখে ব্যাপার অনেকটা অনুমান করে নিয়ে আশা একরকম মাখন ছেড়ে দিয়েছিল। দাস আজ ও-বিষয়েই তার সঙ্গে কথা কইতে চায়! এই দরকারে তাকে দাস খুঁজছিল!

সম্ভ্রান্ত শহরতলিতে দাসের মস্ত বাড়ি। সামনে সম্ভ্রান্ত বাগান। অনেকগুলি চাকর খানসামা নিয়ে এত বড়ো বাড়িতে দাস একা থাকে। বিয়ে করেনি, বউ নেই। আত্মীয়স্বজনদের সে সাহায্য করে কিন্তু কাছে রাখে না। শখ হলে মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গ উপভোগ করে দু-চারদিনের জন্য, ছুটি ভোগ করার মতো।

যে-ই আসুক সাহেব বাড়ি নেই বলে দরজা থেকে বিদায় করে দেবার হুকুম জারি করে দাস তাদের ভেতরে নিয়ে বসায়। ঘরের সাজসজ্জা আর আসবাবপত্র তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখে সুশীলা, নিজেদের বাড়িতে এখানকার কোন্ বিশেষত্ব আমদানি করবে মনে মনে স্থির করে। তারপর আসে চা। একথা সেকথা হতে হতে আসে কনট্রাক্টের কথা। সুশীলার সামনেই আলোচনা চলতে থাকে, গভীর আগ্রহের সঙ্গে সে সব কথা শোনবার ও বোঝবার চেষ্টা করে, উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে টিপটিপ করে। মাখনের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হবার পর সুশীলার দিকে দাসের বিশেষ মনোযোগ দেখা যায় না, কথাতেই তাকে মশগুল মনে হয়। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ঘরে আলো জ্বলে স্নিগ্ধ।

তারপর দাস বলে, 'হাওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলা দরকার। বসুন, ফোন করে আসছি।' ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে সুশীলার দিকে চেয়ে হেসে বলে, 'খালি কাজের কথা বলছি, রাগ করবেন না।'

সুশীলা তাড়াতাড়ি বলে, 'না, না।'

দাস চলে গেলে চাপা গলায় সুশীলা বলে, 'সোয়া লক্ষের মতো হবে!'

'বেশিও হতে পারে।'

'ফেরবার পথে কালীঘাটে পুজো দিয়ে বাড়ি যাব।' গলা বুজে আসে সুশীলার।

খানিক পরে ফিরে আসে দাস।

'মাখনবাবু?'

'আজ্ঞে?'

'হাওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বললাম। আপনাকে গিয়ে একবার কথা বলতে হবে। কাগজপত্রগুলি নিয়ে আপনি এখুনি চলে যান। দুটো সই করিয়ে নিয়ে আসবেন।' দাস নিশ্চিন্তভাবে বসে।—'আমরা ততক্ষণ গল্প করি। আপনাদের না খাইয়ে ছাড়ছি না।' দাস একটা সিগারেট ধরায়। সুশীলাকে বলে, 'উনি ঘুরে আসুন, আমরা ততক্ষণ আলাপ জমাই। আরেক কাপ চা খাবেন?'

সুশীলা আর মাখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। পাখা ঘোরবার আওয়াজে ঘরের স্তব্ধতা গমগম করতে থাকে। মাখন আর সুশীলা দুজনেরই মনে হয় আওয়াজটা হচ্ছে তাদের মাথার মধ্যে—অকথ্য বিশৃঙ্খল উদ্ভট আওয়াজ!

তারপর মাখন বলে, 'তুমি চা-টা খাও, আমি চট করে ঘুরে আসছি।'

সুশীলা ঢোক গিলে বলে, 'দেরি কোরো না।'

'না, যাব আর আসব।'

গাড়ি রাস্তায় পড়তেই মাখন ড্রাইভারকে বলে, 'জোরসে চালাও! জোরসে!'

শিল্পী

সকালে দাওয়ায় বসে মদন সারা গায়ে শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ে খিঁচ ধরল ভীষণভাবে।

একেবারে সাত-সাতটা দিন তাঁত না চালিয়ে হাতে-পায়ে কোমরে-পিঠে কেমন আড়ষ্ট মতো বেতো ব্যথা ধরেছিল, তাতে আবার গাঁটে গাঁটে ঝিলিকমারা কামড়ানি। সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, বিনা রোগে ব্যারাম ধরার মতো হদ্দ করে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা ধরাবাঁধা নড়নচড়ন তাঁত চালানোর কাজে, তার অভাবে শরীরটা মিইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে দুদিনে, রাতে ঘুম আসে না, মনটা কেমন টনটন করে এক ধরনের উদাস করা কষ্টে, সব যেন ফুরিয়ে গেছে! যাত্রা শুনতে গিয়ে নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় যেমন লাগে তেমনিধারা কষ্ট, তবে ঢের বেশি জোরালো আর অফুরন্ত। শরীর মনের ওসব উদ্‌বেগ সয়ে চুপচাপ থাকে মদন। যা সয় তা সইবে না কেন।

সকালে উঠেই মা গেছে বউকে সাথে নিয়ে বাবুদের বাড়ি। বাড়ির মেয়েদের ধরবে, বাবুর ছোটোমেয়ের বিয়ে উপলক্ষে দু-একখানা ভালো, মদন তাঁতির নাম করা বিশেষ রকম ভালো কাপড় বুনে দেবার ফরমাশ যদি আদায় করতে পারে। বাবুর বাড়ির বায়না পেলে সুতো অনায়াসে জোগাড় হয়ে যাবে বাবুদেরই কল্যাণে। বাড়িতে ছিল শুধু মদনের মাসি। তার আবার একটা হাত নুলো, শরীরটি প্যাকাটির মতো রোগা। মদনের হাউমাউ চিৎকার শুনে সে ছুটে আসে মদনের দু-বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে, সাথে আসে মাসির চার বছরের মেয়ে। মাসির কী ক্ষমতা আছে একহাতে টেনে খিঁচ ধরা পা ঠিক করে দেয় মদনের। মাসিও চেঁচায়। মদনের চিৎকারে ভয় পেয়ে ছেলেমেয়ে দুটো আগেই গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়েছিল।

তখন রাস্তা থেকে ভুবন ঘোষাল এসে ব্যাপারটা বুঝেই গোড়ালির কাছে মদনের পা ধরে কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দেয় আর উরুতে জোরে জোরে থাপড় মারে। যন্ত্রণাটা সামালের মধ্যে আসে মদনের, মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ার বদলে বশে আসে পা-টা।

বাঁচালেন মোকে।

মুখে শুষতে শুষতে মদন পায়ে হাত ঘষে। খড়ি-ওঠা ফাটা পায়ে হাতের কড়া তালুর ঘষায় শব্দ হয় শোষেরই মতো।

ভুবন পরামর্শ দেয় ঃ উঠে হাঁটো দু-পা। সেরে যাবে।

মদন কথা কয় না। এতক্ষণে আশেপাশের বাড়ির কয়েকজন মেয়ে পুরুষ ছুটে এসে হাজির হয়েছে হল্লোড় শুনে। শুধু উদি আসেনি প্রায় লাগাও কুঁড়ে থেকে, কয়েকটা কলাগাছের মোটে ফারাক মদন আর উদির কুঁড়ের মধ্যে। ঘর থেকেই সে তাঁতিপাড়ার মেয়ে পুরুষের পিত্তি জ্বালানো মিষ্টি গলায় চেঁচাচ্ছে ঃ কী হল গো? বলি হল কী?

ভুবন রাস্তা থেকে উঠে এলেও এটা জানা কথাই যে উদির কুঁড়ে থেকেই সে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে এসেছে। উদিই হয়তো তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। সাতদিন তাঁত বন্ধ মদনের, বউটা তার ন-মাস পোয়াতি, না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় উদির এই ভাবনা হয়েছে, জানা গেছে কাল। কিছু চাল আর ডাল সে চুপিচুপি দিয়েছে কাল মদনের বউকে, চুপিচুপি শুধিয়েছে মদনের মতিগতির কথা, সবার মতো মজুরি নিয়ে সাধারণ কাপড়

বুনতে মন হয়েছে কিনা মদনের। কেঁদে উদিকে বলেছে মদনের বউ যে, না, একগুঁয়েমি তার কাটেনি।

পাড়ার যারা ছুটে এসেছিল, ভুবনকে এখানে দেখে মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই বদলে যায়। ইতিমধ্যে পিসি পিঁড়ি এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে। বারবার সবাই তাকায় মদন আর ভুবনের দিকে দুচোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়ে। সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল, রাজি হল প্রায় বেগারখাটা মজুরি নিয়ে সস্তা ধুতিশাড়ি গামছা বুনে দিতে? মদন অস্বস্তি বোধ করে। মুখের খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি মুছে ফেলে হাতের চেটোতে।

সবার নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার জবাবেই যেন বুড়ো ভোলাকে শুনিয়ে সে বলে, পায়ে খিঁচ ধরল হঠাৎ। সে কী যন্তনা, বাপ্, একদম যেন মিত্যুযন্তনা, মরি আর কি! উনি ছুটে এসে টেনে-টুনে ঠিক করে দিলেন পা-টা, বাঁচালেন মোকে।

গগন তাঁতির বেঁটে মোটা বউ অদ্ভুত আওয়াজ করে বলে, অ! কাছেই ছিলেন তা এলেন ভালো তাইতো বলি মোরা।

তাঁত না চালিয়ে গা-টা ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি বলে মদন। গগন তাঁতির বউয়ের মুখকে তার বড় ভয়।

বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে, অপরাধীর মতো। তার কুঁড়েও মদনের ঘরের প্রায় লাগাও—উত্তরে একটা আমগাছের ওপাশে, যার দুপাশের ডালপালা দুজনের চালকে প্রায় ছোঁয় ছোঁয়।

বুড়ো ভোলার চেয়ে বৃন্দাবনের বয়স অনেক কম, কিন্তু শরীর তার অনেক বেশি জরাজীর্ণ। একটি তার পুরানো জীর্ণ তাঁত, গামছা আর আটহাতি কাপড় শুধু বোনা যায়। তাঁতে সে আর বসে না, ক্ষমতা নেই। তার বড়োছেলে রসিক তাঁত চালায়। সুতোর অভাবে তাঁতিপাড়ায় সমস্ত তাঁত বন্ধ, অভাবে ও আতঙ্কে সমস্ত তাঁতিপাড়া থমথম করছে: শুধু তাঁত চলছে কেশবের আর বৃন্দাবনের।

ভুবন অমায়িকভাবে বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করে, ক-খানা গামছা হয়েছে বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন যেন চমকে ওঠে। এক পা পিছিয়ে যায়।

জানি না বাবু, মোর ছেলা বলতে পারে।

কেশবকে বোলো বোনা হলে যেন পয়সা নিয়ে যায়!

বাঁকা মেরুদণ্ডটা একবার সোজা করবার চেষ্টা করে বৃন্দাবন, অসহায় করুণ দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার তাকায়।

ছেলেকে শুধোবেন বাবু। ওসব জানি না কিছু আমি।

পিছু ফিরে ধীরে ধীরে চলে যায় বৃন্দাবন।

গগনের বউ বলে মুখ বাঁকিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে, আমি কিছু জানি না গো, মোর ছেলা জানে! কত ঢং জানে বুড়ো।

বুড়ো ভোলা বলে, আহা থাম না বুনোর মা। অত কথায় কাজ কি। যন্তনা গেছে না মদন? মোরা তবে যাই।

কেশব গেলেই পয়সা পাবে, গামছা কাপড় বুনে দিলেই পয়সা মেলে, এসব কথা —এসব ইঙ্গিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে তারা ভয় পায়। সব ঘরে রোজগার বন্ধ, উপোস।

ভুবন বলে, তোমার গাঁয়ের তাঁতিরা, জানো মদন, বড় বোকা।

মদন নিজেও সাতপুরুষে তাঁতি। রাগের মাথায় সে ব্যঙ্গই করে বসে, সে কথা বলতে। তাঁতি জাতটাই বোকা।

ভুবন নিজের কথা বলে যায়, সুতো কিনতে পাচ্ছিস না, পাবিও না কিছুকাল। তাঁত বসিয়ে রেখে নিজে বসে থেকে লাভ কী? মিহিরবাবু সুতো দিচ্ছেন, বুনে দে, যা পাস তাই লাভ। তা নয় সুতো না কিনতে দিলে কাপড়ই বুনবে না, একি কথা? তোমার কথা নয় বুঝতে পারি, সস্তা কাপড় বুনবেই না তুমি, কিন্তু ওরা—

পোষায় না ওদের। সুতো কি সবাই কেনে, না কিনতে পারে? আপনি তো জানেন, বেশিরভাগ দাদন কর্জে তাঁত চালায়। পড়তা রাখে দিবারাত্তির তাঁত চালিয়ে, মুখে রক্ত তুলে। আপনি তাও আদ্দেক করতে চান, পারব কেন মোরা?

নইলে ইদিকে যে পড়তা থাকে না বাপু। কি দরে সুতো কেনা জানো? ভুবন আপশোশের শ্বাস ফেলে, যাক গে, কী করা। কত্তাকে কতো বলে তোমাদের জন্য সুতো বরাদ্দ করিয়েছিলাম, তোমরা না মানলে উপায় কী। বুঝি তো সব কিন্তু দিনকাল পড়েছে খারাপ, তাঁত রেখে কোনোমতে টিকে থাকা। নয়তো দুদিন বাদে তাঁত বেচতে হবে তোমাদের। ভালো সময় যখন আসবে, সুতো মিলবে আবার, তখন মনে পড়বে এই ভুবন ঘোষালের কথা বলে রাখছি, দেখো মিলিয়ে। তখন আপশোশ করবে আমার কথা শুনলে তাঁতও বজায় থাকত, নিজেরাও টিকতে।

তাঁত বাঁধা দিতে, বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে। সেই ভরসাতেই হয়তো গাঁট হয়ে বসে আছে লোকটা। কিন্তু সে পর্যন্ত কী গড়াবে? তার আগে হয়তো ভুবনের কাছে সুতো নিয়ে বুনতে শুরু করবে তাঁতিরা।

মাসি এসে ঘুরঘুর করে আশেপাশে। বামুনের ছেলে পায়ে হাত দিয়েছে মদনের, গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ভুবনকে যতক্ষণ সে প্রণাম না করছে মাসির মনে স্বস্তি নেই। মদনের বুঝি খেয়াল হয়নি, ভুলে গেছে। মদনের পা দুটো টান হয়ে ভুবনের পিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলে মাসির আর ধৈর্য থাকে না। মদনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রণামের কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

মদন একেবারে খিঁচড়ে ওঠে, মেয়েটাকে নে না কোলে, কেঁদে মরছে? মরগে না হেথা থেকে যেথা মরবি?

ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে মাসি পালায়। মদনের এ মেজাজ চেনে মাসি। মেয়ে কাঁদছে বলে বকুনি মিছে, ওটা ছুতো। ছেলেপিলে কানের কাছে চেঁচালে মানুষের অশান্তি কেন হবে মাসিও জানে না, মদনও বোঝে না! ছেলেমেয়ের কান্না মদনের কানে লাগে না। তাঁতের ঠকঠকি, মেয়েদের বকাবকি ঝিঁঝির ডাকের মতো। মেজাজটাই বিগড়েছে মদনের। না করুক প্রণাম সে বামুনের ছেলেকে। মদনের ওপর মাসির বিশ্বাস খাঁটি। রামায়ণ সে পড়তে পারে সুর করে, তাঁতের কাজে বাপের নাম সে বজায় রেখেছে, সেরা জিনিস তৈরির বায়না পায় মদন তাঁতি। মদনের মাব সাথে কচি বয়সে এ বাড়িতে এসে মাসি শুনেছিল, বাবুদের বাপের আমলে বেনারসি বুনে দেবার বায়না পেয়েছিল মদনের বাপ। বিয়ের সময় জালের মতো ছিপ্টিছাড়া শাড়ি বুনে পরতে দিয়ে তার সঙ্গে যে মশকরা করেছিল মদনের বাপ সেকথা কোনোদিন ভুলবে না মাসি। আজ আকাল, বায়না আসে না, সুতো মেলে না, তাঁত

চলে না, তবু মদন ওঁচা কাপড় বোনে না। ওর জন্য কষ্ট হয় মাসির, ওর বাপের কথা ভেবে। মা বউ যেন কেমন ব্যাভার করে ওর সঙ্গে।

মদনের বাপ যদি আজ বেঁচে থাকত, মাসি ভাবে। বেঁচে থাকলে সাড়ে চার কুঁড়ির বেশি বয়স হত তার। মাসি তা ভালো বোঝে না। শুধু শ্রীধরের চেয়ে সে বেশি বুড়ো হয়ে পড়ত ভাবতে মনটা তার মুষড়ে যায়। শ্রীধর তাঁতির বেঁচে থাকার দুর্ভাগ্য দেখে সে নিজেই যে কামনা করে এবার বুড়োর যাওয়াই ভালো।

না থাক মদনের বাপ। মদন তো আছে।

মদনের মা, বউ ফিরে আসে গুটিগুটি। পেটের ভারে মদনের বউ থপথপ পা ফেলে হাঁটে, হাত-পা তার ফুলছে কদিন থেকে। পরনের জীর্ণ পুরানো শাড়িখানা মদন নিজে বুনে দিয়েছিল তাকে বিয়ের সময়। এখনো পাড়ের বৈচিত্র্য, মিহি বুননের কোমল খাপি উজ্জ্বলতা, সব মিলে এমন সুন্দর আছে কাপড়খানা যে অতি বিশ্রীভাবে পরলেও, রুক্ষ জটবাঁধা চুল চোকলা-ওঠা ফাটা চামড়া, এসব চিহ্ন না থাকলে বাবুদের বাড়ির মেয়ে মনে করা যেত তাকে।

মদনের মা বিড়বিড় করে বকতে বকতে আসছিল লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে, ভুবনের সামনে সে কিছু না বললেই মদন খুশি হত। কিন্তু বুড়ির কী সে কাণ্ডজ্ঞান আছে। সামনে এসেই সে শুরু করে দেয় মদন তাঁতির এয়োতি-বশীকরণ বসন্ত-শাড়ির বায়নার কথা শুনেই বাবুর বাড়ির মেয়েদের হাসি টিটকারি দিয়ে তাদের বিদেয় করার কাহিনী। ওসব কাপড়ের চল আছে নাকি আর, ঠাকুমা দিদিমারা ঝিরা আর চাষার ঘরের মেয়েরা পরে ওসব শাড়ি।

মদন তাঁতি! মদন তাঁতির কাপড়! বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন তাঁতি।

বলল? বলল ওসব কথা? পা গুটিয়ে সিধে হয়ে বলে মদন, বেড়েছে—বড় বেড়েছে বাবুরা। অতি বাড় হয়েছে বাবুদের, মরবে এবার।

দাওয়ায় উঠতে টলে পড়বার উপক্রম করে মদনের বউ। খুঁটি ধরে সামলে নিয়ে ভেতরে চলে যায়, ভেতর থেকে তার উগ্র মন্তব্য আসে ঃ এক পয়সার মুরোদ নেই, গর্বো কত!

ভুবন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মেয়েরা অমন বলে মদন, ওসব কথায় কান দিতে নেই।

তা বলে, বাবুদের বাড়ির মেয়েরাও বলে, তার মা-বউও বলে, উদিও বলে। কিন্তু সব মেয়েরা বলে না। এই তাঁতিপাড়ার অনেক মেয়েই বলে না। মদন তাঁতিকে সামনে খাড়া করিয়ে তারা বরং ঝগড়া করে ঘরের পুরুষদের সঙ্গে। মদনও তাঁত বোনে তারাও তাঁত বোনে, পায়ের ধুলোর যুগ্যি নয় তারা মদনের। এক আঙুল গোঁফ-দাড়ির মধ্যে ভাঙা দাঁতের হাসি জাগিয়ে মদন শোনায় ভুবনকে। একটা এঁড়ে তাঁতির তেজ আর নিষ্ঠায় একটু খটকাই যেন লাগে ভুবনের। একটু রাগ একটু হিংসার জ্বালাও যেন হয়। সম্প্রতি মিহিরবাবুর তাঁতের কারবারে জড়িয়ে পড়ার পর সে শুনেছিল এ অঞ্চলের তাঁতিমহলে একটা কথা চলিত আছে ঃ মদন যখন গামছা বুনবে। গোড়ায় কথাটার মানে ভালো বোঝেনি, পরে টের পেয়েছিল, সূর্য যখন পশ্চিমে উঠবে—এর বদলে ওই কথাটা এদিকের তাঁতিরা ব্যবহার করে। সে জানে, মদন যদি তার কাছ থেকে সুতো নিয়ে কাপ . বুনে দিতে রাজি হয় আজ, কাল তাঁতিপাড়ার বেশিরভাগ লোক ছুটে আসবে তার কাছে সুতোর জন্য। বড় খামখেয়ালি একগুঁয়ে লোকটা, এই রাগে, এই হাসে, হা-হুতাশ করে, এই লম্বা-চওড়া কথা কয় যেন রাজা-মহারাজা!

উঠবার সময় ভুবনের মনে হয় ঘর থেকে যেন একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এল।

তারপরেই মাসির গলা ঃ ও মদন, দ্যাখসে বউ কেমন করছে।

ভুবন গিয়ে উদিকে পাঠিয়ে দেয় খবর নিতে। বেলা হয়েছে, তার বেরিয়ে পড়া দরকার, কাজ অনেক। কিন্তু মদনের ঘরের খবরটা না জেনে যেতে পারে না। তেমন একটা বিপদ ঘাড়ে চাপলে মদন হয়তো ভাঙতে পারে। উদির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ও ছুঁড়ির বড় বাড়াবাড়ি আছে সব বিষয়ে, খবর আনতে গিয়ে হয়তো সেবা করতেই লেগে গেছে মদনের বউয়ের। কি হয়েছে মদনের বউয়ের? কি হতে পারে? গুরুতর কিছু যদি হয়...

উদি ফেরে অনেকক্ষণের পরে। অনেকটা পথ হেঁটে মদনের বউয়ের শরীরটা কেমন কেমন করছিল, একবার মূর্ছা গেছে। মনে হয়েছিল বুঝি ওই পর্যন্তই থাকবে, কিন্তু পরে মনে হচ্ছে প্রসব ব্যথাটাও উঠবে।

পেসব হতে গেলে মরবে মাগি এবার। একবেলা একমুঠো ভাত পায় তো তিনবেলা উপোস। এমনি চলছে দুমাস। গাল দিয়ে এলাম তাঁতিকে, মরণ হয় না?

আখায় কাঠ গুঁজে নামানো হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয়। বেঁটে-আঁটো দেহটা পর্যন্ত তার পরিচয় দেয় দুর্জয় রাগের। বসাতে গিয়ে মাটির হাঁড়িটা যে ভাঙে না তাই আশ্চর্য।

এখনো গেলে না যে?

যাবো। আলিস্যে লাগছে।

ভাত খাবে, মোর রাঁধা ভাত? উদি আবদার জানায়।

ভুবন রেগে বলে, তোর কথা বড় বিচ্ছিরি।

মদন দাওয়ায় এসে বসেছে। উঁকি মেরে দেখে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে ভুবন আবার যায়। সকালের পিঁড়িটা সেইখানে পড়ে ছিল, তাতে জাঁকিয়ে বসে।

কেমন আছে বউ?

ব্যথা উঠেছে কম কম। রক্ত ভাঙছে বেশি, ব্যথা তেমন নয়। দুগগা বুড়িকে আনতে গেছে।

মদনের শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব দেখে ভুবন রীতিমত ভড়কে যায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে ভাবে, ভেবে মদনকেও একটা বিড়ি দেয়।

মদন বলে হঠাৎ ঃ ভালো কিছু বোনান না, একটু দামি কিছু? সুতো নেই বুঝি?

মনটা খুশি হয়ে ওঠে ভুবনের।

সামান্য আছে। কিন্তু বেনারসি ছাড়া তুমি কি কিছু বুনবে?

বেনারসি? বেনারসি না বোনা যেন তারই অপরাধ, তারই অধঃপতন, এমনই আপশোশের সঙ্গে বলে মদন, বেনারসি জীবনে বুনিনি।

একঘণ্টার মধ্যে সুতো এসে পড়ে। ভুবন লোক দিয়ে সুতো পৌছে দেয় মদনের ঘরে। সুতো দেখে কান্না আসে মদনের। এই সুতো দিয়ে তাকে ভালো কাপড়, দামি কাপড় বুনে দিতে হবে! এর চেয়ে কেশবের কতো গামছাই নয় সে বুনত, লোকে বলতো মদন তাঁতি গামছা বুনেছে দায়ে পড়ে, কিন্তু যা-তা ওঁচা কাপড় বোনেনি। সকালে পায়ে যেমন খিঁচ

ধরেছিল তেমনিভাবে কী যেন টেনে ধরে তার বুকের মধ্যে। ট্যাকে গোঁজা দাদনের টাকা দুটো যেন ছ্যাঁকা দিতে থাকে চামড়ায়। কিন্তু এদিকে তাঁত না চালিয়ে চালিয়ে সর্বাঙ্গে আড়ষ্টমতো ব্যথা, পেটে খিদেটা মরে মরে জাগছে বারবার, বউটা গোঙাচ্ছে একটানা।

কি করবে মদন তাঁতি?

সেদিন রাত্রি যখন গভীর হয়ে এসেছে, শীতের চাঁদের ম্লান আলোয় গাঁ ঘুমিয়ে পড়েছে, চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে, মাঝে মাঝে কাছে ও দূরে কুকুর-শিয়ালের ডাক ছাড়া মদন তাঁতির তাঁতঘরে শব্দ শুরু হল ঠকাঠক, ঠকাঠক। খুব জোরে তাঁত চালিয়েছে মদন, শব্দ উঠছে জোরে। উদির ঘরে তো বটেই, বৃন্দাবনের ঘরে পর্যন্ত শব্দ পৌছতে থাকে তার তাঁত চালানোর।

ভুবন বলে আশ্চর্য হয়ে, এর মধ্যে তাঁত চাপালো? একা মানুষ কখন ঠিক করল সব?

উদিও অবাক হয়ে গিয়েছিল—ও খাঁটি গুণী লোক, ও সব পারে—সে বলে ভয়ে ও বিস্ময়ে কান পেতে থেকে।

বুড়ো বৃন্দাবন ছেলেকে ডেকে বলে, মদন তাঁত চালায় নাকি রে?

তা ছাড়া কী আর? কেশব জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে, রাতদুকুরে চুপেচুপে তাঁত চালাচ্ছেন, ঘাট শুধু মোদের বেলা।

ভুবনের সুতো না হতে পারে।

কার সুতো তবে? কার আছে সুতো ভুবন ছাড়া শুনি?

মদনের তাঁত কখন থেমেছিল উদি জানে না। ভোরে ঘুম ভোঙেই সে ছুটে যায় মদনের কাছে। মদনকে ডেকে তুলে সাগ্রহে বলে, কতটা বুনলে তাঁতি?

আয় দেখবি।

মদন তাকে নিয়ে যায় তাঁতঘরে। ফাঁকা শূন্য তাঁত দেখে থ বনে থাকে উদি। সুতোর বাণ্ডিল যেমন ছিল তেমনই পড়ে আছে।

সুতো মদন উদির হাতে তুলে দেয়, টাকা দুটোও দেয়। বলে, নিয়ে যা, ফিরে দে গা ভুবনবাবুকে। বলিস, মদন তাঁতি যেদিন গামছা বুনবে—

একটু বেলা হতে তাঁতিপাড়ায় অর্ধেক মেয়ে-পুরুষ দল বেঁধে মদনের ঘরের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখ দেখলেই বোঝা যায় তাদের মনের অবস্থা। রোষে ক্ষোভে কারও চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম করেছে। গগন তাঁতির বউটা পর্যন্ত নির্বাক হয়ে গেছে। বুড়ো ভোলা শুধোয়ঃ ভুবনের ঠেঁয়ে নাকি সুতো নিয়েছ মদন? তাঁত চালিয়েছ দুকুররাতে চুপিচুপি?

দেখে এসো তাঁত।

তাঁত চালাওনি রাতে?

চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম এটটু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে? মদন তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে—

মদন হঠাৎ থেমে যায়।

কংক্রিট

সিমেন্ট ঘাঁটতে এমন ভালো লাগে রঘুর। দশটা আঙুল সে ঢুকিয়ে দেয় সিমেন্টের স্তূপে, দুহাত ভর্তি করে তোলে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝুরঝুর করে ঝরে যায়। হাত দিয়ে সে থাপড়ায় সিমেন্ট, নয় শুধু এলোমেলোভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করে। জোয়ান বয়সে ছেলেবেলার ধুলোখেলার সুখ। কখনও খাবলা দিয়ে মুঠো করে ধরে, যতটা ধরতে চায় পারে না, অল্পই থাকে মুঠোর মধ্যে। হাসি ফোটে রঘুর ঠোঁটে। এখনও গঙ্গামাটির ভাগটা মেশাল পড়েনি—ও চোরামিটা কোম্পানি একটু গোপনে করে। কী চিকন মোলায়েম জিনিসটা, কেমন মিঠে মেঘলা বরন। মুক্তার বুক দুটির মতো। বলতে হবে মুক্তাকে তামাশা করে, আবার যখন দেখা হবে।

এই শালা খচ্চর!

গিরীনের গাল, ছিদামের নয়। ছিদাম বিড়ি টানছে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, ব্যাটার তিনটে আব বসানো কিম্ভূত মুখ দেখলে গা জ্বলে যায় রঘুর, গাল শুনলে আরও বেশি। রুমাল-পোঁছা আসছে বুঝি তার চাকে পাক দিতে, ব্যাটা হলো বোলতা, গিরীন তাই সামলে দিয়েছে তাকে। চট করে কাজে মন লাগায় রঘু। গিরীনকে ভালো লাগে রঘুর, লোকটা হলো বেড়ালের মতো রগচটা আর বেঁটেখাটো ষাঁড়ের মতো একগুঁয়ে হলেও। যত বদমেজাজি হোক, যে কোনো হাসির কথায় হ্যা হ্যা করে হাসে যেন শেয়াল ডাকছে ফুর্তির চোটে। আবার কারও দুঃখদুর্দশার কথা শুনলে বাঘের মতো গুম হয়ে যায়, মাঝে মাঝে গলাখাঁকারি দেয় যেন রোলার মেশিনে পাথর গুঁড়োচ্ছে মড়মড়িয়ে।

রুমাল-পোঁছা এলো না দিকি?

না।

এলো না এলো, তোর কিরে বাঞ্চোত? ছিদাম বলে দাঁত খিঁচিয়ে, ওনার আর কাজ নেই, তোর কাজ দেখতে আসবেন? আমি আছি কী করতে?

কথা না কয়ে খেটে যায় রঘু। পোঁছাবাবু আসে এদিক ওদিক তেরচা চোখে চাইতে চাইতে, দু-বার রুমাল দিয়ে মুখ পুঁছে ফেলে দশ পা আসতে আসতেই। তার গালভরা নাম বিরামনারায়ণ—এই মুদ্রাদোষে চিরতরে তলিয়ে গিয়ে হয়েছে রুমাল-পোঁছা, সংক্ষেপে পোঁছাবাবু। গিরিন, গফু, ভগলু, নিতাই, শিউলালেরা একটু শক্ত বনে গিয়েই কাজ করে যায়, ছিদাম যেন খানিকটা নেতিয়ে বেঁকিয়ে যায় পোষা কুকুরের ঢং-এ, উৎসুক চোখে তাকায় বারবার মুখ তুলে, লেজ থাকলে বুঝি নেড়ে দিত।

তোর ওটা এখন হবে না গিরীন, সাফ কথা। হাঙ্গামা মিটলে দেখা যাবে।

দুমাস হয়ে গেল বাবু। হাঙ্গামার সাথে মোর ওটার—

বাস, বাস। এখন হবে না। সাফ কথা।

রুমালে মুখ পুঁছে এগিয়ে যায় পোঁছাবাবু। রগচটা গিরীন রাগের চোটে বিড়বিড় করে বুঝি গাল দিতে থাকে তাকে। ছিদাম একটু অবাক হয়ে ভাবে যে দুপুরের ভোঁ পড়ার মোটে দেরি নেই, টহল দিতে বার হলো কেন পোঁছাবাবু অসময়ে। ভোঁ-এর টাইম হয়ে এলে কাজে

ঢিল পড়ে কেমন, ফাঁকি চলে কীরকম দেখতে? দেখবে কচু, পোঁছাবাবু টহলে বেরোলে টের পায় সবাই। এর বদলে তাকে ডেকে শুধোলেই সে বলে দিতে পারত সব!

খিদেয় ভেতরটা চোঁ চোঁ করছে রঘুর, তেষ্টায় কিনা তাও যেন ঠিক আন্দাজ করা যায় না, ঘেমে ঘেমে দেহটা লাগছে যেন কলে-মাড়া আখের ছিবড়ে। ভোঁ-র জন্য সে কান পেতে থাকে। আগে মুখ হাত ধোবে না সোজা গেটে চলে যাবে, বন্ধ গেটের শিকের ফাঁক দিয়ে চানা কিনবে না মুড়ি কিনবে, আগে পেট পুরে জল খাবে না দুমুঠো খেয়ে নেবে আগে, এই সব ভাবে রঘু। মুক্তাকে এনে রাখতে পারলে হত দেশ থেকে, রোজ পুঁটলি করে খাবার সাথে দিত বেন্দার বউটার মতো। বউ একটা বটে বেন্দার! রঙে ঢঙে ছেনালিতে গনগনে কী বাস্ রে মাগিটা, মুক্তার মতো কচি মিষ্টি নয় যদিও মোটে। তবে পুঁটলি করে বেন্দাকে খাবার দেয় সাথে রোজ, রুটি, চচ্চড়ি ভাজা, নয়তো ঝাল-ঝাল শুখা ডাল, নয়তো চিচিঙার পেঁয়াজ ছেচকি।

হঠাৎ বড় শ্রান্ত, অবসন্ন লাগে নিজেকে রঘুর। সে জানে এরকম লাগলে কি ঘটবে এখুনি। কাশি আসছে। আঁতকানির মতো একটা টান লাগে ভেতরে, তারপর শুরু হয় কাশি ; কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়ে রঘু। হাঁটু গেড়ে সে বসে পড়ে, দুহাতে শক্ত করে নিজের হাঁটু জড়িয়ে হাঁটুতেই মুখ গুঁজে দেয়। এমনি করে আস্তে আস্তে শ্বাস টানবার চেষ্টা করলে কাশিটা নরম পড়ে, এক দলা সিমেন্ট-রঙা কফ উঠে আসবার পর কাশিটা থামে।

গিরীন গুম হয়ে তাকিয়ে থাকে বাঘের মতো, গলায় দুবার খাঁকারি দেয় আড়ালের রোলার মেশিনটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

আমি সাত বচ্ছর খাটছি, তুই শালা দুচার বছরে খতম হয়ে যাবি।

ট্যাক ফ্যা ফ্যা করছে রঘুর, পয়সা নেইকো। বেন্দার ট্যাকে দু-এক টাকা আছেই সব সময়, মাল টেনে এত পয়সা ওড়ায়, তবু। রঘু তাই দু-এক আনা ধার করতে যায় বেন্দার কাছে আর তাই সে দেখতে পায় রোলার মেশিনে কেষ্ট বাতাপির পিষে থেঁতলে যাবার রকমটা!

মাটিতে শিকড়-আঁটা গুমোটের গাছের মতো রঘু নড়েচড়ে না, মুখ হাঁ হয়ে যায়, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। সরে পড়তে গিয়ে তাকে দ্যাখে বেন্দা, দাঁতে দাঁত ঠেকে গিয়ে খিঁচে উঠে ছিরকুটে যায় বেন্দার মুখ। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে সাপের হিসহিসানির আওয়াজে সে বলে, যা যা, ভাগ। পালা শিগগির।

দিশেহারা রঘু পালাতে গেলে কিন্তু ফের তাকে ডেকে বেন্দা বলে, শোন, এখানে এইছিলি খপর্দার বলিসনি কাউকে, মারা পড়বি—খপর্দার।

পাতা হয়ে ঝড়ে উড়ে যেন রঘু ফিরে আসে নিজের জায়গায়, রঘুর প্রাণটা আর কি, নয়তো ফেরে সে পায়ে পায়ে হেঁটেই। মেঘলা গুমোটের কালঘাম ছুটেছে, সেটা দেখা যায়। ভাবসাব দেখে মনে হয়, কাশির দমকটা ঝাঁকি দিয়ে গেছে তাকে, কাবু করে দিয়েছে। কিন্তু রঘু ভাবে তার ভেতরের উলটেপালটে পাক খাওয়াটা বুঝি চোখে পড়েছে সকলের, এই বুঝি কে সুধিয়ে বসে, ব্যাপারখানা কী রে?

জল খেলি? গিরীন শুধোয় বাপের মতো সুরে।

হাঁ, খেলাম।

প্রথম ভোঁ বাজে দুপুরের। হাঁপ ফেলবার, ঢিল দেবার, জল-চানা খাবার এতটুকু অবকাশ। দমে আর হাতপায়ে একটু ঢিল পড়ে, মনটা শিথিল হবার সুযোগ পায় না কারও। হবু ধর্মঘট নিয়ে ব্যগ্র উত্তেজিত হয়ে আছে মজুরেরা, ও ছাড়া চিন্তা নেই, আলোচনা নেই। তার মধ্যে খবর ছড়ায় দুর্ঘটনার, কী তাড়াতাড়ি যে ছড়ায়। কেষ্ট বাতাপি রোলার মেশিনে পিষে থেঁতলে মারা গেছে খানিক আগে—এ খবর যে শোনে সে গুম হয়ে যায় খানিকক্ষণের জন্য, তারপর অকথ্য বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, এটা কীরকম হল? হুহু করে উত্তেজনা বেড়ে যায়, ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাতে থাকে উত্তেজনাব, সবার কথার মোট আওয়াজটা নতুন-রকমের ধ্বনি হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে খবর পেয়ে কয়েকজন যারা ছুটে গিয়েছিল দেখতে, তারাই শুধু দেখতে পেয়েছে কেষ্ট বাতাপির ছেঁচা দেহটা, জিজ্ঞেস করে ভাসাভাসা শুনতে পেয়েছে কীসে কী ঘটল। তারপর খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে সকলকে, ওখানে গণ্ডগোল করা বারণ হয়ে গেছে।

ছিদাম বলে, আহা রে! বিষ্যুৎবারের বারবেলায় পেরানটা গেল কপালদোষে।

রগচটা গিরীন যেন চটেই ছিল আগে থেকে, শুনেই গর্জে ওঠে, বারবেলার কপালদোষ! পোঁছা বুঝি বলেছে তোকে বলে বেড়াতে? পোঁছার পা-চাটা শালা ঘাগি বুড়ো! পোঁছা খুন করিয়েছে কেষ্টকে, জানিস? বজ্জাত শকুন তুই, চুপ করে থাক।

ছিদাম সরে পড়ে, চমক লেগে চমৎকৃত হয়ে। কৌতূহলে ফেটে পড়ে তার মনটা। এদিক ওদিক ঘোরে সে, ছাড়া ছাড়া কথা শুনতে ছোট ছোট দলের উত্তেজিত আলোচনার। কাছে যেতে তার ভরসা হয় না। সবাই হয়তো চুপ করে যাবে, কেউ তাকাবে আড়চোখে, কেউ কটমটিয়ে। যেটুকু সে শোনে তাতেই টের পায়, শুধু গিরীন নয়, অনেকেই বলাবলি করছে ষড়যন্ত্র—গোপন কারসাজির কথা।

আর একবার ভোঁ বাজে। যে যার কাজে যায়। যন্ত্রের একটানা গম্ভীর গর্জনে চাপা পড়ে যায় বটে কথার গুঞ্জন কিন্তু খাটুনেদের কানাঘুষা চলতে থাকে কাজের মধ্যেই।

ছিদাম আমতা-আমতা করে বলে, একটা কথার হদিস পাচ্ছি না, তোকে শুধাই গিরীন। কেষ্ট ভিন্ন ডিপার্টে, রোলার মেশিনে ও গেছল কেন?

বদলি করল না ওকে ক-রোজ আগে? এই মতলব পোঁছা শালার, খুনে ব্যাটা।

হাঁ—? বটে—?

কী তবে? গিরীন ফের চটে যায়, রগচটা গিরীন, কি বলতে চাস তুই? একরোজ যে কাজ করেনি সেকাজে বদলি করবার মানেটা কী?

রঘু শোনে। তার খাপছাড়া ভয়ংকর অভিজ্ঞতা মানে পেয়ে পেয়ে বীভৎসতর হয়ে উঠছিল আগে থেকেই, গিরীনের কথায় মানে আরও পরিষ্কার হয়ে যায়।

ছিদামও তাই ভাবছিল।

ম্যানেজারের ডান হাত পোঁছাবাবু। কিছুদিন আগেও বড় খুশি ছিল পোঁছাবাবু তার ওপর। কত গোপন কথা পোঁছা জেনে নিত তার কাছে, ওপরের কত গোপন ব্যাপারের

হদিস তাকে দিত, সেই সঙ্গে খোলা হাতে বোতল বোতল মদের দাম বখশিশ! সেরকম অনুগ্রহ পোঁছাবাবু আর তাকে করে না আজকাল, যদিও ছোটোখাটো দয়া আজও তার জোটে, ছোটোখাটো কাজে সে লাগে। দোষ তার নিজের। সবাই জেনে গেল তার ব্যাপার আর সাপের মতো, বিছার মতো তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল, ফলে আজ তার এই অবস্থা। তার নিজের গোখুরি ছাড়া আন্দাজ কী করতে পারত কেউ। আপশোশে বুকটা বিছার বিষে জ্বলে যায় ছিদামের। নিজের ঘরে সিঁদ দেওয়ার মতো কী বোকামিটা'ই সে করেছে। ম্যানেজার পর্যন্ত তাকে খাতির করে জানিয়ে জানিয়ে খাতিরের সাঙাতদের কাছে নিজের মান বাড়াবার কী ভূতটাই চেপেছিল তার ঘাড়ে। তা না হলে কি জানাজানি হয় আর এমনভাবে তার খাতির কমে যায় পোঁছাবাবুর কাছে। বড় বেশি মাল খাচ্ছিল সে কাঁচা টাকা পেয়ে পেয়ে, মাথার তার ঠিক ঠিকানা ছিল না কিছু, বিগড়ে গিয়েছিল একদম! একটু যদি সে সামলে চলত, কর্তারা তাকে খাতির করে এটা চেপে গিয়ে যদি বলে বেড়াতো ওপোর থেকে তাকে পিষে মারছে, আজ কি তাহলে তার অগোচরে কেষ্ট বাতাপিকে রোলার মেশিনে পিষে মারবার ব্যবস্থা করতে পারত পোঁছাবাবু, কয়েকটা নোট তার পকেটে আসত না!

জ্বালা যেন সয় না ছিদামের। এত পাকা বুদ্ধি নিয়ে বোকামি করে সব হারাল, এখন যে একটা চাল চালবার বুদ্ধি গজাচ্ছে মাথায় সেটাকে দাবিয়ে রেখে ফের কী একটা সুযোগ হারাবে বোকার মতো? উশখুশ করতে করতে একসময় মরিয়া হয়ে সে বেন্দার কাছে যায়। ভয়ে এদিকে বুকটা কাঁপেও।

কী যে বোকার মতো কাজ করিস বেন্দা। চুপিচুপি বলে সে বেন্দাকে।

সরু সরু লাল শিরায় আচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে বেন্দা বলে, কী বলছ? বোকার মত কী কাজ?

সবাই কী বলাবলি করছে জানিস?

কী বলাবলি করছে? চমকে আঁতকে ওঠে বেন্দা।

হুঁ হুঁ, ছিদাম মুচকে হাসে প্রাণপণ চেষ্টায়, আরে বাবা, আমার কাছে চাল মারিস কেন? পোঁছাবাবু আমাকে জানে, আমি পোঁছাবাবুকে জানি। সবাই কী বলাবলি করছে জানা দরকার পোঁছাবাবুর।

বেন্দা ঢোক গিলে গিলে ভাবে। তারপর বলে, চলো, বলবে চলো পোঁছাবাবুকে।

পোঁছাবাবু বলে, কীরে ছিদাম, খবর আছে?

আজ্ঞে।

পোঁছাবাবু তাকে বসতে বলে চেয়ারে। প্রায় রোমাঞ্চ হয় ছিদামের বুড়ো শরীরে। চাল খেটেছে তার। কাজে আর সে লাগে না, দরকার তার ফুরিয়ে গেছে, তবু এ ব্যাপারের কিছু সে টের পেয়েছে ধরে নিয়ে একটু কি খাতির তাকে করবেন না পোঁছাবাবু—ভেবেছিল সে। ঠিকই ভেবেছিল। নিজের পাকা বুদ্ধির তারিফ করে ছিদাম মনে মনে।

যেন আলাপ করছে এমনিভাবে পোঁছাবাবু তাকে জেরা করে। সে টেরও পায় না পোঁছাবাবু কী করে জেনে নিচ্ছে যে সবাই খোলাখুলিভাবে যা বলাবলি করছে তাও সে

ভালোরকম জানে না, পোঁছাবাবু তার চেয়ে অনেক বেশি জেনে এর মধ্যেই ব্যবস্থা আরম্ভ করেছে প্রতিবিধানের।

গালে প্রচণ্ড একটা চড় খেয়ে সে বুঝতে পারে চালাকি তার খাটেনি, আর একটা সে বোকামি করে ফেলেছে।

তবে সে আপনার লোক, যতই বোকা হোক। দুটো টাকা হাতে দিয়ে পোঁছা বলে, কাজ করবি যা। বজ্জাতি করিস না। কংক্রিটের গাঁথনি উঠছে, ওর মধ্যে পুঁতে ফেলব তোকে।

কাজে যখন ফিরে যায় ছিদাম, মাথাটা ভোঁতা হয়ে গেছে। মাথায় শুধু আছে যে আজ আস্ত একটা বোতল কিনে খাবে, দুটো টাকা তো দিয়েছে পোঁছাবাবু।

কিন্তু প্রতিশোধ নেবে। এবার থেকে সে ওদের দলে।

—শোন বলি গিরীন। কেষ্টকে ওরা মেরেছে টের পেয়েছি। আমি সাক্ষী দেব তোদের হয়ে।

তোর সাক্ষী চাই না।

অতি রহস্যময় দুর্ঘটনা, অতি সন্দেহজনক যোগাযোগ। মুখে মুখে আরও তথ্য ছড়িয়ে যায়, রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে আসে। গোবর্ধন নাকি সময়মতো এসেও কার্ড পায়নি ভেতরে ঢুকবার, সে তাহলে উপস্থিত থাকত দুর্ঘটনার সময়, যদি না কোন ছুতায় সরিয়ে দেওয়া হত তাকে,—নাসিরকে যেমন ঠিক ওইসময় পোঁছা ডেকে পাঠিয়েছিল সামান্য বিষয় নিয়ে বকাবকি করার জন্য। হানিফ ছুটির জন্য ঝুলোঝুলি করছিল আট-দশদিন থেকে, হঠাৎ কালকে তার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। পিষে থেঁতলে মরলো কেষ্ট বাতাপি কিন্তু একজনও তার মরণ-চিৎকার শোনেনি, মেশিনের আওয়াজ নাকি চাপা দিতে পারে মরবার আগে মানুষের শেষ আর্তনাদকে! সোজাসুজি প্রমাণ কিছু নেই, কিন্তু সবাই জানে মনে মনে, কেষ্ট দুর্ঘটনায় মরেনি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। ম্যানেজারের, রুমাল পোঁছার বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধে ছিল কেষ্ট, বুঝতে কী বাকি থাকে কারও, কেন তাকে মরতে হল, কী করে সে মরল।

রঘু টের পায়, ক্ষোভে আপশোশে অনেকে ফুঁসছে মনে মনে গিরীনের মত যে, এমন একটা কিছু পাওয়া যাচ্ছে না যার জোরে পোঁছার টুটি টিপে ম্যানেজারকে চেপে ধরে বাধ্য করা যায় পুরো নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি মানতে।

সে পারে। একমাত্র সে-ই শুধু পারে ওই অস্ত্রটি ওদের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু বড়ো যে এক খটকা আছে রঘুর মনে। কারসাজি কি ফাঁস হবে ওপরওলাদের? আটঘাট বেঁধে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা কি করে রাখেনি ওরা ধরি মাছ না ছুঁই পানির কায়দায়? কোন যোগসাজশ কি প্রমাণ করতে পারবে কেউ? অস্ত্রটা শুধু পড়বে গিয়ে বেন্দার গর্দানে। আর কেউ যদি হত বেন্দা ছাড়া--

গাঁয়ের মানুষ, বন্ধু মানুষ। পয়সা ধার চাইলে কখনও না বলে না, ঘরে বোতল খুললে তাকে ডেকে দু-পাত্র খাওয়ায়। রানী খুশি হয় তাকে দেখলে, এসো বসো বলে ডেকে বসায় আদর করে, ঘরে রাঁধা এটা-ওটা খাওয়ায়, হাসি-তামাশা রঙ্গরসে মশগুল করে রাখে। মুক্তার জন্য বুকটা যে খাঁখাঁ করে তার, তাও যেন ভুলিয়ে দেয় রানী। ওর চলন-ফিরন নড়নচড়ন দেখে রক্ত তাজা হয়ে ওঠে তার, বুকের মধ্যে কেমন করে। আর কি বুঝদার

মেয়েটা, কত আপন ভাবে তাকে! ক-দিন আগে হঠাৎ খেপে গিয়ে সে যে বলা নেই কওয়া নেই জড়িয়ে ধরেছিল তাকে, সে রাগ করেনি, শুধু একটা ধমক দিয়েছিল। বেন্দাকে কিছু বলেনি, নিজে তফাত হয়ে থাকেনি, আগেরই মতো হাসিখুশি আপনভাব বজায় রেখেছে।

কিন্তু বেন্দা শুধু খুন করেনি কেষ্ট বাতাপিকে পৌঁছার টাকা খেয়ে, সে দালাল এই ছিদামের মতো। ট্যাঁক তার ফাঁকা থাকে না কখনও, ঘরে বাইরে সে বোতল বোতল মাল টানে, মিহি শাড়ি কিনে দেয় রানীকে, সব পাপের যা সেরা পাপ তারই টাকাতে। রঘুর মাথার মধ্যে বিছার হুলের মতো বিঁধে থাকে এই চিন্তা।

ছুটির পর ক্রুদ্ধ উত্তেজিত মানুষগুলি কেষ্ট বাতাপির দেহটা দাবি করে। ওকে যারা মেরেছে আজ তাদের মারা না যাক, শোভাযাত্রা করে কেষ্টকে তারা শ্মশানে নিয়ে যাবে। এদের মধ্যে নিজেকে কেমন একা আর অসহায় মনে হয় রঘুর। দুর্বল অবসন্ন লাগে শরীরটা, মুখটা এমন শুকনো যে ঢোক গেলা যায় না। মাথার মধ্যে রোলার মেশিনের ঘর্ঘর আওয়াজ চলে, জ্যান্ত একটা মানুষের খুলি চুরমার হয়ে যায় প্রচণ্ড শব্দে, তারপর সব যেন স্তব্ধ হয়ে যায় মানুষের নরম মাংস ছেঁচে যাবার রক্তাক্ত শব্দহীনতায়।

বস্তিতে নিজের ঘরটিতেও সে একা। অন্যঘরের বাসিন্দাদের হইচই বেড়েছে সন্ধ্যার সময়, রোজ যেমন বাড়ে। গলির ওপারে দুটো বাড়ির পরের বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে ছিদামের গলা ফাটানো বেসুরো গান, এর মধ্যে বুড়ো নেশা জমিয়েছে। একটানা কোঁদল চলছে সামনের বাড়ির তিন-চারটি স্ত্রীলোকের, ওদের মধ্যে কুন্তার বয়স গড়ন মুক্তার মতো, গলাটা কিন্তু ফাটা বাঁশির মতো—ভাঙা। সন্ধ্যার সময় বাড়ি যেতে বলে বেন্দা কি দরকারে কোথায় গেছে। যাবে জেনেও রঘু মনে মনে নাড়াচাড়া করে, না গেলে কেমন হয়। রানী তাকে টানছে, এখন থেকেই টানছে জোরালো টানে। এই যে তার একা একা মন খারাপ করে থাকা, রানী যেন ম্যাজিকে সব উড়িয়ে দেবে। তবু সে ভাবছে, না গেলে কেমন হয়। মনটা তার বিগড়ে গেছে বেন্দার ওপর, বিতৃষ্ণায় বিষিয়ে উঠছে। সোজা সহজ একটা কথা বার বার মনে পড়ছে যে এসব লোকের সাথে দহরম-মহরম রাখতে নেই, হোক গাঁয়ের মানুষ, হোক বন্ধু মানুষ, চোর-ডাকাত খুনের চেয়ে এরা বদ, এদের সাথে থাকলেই বিপদ। রানী যদি বেন্দার বউ না হত—

মালতীর ন-বছরের মেয়ে পুষ্প এসে দুয়ারে দাঁড়িয়ে বুড়ির মতো বলে, কীগো, আজ রাঁধবে না?

ব'লে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকে জবাবের। অসুখবিসুখ যদি হয়ে থাকে, যদি আলসেমি ধরে থাকে না-রাঁধবার, যদি বলে, দুটি রেঁধে দিবি পুষ্প, সে ছুটে গিয়ে মাকে ডেকে আনবে। পুষ্পর আজ পেটটা ভালো করে ভরবে। উঠোনে পা ঝুলিয়ে ভিজে দাওয়ায় বসে বাতাসের সঙ্গে বকাবকি করছে পুষ্পর মা মালতী। থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে, ঠ্যাং ছিঁড়ো না, ঠ্যাং ছিঁড়ো না বলছি! ও বছর পুষ্পর বাপ লক্ষ্মণের পা আটকে গিয়েছিল কলে, পা-টা কেটে ফেলতে হয়েছিল পাছার নীচে থেকে, শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি।

আলসেমি লাগছে পুষ্প।

মাকে ডাকি? বলেই পুষ্প ছুট দেয় রঘুর সায় শুনবার আগেই।

রানী আসে রঘুকে ডাকতে।

যাওয়ার যে চাড় দেখি না, হাপিত্যেশ বসে আছে লোকটা ঢেলে-ঢুলে?

চলো যাই।

গলিতে নেমে ছিদামের গান আরও স্পষ্ট শোনা যায়, কথাগুলি জড়ানো। নেশা আরও চড়িয়ে চলেছে ছিদাম। নয়তো মিনিট কয়েক চেঁচানোর পর সে ঝিমিয়ে যায়, আশেপাশের লোক স্বস্তি পেয়ে বলে, যাক, শ্যাল-শকুনের কোঁদল থামল।

গলি থেকে আরও সরু গলি, তার মধ্যে ঘর বেন্দার, কাছেই। লণ্ঠনের আলোয় ফূর্তির সরঞ্জাম সাজিয়ে বসে আছে বেন্দা। ভাঁড়ের বদলে আজ কাচের গেলাস, কিনেই এনেছে বুঝি। খুরিতে ঝাল মাংস, কাগজে ডাল বাদাম। জলের বদলে চারটে সোডা।

হুঁ হুঁ বাবা, আজ খাঁটি বিলিতি, দামি চিজ।

কফে গলাটা ধরা ছিল বেন্দার, রঘু ঘড়ঘড় আওয়াজ পায়। একদিনে যেন বেন্দার মুখটা আরও ছুঁচলো হয়ে চামড়া আরও বেশি কুঁচকিয়ে গেছে। মিহি শাড়িটা পরেছে রানী, তলায় বুঝি সালুর শেমিজ, রং বেরোচ্ছে। দানা-দানা মিহি বুদবুদ উঠছে ভরতি গেলাসের টলটলে রঙিন পানীয় থেকে।

ঢেলে বসে আছি তোর জন্যে। মাইরি ঠেকাইনি ঠোঁটে।

আজ তার বিশেষ খাতির। হবে না কেন, হওয়াই উচিত। গেলাস তুলে এক চুমুকে শেষ করে ফেলে রঘু হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে, হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সেদিন যেমন সাপটে ধরেছিল রানীকে।

আরে আরে, রয়েসয়ে খাও, রানী বলে, খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে তার কাণ্ড দেখে।

বেন্দা বোতল থেকে তার গেলাসে মদ ঢেলে দেয়, খানিকটা সোডা দিয়ে খানিকটা জল মেশায়, সোডায় কুলোবে না।

নিজের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, বাপ্‌স! ভাগ্যে এলি, এলি তুই, এলি আচমকা, অন্য কেউ নয়! প্রাণটা লাফিয়ে উঠেছিল কণ্ঠাতে মানুষ দেখে, তারপর দেখি তুই। ধড়ে প্রাণ এল। আরও দু-বার চুমুক দেয়, খানিকটা বেপরোয়াভাবে বলে, তবে, কী আব হত! একটু হাঙ্গামা, বাস। পোঁছাবাবু ঝানু লোক, ঠিক করে নিত সব।

আরেক গেলাস ঢেলেছে সবে বেন্দা নিজের জন্য, লোক আসে পোঁছাবাবুর কাছ থেকে।

পোঁছাবাবু একবার ডেকেছে বেন্দাকে, এখুনি যেতে হবে, জরুরি দরকার। পোঁছাবাবু আছে ম্যানেজার সাহেবের কাছে, সেখানে যেতে হবে। ম্যানেজার সাহেব নিজের গাড়ি পাঠিয়েছে, বড় রাস্তার মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি।

দুত্তেরি শালার নিকুচি করেছে! বেন্দা বলে বেজার হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, তুই বোস রঘু, খা। চটপট আসছি কাজটা সেরে। গাড়ি করে যদি না দিয়ে যায় তো—

বেন্দা বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে রানী। টুক করে এসে উবু হয়ে বসেই বেন্দাব খালি গেলাসে বোতল থেকে মদ ঢেলে এক চুমুকে গিলে ফেলে জল বা সোডা না দিয়েই, ঝাঁঝে মুখ বাঁকিয়ে থাকে কতক্ষণ।

রঘুর চাউনি দেখে বলে, কী হল, খাও? হাত বাড়িয়ে গালটা সে টিপে দেয় রঘুর। ভালো করে বসে আর একটু ঢালে, এবার সোডা মিশিয়ে রসিয়ে রসিয়ে খায় একটু একটু করে। রঘুর গেলাস তুলে ধরে তার মুখে।

কাছে ঘেঁষে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, ওকে বোলো না খেয়েছি। ফিরে এসে নেশা চড়লে নিজেই ডাকবে, তখন একটুখানি খাবখন দেখিয়ে। ফিরতে দেরি আছে, একঘণ্টা তো কম করে।

গায়ে লেগে কানে কথা কয় রানী, তার মদ পেঁয়াজের গন্ধ-ভরা নিশ্বাসে ঝড় ওঠে রঘুর মাথার রঙিন ধোঁয়ায়। গেলাস রেখে সে ধরে রানীকে।

রানী বলে, বাসরে ধৈর্য নেই এতটুকু? গেলাসটা শেষ কর?

খালি গেলাস মদ সোডার বোতল নিজেই তফাতে সরিয়ে জায়গা করে মুচকে হেসে নিজে থেকেই সে নেতিয়ে পড়ে রঘুর বুকে।

আরেকটু মদ ঢেলে খায়, রঘুকে দেয়। বলে, আর তোমার ভাবনাটা কি? কত বিলিতি খাবে তুমি এবাব নিজের রোজগারে। তুমি চালাকচতুর আছো ওর চেয়ে, ওতো একটা গোঁয়ার। এবার কত কাজে লাগাবে তোমায় পোঁছাবাবু, কত টাকা কামাবে তুমি।

মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে রঘুর এতক্ষণ পরে।

যাই বাবা ওঘরে, কখন এসে পড়বে। যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে রানী আবার বলে, একটা কথা বলি শোন। তোমার জন্যেও পোঁছাবাবু টাকা দিয়েছে ওকে, চেয়ে নিও। ভাগ ছাড়বে কেন নিজের? এমনি হয়তো চেপে যাবে, কথায় কথায় বোলো, মোকে কিচ্ছু দিলে না পোঁছাবাবু? তাহলে দেবে। চোখ ঠেরে রানী হাসে, বাতলে দিলাম, ভাগ দিতে হবে কিন্তু মোকে।

কানে তালা লেগে গেছে রঘুর, সেটা যেন মানুষের নরম মাংস পিষে থেঁতলে যাবার যে শব্দ, সেই তার মতো। এই কাজ করতে হবে তাকে এবার, বেন্দা যা করে, ছিদাম যা করে। চুপ করে থাকলে তার চলবে না, পোঁছাবাবু তাকে কাছে টেনে কাজে লাগাবে বেন্দার মতো, ছিদামের মতো। এই তার পথ! আর একমুহূর্ত এখানে থাকলে তার যেন প্রাণটা যাবে এমনিভাবে চট করে খিল খুলে রঘু পথে নেমে যায়। হনহন করে এগিয়ে যায় অন্ধকার গলি ধরে। নেশা তার কেটে গেছে। মদের নেশার চেয়ে অন্য নেশাই তার হয়েছিল জোরালো। ছিদামের ঘরের কাছাকাছি সে হোঁচট খায় একটা মানুষের দেহে। নেশার ঝোঁকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিদাম রাস্তায় পড়ে আছে, কেউ তাকে তোলেনি। হোঁচট খাওয়ার রাগে একটা লাথি তুলে পা নামিয়ে নেয় রঘু। জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করে। তার ধৈর্য ধরছিল না কতক্ষণে গিরীনের কাছে গিয়ে বলবে নিজের চোখে যা কিছু দেখেছে—রোলার মেশিনের ঘটনা। সবাই যে অস্ত্রটি খুঁজছে, নিজের কাছে অকারণে এক মুহূর্ত বেশি সেটি লুকিয়ে রাখবার কথা সে ভাবতেও পারছিল না।

টিচার

রাজমাতা হাইস্কুলের সেক্রেটারি রায়বাহাদুর অবিনাশ তরফদার ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত টিচারদের কিছু সদুপদেশ দেওয়া স্থির করল। বুড়ো বয়সে এমনিতেই তার ঘুম হয় কম, তার ওপর এইসব যাচ্ছেতাই খাপছাড়া ব্যাপারে মাথা গরম হয়ে যাওয়ায় কদিন আরও ঘুম হয়নি। টিচাররা ধর্মঘট করবে বেতন কম বলে, বেতন বাকি থাকে বলে, এটা-সেটা হরেকরকম অসুবিধা আছে বলে চাকরি করতে। বাপের জন্মে রায়বাহাদুর এমন কথা শোনেনি। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তারা কি মজুর না ধাঙড় যে ধর্মঘট করবে?

শুধু তার স্কুলে এসব গোলমালের সম্ভাবনা ঘটলে সে অবশ্য ব্যাপারটা গ্রাহ্য করত না। দুটো ধমক দিয়ে একটা মিষ্টি কথা বলে, সকলকে খেপাচ্ছে কোন্ মাথা-পাগলা ইয়ং টিচারটির সন্ধান নিয়ে তাকে একচোট মজা দেখিয়ে সব ঠিক করে দিত অনায়াসে। কিন্তু সারা বাংলাদেশের সব স্কুলের টিচাররা জোট বাঁধছে, সম্মেলন করছে। খেতে পায় না লেখা ব্যাজ পরছে। করুক, পরুক। যা খুশি করুক অন্য স্কুলের টিচাররা, তার স্কুলে সে ওসব বিশ্রী কাণ্ড ঘটতে দেবে না, ওসব হীনতা স্বার্থপরতা স্বেচ্ছাচারিতা ঢুকতে পারবে না তার পবিত্র শিক্ষায়তনে।

স্বার্থ ভুলে, বিলাসের লোভ জয় করে, স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যকে হাসিমুখে বহন করে, বিদ্যাদানের মহান আদর্শ যারা গ্রহণ করেছে, দেশের যারা ভবিষ্যৎ মেরুদণ্ড তাদের গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্বপালন যাদের জীবনের ব্রত, বুনো রামনাথ যাদের গর্ব ও গৌরব, তুচ্ছ দুটো পয়সার জন্য, সামান্য দুটো অসুবিধার জন্য, তারা নিজেদের নামিয়ে আনবে, আদর্শ চুলোয় দেবে, শিক্ষা-দীক্ষাহীন অসভ্য মজুর ধাঙড়ের মতো হাঙ্গামা করবে, তা কখনো হতে পারে না, রায়বাহাদুর তা বিশ্বাস করে না। মোটামুটি এই ধরনের সদুপদেশ রায়বাহাদুর শোনালো শনিবার স্কুল ছুটি হবার পর। অবশ্য অনেক ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে, দমক-গমক-মূর্ছনা আমদানি করে, গুরুগম্ভীর চালে।

আপনারা কি বলেন?

কে কী বলবে? সকলে চুপ করে থাকে। রায়বাহাদুরের ধৈর্য বড় কম, বিশেষত এখন এত লম্বা বক্তৃতা দেবার পর এই গরম অবস্থায় এক ফোঁটাও আছে কিনা সন্দেহ, কেউ কিছু বলতে গেলে হয়তো গালাগালি দিয়ে বসবেন, গালে চড় বসিয়ে দেওয়াও আশ্চর্য নয়। কিছু বলার দরকারও ছিল না। টিচারদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে এটা অফিসিয়াল মিটিং নয়, রায়বাহাদুরের নিজস্ব সদুপদেশ দানের সভা। চুপচাপ বসে শোনাই এখানে যথেষ্ট।

প্রৌঢ় হেডমাস্টার শশাঙ্ক কেবল একবার মাথা চুলকিয়ে বলে, আজ্ঞে তা বইকি। শিক্ষকজীবনের মহান আদর্শের কথা কি তারা ভুলতে পারে।

সভার শেষে শশাঙ্ক একান্তে আবার বলে, গত মাসের বাকি মাইনেটার জন্য একটু, যে রকম দিনকাল, সংসার চালানোই—

কে উসকানি দিচ্ছে জানেন?

ক-বছর আগে হলে শশাঙ্ক হয়তো দু-একটা নাম উচ্চারণ করে ফেলত। কিন্তু শশাঙ্কবাবুও আর সে শশাঙ্কবাবু নেই, অনেক বদলে গেছে।

আজ্ঞে উসকানি কে দেবে। একজন দুজনের উসকানির ব্যাপার নয়, আপনি তো জানেন, দেশ জুড়ে এরকম চলছে।

স্কুলের বাগানের দিকে চেয়ে থেকে রায়বাহাদুর বলে, গিরীন খুব পলিটিক্স করে বেড়ায় নাকি?

বুকটা ধড়াস করে ওঠে শশাঙ্কের, গিরীন তার জামাই। মনে মনে আরেকবার গিরীনকে অভিশাপ দিয়ে বলে, পলিটিক্স করে না। মিটিং-ফিটিং হলে হয়তো কখনও শুনতে যায়। আর স্কুলে পলিটিক্স নিয়ে কিছুই হয় না।

হয় না? সেদিন স্ট্রাইক করে ছেলেরা স্কুলের মাঠে যে মিটিং করল?

আজ্ঞে সেটা ঠিক পলিটিক্যাল মিটিং নয়। প্রোটেস্ট মিটিং মাত্র। কলকাতায় স্টুডেন্টদের ওপর গুলি চালানো হল, তারই প্রোটেস্টে--

কলার কাঁদিটা বাতিত হয়েছে না? এবার কেটে ঝুলিয়ে রাখলে পেকে যাবে দু-একদিনের মধ্যে, কী বলেন?

কাল মালিকে বলব। রাতারাতি যেন চুরি হয়ে যায় না, দেখবেন! রায়বাহাদুর হাসলো।

সন্ধ্যার পর গিরীন বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে রায়বাহাদুর আশ্চর্য হল না। গিরীনের সম্পর্কে তার প্রশ্নে ভড়কে গিয়ে শশাঙ্ক নিশ্চয় তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে দোষ কাটাতে, কথায় কথায় তাঁকে জানিয়ে দিয়ে যেতে যে ভুলচুক যদি সে করেই থাকে তিনি যেন ক্ষমা করে নেন, এবার থেকে সে সাবধান হবে। তাই যদি হয় তবে ভালোই।

গিরীন কিন্তু ওসব কথার ধার দিয়েও যায় না। খুব বিনীত ও নম্রভাবে পরদিন তার ছোটছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন জানায়। রায়বাহাদুর অবশ্য বুঝতে পারে তার মানেও তাই। খানিকটা স্পষ্টভাবে জানানোর বদলে ইঙ্গিতে জানানো যে সে অনুগতই, রায়বাহাদুর যা অপছন্দ করেন তা থেকে সে তফাতে থাকছে, তাকে চটাবে না।

অন্নপ্রাশন? ছোট ছেলের? তা বেশ, কিন্তু আমি নেমন্তন্নে যাই না, বুড়ো শরীরে সয় না ওসব। রায়বাহাদুর অমায়িকভাবে হাসে।

আপনাকে পায়ের ধুলো দিতেই হবে।—গিরীন বলে নাছোড়বান্দার জোরালো অনুনয়ের সুরে, সকাল সকাল গিয়ে আশীর্বাদ করে আসবেন শুধু, একটু ফলমূল মুখে দেবেন। সবাই আশা করছি, মনে বড়োই আঘাত পাব না গেলে।

রায়বাহাদুর যেতে রাজি হয়েছে ধরে নিয়েই যেন একটু ইতস্তত করে গিরীন আবার বলে, একটা কথা বলি আপনাকে, দোষ নেবেন না। খেলনা বা উপহার কিছু নিয়ে আসবেন না খোকার জন্য। আমাদের বংশের রীতি আছে, কোন কাজে রক্তের সম্পর্ক ছাড়া কারও কাছে সামান্য উপহারও নেওয়া চলবে না। ঠাকুরদা না তাঁর বাবা অভিশাপ দিয়ে গিয়েছেন, একগাছি তৃণ নিলে নাকি বংশের সর্বনাশ হবে।

বলো কী হে?

একটা দুশ্চিন্তা কেটে যায়, অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে গেলে কিছু দিতে হবে এ চিন্তাটা ছিল রায়বাহাদুরের। এবারে একটু ভেবে গিরীনের একান্ত আগ্রহ দেখে রাজি হয়ে বলল, এত করে যখন বলছ—

সে কিছু খাবে না, কিন্তু এই সুযোগে মিষ্টি প্রভৃতি তার সঙ্গে কি দেবে না গিরীন? রায়বাহাদুর ভাবে। অনেকেই দেয়।

প্রায় দশটায় রায়বাহাদুর গিরীনের বাড়ি পৌঁছল। বাড়ি দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল, ছোটছেলের অন্নপ্রাশন উৎসবের চিহ্ন না দেখে আরও বেশি। এত ছোটো, এত পুরানো, এমন দীনহীন চেহারায় একতলা পাকা বাড়ি হয়, রায়বাহাদুর জানত না। কারণ এর চেয়েও খারাপ বাড়ি চারিদিকে অসংখ্য ছড়ানো থাকলেও সে কোনটার দিকে কখনও তাকিয়ে দেখেনি—এ ধরনের বাড়ির অধিবাসী কস্মিনকালেও তাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে সাহস পায়নি! ছেলের অন্নপ্রাশন রীতিমতো একটা উৎসবের ব্যাপার। তার ছেলের অন্নপ্রাশনে ব্যাণ্ড বেজেছিল, মেয়ের ছেলের অন্নপ্রাশনে সে অন্তত শানাই বাজায়। লোক গিজগিজ করে তার বাড়িতে, ছেলের বেলা বেশি হোক, মেয়ের ছেলের বেলা কম হোক, গিজগিজ করে। গিরীনের বাড়িতে লোক আছে বলেই মনে হয় না, ভেতর থেকে শুধু ভেসে আসে ছোট একটা ছেলে বা মেয়ের কান-চেরা কান্না।

গাড়ির আওয়াজে বেরিয়ে এসে গিরীন তাকে অভ্যর্থনা জানায়, যথাসাধ্য আয়োজন করেছি, দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন।

যথাসাধ্য আয়োজন? বৈঠকখানার ভাঙা তক্তপোশে বিছানো ছেঁড়া ময়লা সতরঞ্চির এক প্রান্তে কুণ্ডলী পাকানো ঘেয়ো কুকুরের মতো দলা পাকিয়ে বসে আছে খালি গায়ে জবুথবু একটা মানুষ, মেঝেতে লোম-ওঠা বিড়ালটা ছাড়া আর কোন জীবন্ত প্রাণী নেই ঘরে। তক্তপোশ ছাড়া বসবার আসন আছে আরেকটি, কেরোসিন কাঠের একটা টেবিলের সামনে কালিমাখা একটি কাঠের চেয়ার। দিনে বৈঠকখানা হলেও ঘরটি যে রাত্রে শোবার ঘরে পরিণত হয় তার প্রমাণ, গুটানো কাঁথা-মশারির বাণ্ডিলটা জানালায় তোলা রয়েছে। তক্তপোশের নীচে ঢুকিয়ে আড়াল করে গোপন করে ফেলবার বুদ্ধিটা বোধহয় কারও মাথায় আসেনি।

ইনি আমার বাবা, গিরীন পরিচয় করিয়ে দেয়, দু-বছর ভুগছেন। আর বছর ডাক্তার বলেছিলেন, কলকাতা নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেণ্ট করাতে, পেরে উঠিনি, সাত-আটশো টাকার ব্যাপার।

জবুথবু বৃদ্ধ কষ্টে চোখ মেলে তাকায়। দুটি হাত একত্র করে নমস্কার জানাবার মতোই যেন চেষ্টা করে মনে হয়। ক্ষীণকণ্ঠে কি বলে ভাল বোঝা যায় না।

আসুন। ভেতরে চলুন।

রায়বাহাদুরকে গিরীন বাড়ির মধ্যে একেবারে তার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। উঠান পেরিয়ে যাবার সময় এদিক ওদিক তাকিয়ে রায়বাহাদুর যথাসাধ্য আয়োজনের কোন চিহ্নই দেখতে পায় না। রোয়াকে একজন অল্প একটু হলুদ বাটছে, তার বাড়িতে দৈনিক রান্নার জন্য যতটা হলুদ বাটা হয় তার সিকিও হবে না। যে বাটছে তার বেশটা তার বাড়ির ঝিয়ের মতোই, তবে রায়বাহাদুর অনুমান করতে পারে মেয়েটি ঝি নয়, বাড়িরই কোন

বউ ঝি। ওপাশে রান্নাঘরে খুন্তি দিয়ে কড়ায় ব্যানুন নাড়ায় রত বউটির শাঁখা-পরা হাতটি শুধু চোখের এক পলকে দেখেই কী করে যেন রায়বাহাদুর টের পেয়ে যায় যে সে গিরীনের বউ।

চারভিটেয় চারখানা ঘর তোলার সুযোগ থাকলেও বৈঠকখানাটি বাদ দিলে ভেতরে ঘর মোটে দুখানা—রান্নাঘরের চালাটি ছাড়া। গিরীনের শোবার ঘরখানার নমুনা দেখেই রায়বাহাদুর বুঝতে পারে অন্য ঘরখানা কেমন, নড়াচড়ার স্থান কতটা, কীরকম আলো বাতাস আসে।

জলচৌকিতে পাতা পুরানো কার্পেটের আসনে বসে রায়বাহাদুরের দম আটকে আসে। ছোটছেলে বা মেয়ের কান-চেরা কান্নাটা এখন খুব কাছে মনে হয়।

কে কাঁদে?

ছেলেটা কাঁদছে, ছোট ছেলেটা। যার মুখে ভাত। জ্বর আসছে বোধহয়, জ্বর আসবার সময় এমনি করে কাঁদে। জ্বর এসে গেলে চুপ করে যাবে।

রায়বাহাদুর অস্বস্তি বোধ করে, এদিক-ওদিক তাকায়, একটা ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে মনে হয় তার। গিরীন নীরবে তাকে লক্ষ করে, ফাঁদে পড়া হিংস্র জন্তুর দিকে শিকারি ব্যাধের মতো শান্ত নির্বিকারভাবে, মুখ তার থমথম করে মনের আপসহীন মনোভাবে।

আপনি তো ভালো হোমিওপ্যাথি জানেন। সবাই বলে যে ডাক্তারি পাশ করেননি বটে, কিন্তু আপনার ওষুধ একেবারে অব্যর্থ।—সে বলে ব্যঙ্গ ও তোষামোদের সুরে।—ছেলেটাকে দেখে দিন না একটু ওষুধ? বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছে ছেলেটা।

রায়বাহাদুর যেন রাজি হয়েছে তার ছেলেকে দেখে ওষুধ দিতে এমনিভাবে দরজার কাছে গিয়ে গিরীন ডাকে, শুনছো? খোকাকে নিয়ে এসো শিগগির। আঃ, এসো না নিয়ে? দেরী করছ কেন?

নিজের অতিরিক্ত অধৈর্যের কৈফিয়ত দেবার জন্যই যেন রায়বাহাদুরের কাছে গিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে, আর পারি না এদের সঙ্গে। আপনার সামনে আসবে যা পরে আছে তাই পরে, তাতেও লজ্জা! সম্বল তো সেই বিয়ের একখানা শাড়ি, একঘণ্টা লাগাবে এখন সেখানা বার করে পরতে। আর পারি না সত্যি।

সে এসে কৈফিয়তের বিরক্তি জানানো শুরু করতে না করতেই ছোট একটি কঙ্কাল বুকের কাছে ধরে পাঁশুটে রঙের রোগা একটি বউ দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল, একনজর তাকিয়েই রায়বাহাদুর টের পায় পরনের কাপড় বদলে বিয়ের সময়কার একমাত্র শাড়িটি সে পরে আসেনি। এটাও সে টের পায় যে ওকে আসতে ডেকেই গিরীন তার কাছে এসে শোনাচ্ছে তার বউয়ের মানুষের সামনে বার হবার উপযুক্ত কাপড়ের অভাবের কথা। তার প্রায় পিছু-পিছুই বউটি ঘরে ঢুকেছে। মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে রায়বাহাদুরের। তার ভয় করে!

ও তুমি এসেছ, গিরীন বলে নির্বিকারভাবে, এইখানে শুইয়ে দাও।

রায়বাহাদুরের উলের মোজা আর পালিশ করা দামি চকচকে জুতো পরা পায়ের কাছে মেঝেটা সে দেখিয়ে দেয়। বউ তার ইতস্তত করে বড়ো বড়ো জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকায় তার মুখের দিকে। এত শীর্ণ বউটি, এমন শুকনো বিবর্ণ তার রক্তশূন্য মুখ, কিন্তু তার রূপ

দেখে ভেতরে ভেতরে মুচড়ে যায় রায়বাহাদুর। তার বাড়ির মেয়েরা, ফুলি ঝিটা পর্যন্ত যেন শুধু মেদ আর মাংস। গিন্নির কথা ধর্তব্যই নয়, তিনি প্রায় গোলাকার। তার মেজমেয়ে আর মেজছেলের বউ রোগা ছিপছিপে, বড়ছেলের বউটাও ছিপছিপে ছিল বিয়ের সময়, আজকাল মুটোচ্ছে। গিরীনের ক্ষীণাঙ্গী বউটির সঙ্গে মিলিয়ে রায়বাহাদুর বুঝতে পারে তার মেয়ে-বউদের গড়নটাই শুধু ছিপছিপে, অতি বেশি মেদ মাংসেই তারা গড়া, প্রত্যেকে তারা তার গিন্নিরই সূচনা। সত্যিকারের রোগা, ক্যাংটা তরুণীকে চেয়ে চেয়ে দেখতে এত ভালো লাগে রায়বাহাদুরের, এত তার ইচ্ছা করে টিপেটুপে ছেনেছুনে দেখতে সত্যিকারের কঙ্কালসার তরুণীকে!

কি করছ?—গিরীন বলে বউকে অনুযোগ দিয়ে, ওখানে শুইয়ে দাও। উনি পায়ের ধুলো ছোঁয়াবেন, আশীর্বাদ করবেন, ওষুধ দেবেন।

না। না। রায়বাহাদুর প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, আমি ওকে ওষুধ দিতে পারব না। ওর ভালো চিকিৎসা দরকার। ওকে তুমি ডাক্তার দেখাও, ভাল ডাক্তার দেখাও।

বিনা ফি-তে কোন্ ডাক্তার দেখবে বলুন? গিরীন যেন আমোদ পেয়ে মুচকে মুচকে হাসে।

ভয় করে রায়বাহাদুরের। মাথাটা আবার ঝিমঝিম করে ওঠে। কতক্ষণ খেলা করবে গিরীন তার সঙ্গে কে জানে, তারপর এই বর্বর নিষ্ঠুর খেলার শেষে কি করবে তাই বা কে জানে। এরা বিপ্লবী, এরা খুনে, এরা সব পারে। শশাঙ্কর জামাই বলে, তার স্কুলের একজন টিচার বলে বিশ্বাস করে একা একা এই ছদ্মবেশি, খুনের খপ্পরে এসে পড়ে কী বোকামিটাই সে করেছে।

সব অবস্থাতে যেভাবেই হোক নিজেকে বাঁচানোর কৌশল খুঁজে বার করে কাজে লাগানোর চেষ্টা রায়বাহাদুরের মজ্জাগত। রায়বাহাদুর মাথা হেঁট করে থাকে কয়েক মুহূর্ত, সশব্দে নিশ্বাস ত্যাগ করে। হাতের তালুতে মুছে নেয় নিজের কপাল। তারপর মুখ তুলে বলে, মা, খোকাকে শুইয়ে দাওগে। কিছু তুমি ভেবো না মা। বউমাই বলি তোমাকে, গিরীন আমার ছেলের মতো। তোমার কোন ভাবনা নেই বউমা, ছেলে তোমার ভাল হয়ে যাবে,আমি তোমার ছেলের চিকিৎসার ভার নিলাম। আমি এখুনি গিয়ে বোস ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

এখুনি যাবেন? তা হবে না, ফলটল একটু মুখে না দিয়ে গেলে বড় কষ্ট হবে আমাদের মনে। অকল্যাণ হবে আমাদের। আপনার মতো মানুষ বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—

গিরীনের বিনয়ে বুকটা ধড়াস ধড়াস করে রায়বাহাদুরের। অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পায়ের চকচকে জুতোর দিকে। অতি কষ্টে বলে, বেলা মন্দ হয়নি। নিমন্ত্রিতেরা আর কেউ—?

আজ্ঞে বলিনি আর কাউকে। ইচ্ছা ছিল বলবার, ভেবেছিলাম ওনার হাতের যে দু-গাছা চুড়ি আছে তার একটা বেচে দিয়ে কয়েকজনকে বলব, স্কুল মাস্টারের স্ত্রীর হাতে শাঁখা থাকলেই ঢের। তারপর ভাবলাম ছেলের মুখেভাতে শেষ সম্বলটুকু খোয়াব, তার চেয়ে বরং সম্বলটা থাক, ওমাসেও পুরো মাইনে না পেলে উপোসটা ঠেকানো যাবে।

বুড়ো হলেও বুদ্ধির ধার একেবারে পড়ে যায়নি রায়বাহাদুরের। জীবনে উঠতে গিয়ে মুশকিলে পড়তে হয়েছে অনেকবার, নিজে বুদ্ধি খাটিয়েই নিজের মুশকিল

আসান করেছে। আজকের বিপদের ধরনটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। এটাই হয়েছে ফ্যাসাদ। উদ্দেশ্যটা ধরতে পারছে না গিরীনের। নিজের দুর্দশা চোখে দেখিয়ে তার দয়া জাগাবার সাধ থাকলে চোখে এভাবে আঙুলের খোঁচা দিয়ে কি কেউ তা দেখায়, পাগল ছাড়া? তাকে বিরক্ত করে, চটিয়ে এমন টিটকারি দেওয়ার ভঙ্গিতে দেখায়, এমন উদ্ধত বিনয়ের সঙ্গে? কাল টিচারদের সভায় কিছু না বলে গিরীন যেন ঘাড় ধরে তাকে বাড়ি টেনে এনে বাস্তব প্রতিবাদ জানাচ্ছে তার বক্তৃতার, ব্যঙ্গ করছে তাকে। কিন্তু কেন করছে সেটা তো কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না রায়বাহাদুরের। তবে স্কুলের একজন টিচার কী এতবড় গাধা যে এই সহজ কথাটা বুঝতে পারে না, এভাবে তার কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ আদায় করা যায় না, এতে বরং তারই বিপদ, সমূহ বিপদ?

মুখের ভাবে গলার সুরে সহানুভূতি আনবার চেষ্টা করে রায়বাহাদুর বলে, তোমার অবস্থা এত খারাপ তা তো জানতাম না গিরীন। অ্যাপ্লিকেশন দিও, ও মাস থেকে দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব। তুমি ভালো পড়াও শুনেছি। আর বাকি মাইনেটাও বরং পাইয়ে দেব তোমায় সোমবার।

গিরীন ভয় পেয়ে হাত জোড় করে বলে, তা করবেন না স্যার। লোকে বলবে ছেলের মুখেভাতের ছলে আপনাকে বাড়িতে ডেকে খাতির করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছি, বাকি মাইনে আদায় করেছি। আমার সর্বনাশ করবেন না স্যার।

চোখের পলক পড়া আটকে যায় রায়বাহাদুরের, ঢোক গিলতে গিয়ে দেখে সেটাও আটকে গেছে। ঘরের যে অসীম দৈন্য ভিখারির সকরুণ আবেদনের মতো এতক্ষণ তাকে পীড়ন করছিল হঠাৎ যেন সেটা দাবিদারের শাসানির মতো ফুঁসে উঠেছে। উঠানে তিনটি উলঙ্গ ছেলেমেয়ে খেলা করছে ধুলোমাটি নিয়ে, খেলা যেন ছল ওদের, রায়বাহাদুরকে ওরা অবজ্ঞা জানাচ্ছে। ওঘরে জ্বরো ছেলেটার কান্না ঝিমিয়ে এসেছে—কিন্তু সেও যেন ভয় দেখালো রায়বাহাদুরকে, কান্না নিস্তেজ হয়ে আসা যেন ঘোষণা বাচ্চাটার যে কান্না সে চিরতরে থামিয়ে দেবে, সে মরবে, মরে দায়ী করে রেখে যাবে তাকে।

তাকে আরও শাসানো দরকার বলেই যেন গিরীনের পরিবারের আরও দুজন এবার আসরে নামে। প্রৌঢ়া একটি স্ত্রীলোক তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে একটি কুমারী মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে আসে।

দ্যাখ গিরীন, দ্যাখ, ধেড়ে মেয়ের কাণ্ড দ্যাখ। ডাল ধুতে দিয়েছি, লুকিয়ে কাঁচা ডাল চিবোচ্ছে।

গিরীনের মা থেমে যান, জিভ কাটেন। মেয়েটি পালিয়ে যায় হাত ছিনিয়ে নিয়ে। এক মুহূর্ত হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থেকে মা-ও সরে যান।

আমি এবার উঠি গিরীন।

একটু বসুন।

গিরীন বেরিয়ে যায়। গিরীন ফিরে আসবার একটু পরে সেই চুপিচুপি ডাল-খাওয়া মেয়েটি একটি রেকাবিতে দুটি সন্দেশ, একটি কলা, কয়েক টুকরা আপেল ও শশা নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে ঘরে আসে। বাঙালি গেরস্ত ঘরের হিসাবে বিয়ের বয়স তার পেরিয়ে গেছে অনেকদিন। মেয়েটি রোগা, পুষ্টির অভাবে সত্যিকারের রোগা। সত্যিকারের রোগা

মেয়ের দিকে তাকাবার মোহ কিন্তু তখনকার মতো কেটে গিয়েছিল রায়বাহাদুরের, নীরবে সে দু-এক টুকরো ফল মুখে দিতে থাকে।

বৈঠকখানা দিয়ে যাবার সময় চৌকির প্রান্তের জরাজীর্ণ মানুষটি কষ্টে চোখ মেলে তাকায়, রায়বাহাদুর এক নজর দেখেই তাড়াতাড়ি চলে যায় বাইরে।

সোমবার গিরীন নোটিশ পায়, বরখাস্তের। নোটিশ সে প্রত্যাশা করছিল। ক্ষমতা থাকলে ফাঁসির হুকুম দিত রায়বাহাদুর। কিন্তু একটা কথা জানে গিরীন। রায়বাহাদুর ভুলতে পারবে না, তার ভয় করবে। শিক্ষকদের দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করে শোনাতে গিয়ে একটু আটকে আটকে যাবে কথাগুলি, উচ্ছ্বাসটা হবে মন্দা। দয়া মায়া সহানুভূতিতে নয়, ভয়ে।

ছিনিয়ে খায়নি কেন

দলে দলে মরছে তবু ছিনিয়ে খায়নি। কেন জানেন বাবু?

একজন নয়, দশজন নয়, শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে বরবাদ হয়ে গেছে। ভিক্ষের জন্য হাত বাড়িয়েছে, ফেন চেয়ে কাতরেছে, কুত্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই করে ময়লার ভুর হাতড়েছে, কিন্তু ছিনিয়ে নেবার জন্য, কেড়ে নেবার জন্য হাত বাড়ায়নি। অথচ হাত বাড়ালেই পায়। দোকানে থরে থরে সাজানো রয়েছে খাবার, সামনে রাস্তায় ধন্না দিয়েছে ফেলে দেওয়া ঠোঙার রসটুকু, খাবারের কণাটুকু চাটবার জন্যে। হাটবাজারে রয়েছে ফলমূল তরিতরকারি, দোকানে আড়তে চাল ডাল তেল নুন, লুকানো গুদোমে চালের পাহাড়, বড়লোকের ভাঁড়ারে দশবিশ বছরের ফুড—ফুড কথাটা চালু হয়েছে বাবু আপনাদের কল্যাণে, ভোঁতকা গাঁয়ের হোঁতকা তাঁতিও জানে কথাটা আর কথাটার মানে। গরিবের মুখে না উঠে যে চালডাল তেলনুন গুদোম থেকে গুদোমে কেনাবেচা হয়ে চালান যায়, তাকে বলে ফুড। হাঁ, মাছ-মাংস দুধ-ঘিও ফুড বটে। দশটা জিনিসের দশটা নাম বলতে লিখতে কষ্ট হয় বলে আপনারা ফুড চালিয়েছেন, চেঁচিয়েছেন ফুড সমস্যার বিধান চাই। তা, অত কষ্টে কাজ কী ছিল। ফুড না বলে চাল বললেই হতো। শুধু চাল—কাঁড়া, আঁকাড়া, পোকায় ধরা, যেমন হোক চাল। মাছ-মাংস, দুধ-ঘি, তেল-নুন এসব দশটা জিনিস তো চায়নি যারা না খেয়ে মরেছে! শুধু দুটি চাল দিলে হতো তাদের, ফুডের জন্য মাথা না ঘামিয়ে। গাছে পাতা আছে, জঙ্গলে কচু আছে। তারা মরত না। রোজ দুটি আসেদ্ধ শুকনো চাল চিবিয়ে খেলেও মানুষ মরে না। আপনি মানবেন না, কিন্তু সত্যি মরে না বাবু। যত কেলিয়ে যাক, ধুকধুক প্রাণডা নিয়ে জীয়ন্ত থাকে।

চালার বাইরে খেতখামার আমজাম কাঠাল-ঘেরা খড়ো ঘরগুলিতে বেলাশেষের ছায়া গাঢ় হয়ে যাচ্ছিল সন্ধ্যায়। উবু হয়ে বসে আনমনে যোগী জোর টানে তামাকের ধোঁয়ায় বুক ভরে নিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়াটা বার করে দিতে থাকে। সামনেই টানছে তামাক, আড়াল খোঁজেনি, একটু পিছু ফিরে বা একটু ঘুরেও বসেনি। এটা লক্ষ করবার বিষয়। তামাক সেজে আগে অবশ্য আমাকেই বাড়িয়ে দিয়েছে ডান হাতে খেলো হুঁকোটা ধরে, বাঁ হাতে সেই হাতের কনুই ছুঁয়ে থেকে। জলহীন হুঁকোয় অত কড়া তামাকের তপ্ত ধোঁয়া টানবার ক্ষমতা প্রথম বয়সে ছিল, এখন আর পারি না। সিগারেট ধরিয়ে যোগীকেও একটা অফার করেছিলাম। মৃদু হেসে সিগারেটটা নিয়ে সে গুঁজেছিল কানে।

শুনেছিলাম সে নাকি নামকরা ডাকাত, তার নামে লোকে ভয়ে কাঁপে। যেরকম কল্পনা করেছিলাম, চেহারাটা মোটেই মেলেনি তার সঙ্গে। বেঁটেখাটো লোকটা, শরীরটা খুব শক্তই হবে, আর কিছুই নয়। বাবরি-ছাঁটা ঝাঁকড়া চুল পর্যন্ত নেই। জেলে হয়তো ছেঁটে দিয়ে থাকবে কদমছাঁটা করে, এখনও বড়ো হবার সময় পায়নি। এদেশের রণপা চড়া, লাঠি ঘুরিয়ে বুলেট ঠেকানো, নোটিশ দিয়ে ধনী জমিদারের বাড়ি ডাকাতি করতে যাওয়া, বড়লোকের

ওপর ভীষণ নিষ্ঠুর, গরীবের ওপর পরম দয়ালু, খেয়ালি, ধূর্ত, উদার, বিখ্যাত ডাকাতদের কাহিনিতে তাদের বিরাট দেহ আর অদ্ভুত অমানুষিক শক্তির কথা পড়েছি। যাদের ভীষণ আকৃতি দেখলেই লোকের দাঁতকপাটি লাগত, হুংকার শুনলে কয়েক মাইল তফাতে গর্ভপাত হতো স্ত্রীলোকের। বড়লোকের টাকা লুটে তারা গরিবকে বিলিয়ে দিত। দুর্ভিক্ষের সময় যোগী ডাকাতও নাকি মানুষ বাঁচাবার মহৎ কাজে নেমেছিল। সেবাও করত পথেঘাটে মুমূর্ষুর, সুযোগ মতো চুরি ডাকাতি করে খাদ্য জুটিয়ে বিলিয়ে দিত। কয়েকটা মেয়েকে ক্রেতার কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাঁচিয়েছে শোনা যায়। সাতকোশী খালে সরকারি চালের নৌকায় ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে দু-বছর জেল হয় তার।

যোগী কথার সূত্র হারিয়ে ফেলেছে বুঝে মনে করিয়ে দিলাম, মরছে তবু ছিনিয়ে খায়নি কেন—যে কথা বলছিলে।

ও, হ্যাঁ বাবু হ্যাঁ। আমি জানি কেন ছিনিয়ে খায়নি, শুধু আমি, একমাত্তর আমিই জানি। কেউ জানে না আর। আপনার মতো অনেক বাবুকে শুধিয়েছি, তারা সবাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এটা সেটা বলেন, বড়ো বড়ো কথা। আবোলতাবোল লম্বা চওড়া কথা। আসল ব্যাপারে সেরেফ ফাঁক! বোঝেন না কিছু, জানেন না কিছু, বলবেন কী! এক বাবু বললেন, বেশিরভাগ তো গরিব চাষি, নিরীহ গোবেচারা লোক, কোনোকালে বেআইনি কাজ করেনি। লুট করে কেড়ে নিয়ে খাবার কথা ওরা ভাবতেও পারে না। শুনলে গা জ্বলে না বাবু? সাধ যায় না চাঁছা গালে একটা থাপড় দিয়ে কানডা মলে দিতে? বেআইনি কাজ, বেআইনি! যে জানে মরে যাবে কেড়ে না খেলে, সে হিসেব করেছে কাজটা আইনি না বেআইনি, ছিনিয়ে খেলে তাকে পুলিশ ধরবে, তার জেল হবে। জেলে যেতে পারলে তো ভাগ্যি ছিল তার। মেয়ে বউকে ভাড়া দিচ্ছে, বেচে দিচ্ছে, সুযোগ পেলে তার চেয়ে কমজোরি মরো-মরো সাথির গলা টিপে মেরে ফেলছে যদি একমুঠো খুদ জোটে, তার কাছে আইন! আরেক বাবু বললেন, ওটা কী জানো যোগী, ওরা সব মুখ্যু গরিব, চাষাভুসো মানুষ, অদেষ্ট মানে। না খেয়ে মরতে হবে, বিধাতার এই বিধান, উপায় কী—এই ভেবে মরেছে না খেয়ে, লুটেপুটে খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেনি। শুনেছেন বাবু কথা, আঁত-জ্বালানি পণ্ডিতি কথা? সাপে কাটে, রোগে ধরে, আগুন লাগে, বন্যা হয়, আকাল আসে—সব অদেষ্ট বটেই তো, কে না জানে সেটা? তাই বলে সাপে কাটলে বাঁধন আঁটে না, ওঝা ডাকে না? রোগে বড়ি-পাঁচন, শিকড়-পাতা খায় না, মানত করে না? ঘরে আগুন লাগলে দাওয়ায় বসে তামুক টানে? ফসল বাঁচাতে যায় না বন্যা এলে? আকাল অদেষ্ট বলে কেউ ঘরে বসে হাত-পা গুটিয়ে মরেছে একজন কেউ ওদের? যা কিছু আছে বেচে দেয়নি বাঁচার জন্যে, ছেলেমেয়ে, বউ, বোন শুদ্ধ! ছুটে যায়নি শহরে, বাবুদের রিলিফখানায়? অদেষ্ট মানে, হ্যাঁ, অদেষ্টে মরণ থাকলে মরবে জানে, হ্যাঁ, তাই বলে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচতে পারলে চেষ্টা করে দেখবে না একবারটি? আরেক বাবু বললেন—

বাবুরা কী বলেন জানি যোগী। তোমার কথা বলো।

শোনেন না বাবু মজার কথা, হাসি পাবে শুনলে। বললেন কি? না, আধপেটা খাওয়া, উপোস দেয়া ওদের চিরকেলে অভ্যাস। ঘটিবাটি, জমিজমা তো চিরজন্মোই বেচে আসছে

পেটের জন্যে। আকাল তো ওদের লেগেই আছে বছর বছর। বলতে বলতে গলা সত্যি ধরে এসেছিল তেনার, দুঃখীর তরে দরদ ছিল বাবুর। নাক ঝেড়ে, গলা খাঁকরে তারপর বললেন, বড়ো আকাল এল, ওরাও এইভাবে লড়াই করলো বাঁচতে, চিরকাল যেমন করে এসেছে, ঘরে ভাত না থাকলে যা করা ওদের অভ্যেস! আমি বললাম, তা নয় বুঝলাম বাবু, না খাওয়াটা ওদের অভ্যেস ছিল। কিন্তু মরাটাও কি অভ্যেস ছিল বাবু?

যোগী হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়ে! বুঝতে পারি অনেকবার অনেককে শোনালেও এই পুরানো মর্মান্তিক রসিকতার রস তার কাছে জলো হয়নি।

বললাম, ধরুন একটা দোকান, তাতে কিছু চাল আছে। লোক মোটে দুটো কী তিনটে দোকানে। সাতদিন উপোস দিয়ে আছে এক কুড়ি দেড় কুড়ি লোক, জানে যে চাল কটা পেলে বাঁচবে নয়তো মিত্যু নির্য্যস। অত সব নয় নাই জানলো, পেটে তো খিদে ডাকছে। হানা দিয়ে চাল কটা ছিনিয়ে নিলে ঠেকাবার কেউ নেই। তা না করে ফেউ ফেউ করে শুধু ভিক্ষে চাইল কেন ওরা? দোকানি দূর দূর করে খেদিয়ে দিতে আবার গেল কেন অন্য জায়গায় ভিক্ষে চাইতে? এমন কত দেখেছি, সহজে ছিনিয়ে নেবার খাসা সুযোগ কিন্তু ছিনিয়ে না নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে দয়া চেয়েছে, না পেয়ে মরেছে। বাবু আমতা আমতা করে একটা জবাব দিলেন। সেই অভ্যেসের কথা, দশজন মিলে দল বেঁধে লুঠ করতে কী ওরা জানতো, না কথাটা ভাবতে পেরেছে, খুদকুঁড়ো নিয়ে বরং মারামারিই করেছে নিজেদের মধ্যে। আসল কথাটার জবাব নেই। জানলে তো বলবেন? জবাবটা জানি আমি। শুধু আমি। আর কেউ জানে না। তবে বলি শুনুন।

ডাকতেছ?

ঘরের ভিতরে অন্ধকার হয়ে এসেছে, একটি প্রদীপ জ্বলতে সেদিকে নজর পড়েছিল। প্রদীপটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো কালোপেড়ে কোরা শাড়ি পরা ঢ্যাঙা একটি যুবতি। মনে হল যোগীর উদ্ধার করা মেয়েদের একজন নয় তো? তারপরেই খেয়াল হল, যোগী প্রায় দুবছর জেলে কাটিয়ে মোটে মাস তিন চারেক আগে জেল থেকে বেরিয়েছে।

তামাক দে।

প্রদীপটা চৌকাটে বসিয়ে দিয়ে সে তামাক সাজতে গেল।

আমার পরিবার—যোগী বলল, হারিয়ে গেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে একমাস দেড়মাস ধরে খুঁজে খুঁজে বার করেছি সদরে।

ব্যাপারটার ইঙ্গিত বুঝে চুপ করে রইলাম। বাইরে দিনের আলো নিভে গিয়ে প্রায় গোটা চাঁদটার জ্যোৎস্না তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যা বলছিলাম বাবু। সর্বোনাশা দিনগুলির কথা জানেন তো সব, নিজের চোখে দেখেছেন সব আপনাকে বলতে হবে না বন্ননা করে। আমি তখন হকচকিয়ে গেছি। না খেয়ে লোক পাপে মাটি মরছে দেখে মনে বড়ো কষ্ট। আর গায়ে বড়ো জ্বালা, ভীষণ জ্বালা, সা' জোতদার, নন্দ আড়তদার, সরকারি কত্তা করিম সাহেব, পুলিনবাবু—এদের কাণ্ডকারখানা দেখে এলাম। কোলকাতা গিয়ে পর্যন্ত কাটিয়ে এলাম সাতদিন, সাতদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে। বুঝি না ব্যাপারটা কিছু, যত ভাবি মাথা গুলিয়ে যায়, অন্নের তো অভাব কিছু নেই, এত লোক মরে কেন ছিনিয়ে না খেয়ে? গরু

ছাগল তো মাঠে ঘাস না পেলে খেতে ঢোকে. মার খেয়ে নড়তে চায় না সহজে, বাগানে ফুলগাছ খায়, ঘরের চালা থেকে খড় টেনে নেয়। এগুলো মানুষ হয়ে করছে কী? ধান চাল লুঠ করি দু-এক জাগায়, বিলিয়ে দি এদিক ওদিক, মন মানে না। একা আমি দু-চারজনকে নিয়ে নিয়ে লুটেপুটে কটাকে খাওয়াবো? বাঁধা দল আমার ছিল না বাবু কোনোকালে, পেশাদার ডাকাত আমি নইকো, যাই বলুক লোকে আর পুলিশে আমার নামে অকথা কুকথা। আপনার কাছে লুকোবো না, মাঝে মাঝে দল গড়ে হানা দিয়ে লুঠ করেছি টাকাপয়সা, গয়নাগাটি, মারধোর করেছি, কিন্তু মানুষ একটা মারি নি বাপের জম্মে, বাপ যদি জম্মো দিয়ে থাকে মোকে। কাজ ফতে করে দল ভেঙে দিয়েছি ফের। টাকা পয়সার বদলিতে ধানচাল লুটের জন্য দল একটা গড়তে চাইলাম, স্যাঙাতেরা কেউ স্বীকার পেল না দুজন ছাড়া। ডাকাতি করব সোনাদানার বদলে ধানচালের জন্যে, তাও আবার বিলিয়ে দেব, শুনে ওরা ভাবল হয় মাথাটা মোর বিগড়ে গেছে একদম, নয় তামাশা করছি ওদের সাথে। দুজন যারা এল, তারা ছোকরা বয়সি, ওস্তাদ বলে মোকে মানত। দুজনকে নিয়ে মোটা দাঁও কি মারব বলুন, ছুঁকছাঁক দু-দশ মণ আলতো পেলে কেড়ে নি, বিলোতে গিয়ে শুরু করতে না করতে ফুরিয়ে যায়। দেশ জুড়ে সবার পেটের চামড়া চামচিকে, কজনকে দেব আমি? ভাবলাম দুত্তোর! এ শখের কের্দানি দেখিয়ে আর কাজ নেই। মোর দুমুঠো বালির বাঁধে কি এই মড়কের বন্যা ঠেকানো যাবে? তার চেয়ে এক কাজ যদি করি তবে হয়তো ফল হবে কিছুটা। না খেয়ে মরছে যারা তাদের শেখাতে হবে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচতে। নিজের পেট ভরাবার ব্যবস্থা নিজে যদি না ওরা করতে পারে আমার গরজ! না, কী বলেন বাবু?

সদরের মন্দ বস্তি থেকে খুঁজে উদ্ধার করে আনা যোগীর পরিবার ফুঁ দিতে দিতে কলকে এনে দেয়। কলকের আগুনে লালিয়ে লালিয়ে ওঠা তার ভোঁতা লম্বাটে মুখে মন্দ মেয়ের বস্তির জীবনের কোন ছাপ চোখে পড়ে না, বরং শান্ত নিশ্চিন্ত নির্ভর খুঁজে পাই।

সেই থেকে বসে আছেন, যোগী বলে কলকেটা হুঁকোয় বসিয়ে, তার পরিবার দাঁড়িয়ে থাকে কথা শেষ হবার অপেক্ষায়, একটু চা দিয়ে যে ভদ্রস্থতা করব তার ব্যবস্থা নেই গরীবের ঘরে। দুটো চিড়ের মোয়া খাবেন বাবু, নতুন গুড়ের টাটকা মোয়া?

ভদ্র অতিথিকে নিয়ে তার বিপন্নভাব অনুভব করে বলি, খাব না? এতক্ষণ বলতে হয়! জোর খিদে পেয়েছে, আমি ভাবছি কি ব্যাপার, মুড়ি চিঁড়ে কিছু কি ঘরে নেই যোগীর, খেতে বলছে না! যোগীর পরিবারের হাসিটা আধা আধা দেখতে পাই প্রদীপের আলোয়।

সদরে রিলিফখানা খুলেছে, খিচুড়ি বিলি করে। সটান গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। সেজেগুজে গেলাম, ছেঁড়া নেংটি পরে, উদলা গায়ে মোচ-দাড়ি না কামিয়ে। তবু অন্নের অভাব তো ভোগ করিনি একটা দিন দুচার বছরের মধ্যে, ওসব কাঁকলাসের সাথে কি মিশ খায় মোর! আড়চোখে আড়চোখে তাকায় সবাই, ভাবে যে এ আবার কোত্থেকে এল। ঝোলের মতো ট্যাকটেকে পাতলা খিচুড়ি যে বিলোয় সে ব্যাটাচ্ছেলে মোকে দেখলেই বলে, হারামজাদা তুই এখানে কেন, খেটে খাবি যা! মেয়েছেলে দু-একটা দেখেশুনে ভাব জমাতে চেষ্টা করে মোর সাথে, ভাবে যে মোর বুঝি সংগতি আছে অন্তত দু-চারবেলা খাবার—চুপি চুপি শার্ট গায়ে দিয়ে ধুতি পরে শহর চুঁড়তে বেরুবার সময় হয়তো বা দেখে ফেলতে পারে।

কান্না পেত বাবু মেয়েছেলে ক-টার রকম দেখে। মেয়েছেলে! হাড়ে জড়ানো সিঁটে চামড়া, তাতে ঘা প্যাঁচড়া। আধ-ওঠা চুলের জট খ্যাপার মতো চুলকোচ্ছে উকুনের কামড়ে। মাই বলতে লবঙ্গের মতো শুকনো বোঁটা, পাছা বলতে লাঠির ডগার মতো খোঁচানো হাড্ডি। আর কী দুর্গন্ধ গায়ে, পচা ইঁদুর, মরা সাপের মতো। তাদের চেষ্টা পুরুষের মন ভুলিয়ে একটা বেলা একটু খাওয়া জোগাড় করা পেট ভরে!

যোগী গুম খেয়ে থাকে যতক্ষণ না তার পরিবার ডালায় আট-দশটা চিঁড়ার মোয়া আর ছোটোখাটো নৈবিদ্যের মতো নারকেল নাড়ু সাজিয়ে এনে আমার সামনে ধরে। পরিবারটিও তার রোগা ঢ্যাঙা ছিপছিপে—তবে সুস্থ। কোরা কাপড়ের ভাঁজে ছোটো নিটোল মাই, আবার সন্তান আসতে চাইলে যা সুধায় ভরে উঠবে অনায়াসে।

মারাত্মক গুম খাওয়া ভাবটা কেটে যায় যোগীর ওর দিকে তাকিয়েই।

বলে, বাবুকে কি রাক্ষস ঠাওরালি নাকি, অ্যাঁ? দুটো মোয়া, দুটো নাড়ু রেখে তুলে নিয়ে যা সব। গেলাস নেই তো কি হবে, ঘটিটা মাজা আছে, টিউবওয়েলের জলের কলসি থেকে জল এনে দে ঘটিতে। একটু থেমে বিনয়ের সুরে হঠাৎ অন্য একটা কৈফিয়ত সে বলে তার পরিবারকে, মাছ আর আজ আনা হল না, বিন্দি।

মাছের তরে মরছি! বিন্দি এতক্ষণে এবার প্রথম মুখ খোলে ঝংকার দিয়ে।

সবাইকে বলি, ছিনিয়ে নিয়ে খাও না? এসো, আমরা সবাই মিলে ছিনিয়ে নিয়ে খাই। ব্যাপার বুঝছো তো, মোদের খিচুড়িভোগের জন্যে যে চাল ডাল আসে তাও বেশিরভাগ চোরাগোপ্তা হয়ে যায়, নইলে খিচুড়ি এমন নুন জলের মতো লাগে? এমনিও মরব, ওমনিও মরব, এসো বাঁচার তরে লড়াই করে মরি। কত্তারা ভোজ খাবেন, মোরা না খেয়ে মরব! কেড়ে খাই এসো। এমনিভাবে কত করে কতরকমে বুঝিয়ে বলি, কেউ যেন কান দেয় না কথায়। কান দেয় না ঠিক নয়, কানে যেন যায় না কথা। ঝিমোতে ঝিমোতে বলে, অ্যাঁ, অ্যাঁ, কি বলছিলে? বলে আবার ঝিমোয়। জলো খিচুড়ি এক চুমুকে খাবার খানিক পরে যদি বা কেউ কেউ একটু উৎসাহ দেখায়, একটু জ্বালা জানায় যে সত্যি এত অন্ন থাকতে তারা না খেয়ে মরবে এ ভারী অন্যায়—বিকালে তারা নিঝুম হয়ে যায়। রিলিফখানায় সারি দিতে আগুপিছু নিয়ে কামড়াকামড়ি করে, ছোটো এক মগ সেদ্ধ চালডালের ঝোলের জন্যে—ছিনিয়ে নিয়ে পেট ভরে ডালভাত খাবার জন্যে কারও উৎসাহ দেখি না।

একদিন খপর পেলাম, রিলিফখানার জন্যে মোটামতো সরকারি চালান আরেকটা এয়েছে এ্যাদ্দিন পরে, সাতদিন কেন পুরো আধ-মাস সত্যিকারের ঘন খিচুড়ি বিলোনো চলবে। কিন্তু দেখেশুনে তখন অভিজ্ঞতা জন্মে গেছে বাবু। যত চালান আসুক, একটা দিনের বিলানো খিচুড়িও সত্যিকারের খিচুড়ি হবে না, চাল ডাল বেশিরভাগ চলে যাবে চোরাবাজারে। সদরে জানাচেনা লোক ছিল কটা। মানে আর কি, আপনার কাছে ঢাকঢাক গুড়গুড় করব না, শহরের চোর, ছ্যাঁচড়, গুণ্ডা, বজ্জাত, চোরাগোপ্তা ছোরামারাগোছের লোকের সর্দার কজন আর কি? ওপরওলাদের সাথে খাতির ছিল ওদের, ওদের ছাড়া চলে না সরকারি বে-সরকারি বড়কত্তাদের চোরাকারবার। ওদের একজন একটা ব্যাপারে সাথে ছিল মোর কবছর আগে, বড় বাঁচান বাঁচিয়েছিলাম দু-দশ বছরের জেল থেকে। একটু খাতির

করল, খানিকটা মাত্তর। ওর মারফতে আর দু-চারজনকে জড়ো করে, তারাও চিনত জানত মোকে, চাল চেলে, ভাঁওতা মেরে কাণ্ড করিয়ে দিলাম একটা রেলের ইস্টিশানে। চাদ্দিকে হইচই পড়ে গেল। চালানি চাল ডাল সব গেল রিলিফখানার গুদামে, শেষ বস্তাটাও!

বললে না পিত্যয় যাবেন বাবু, পুরো চারটে দিন ঘন খিচুড়ির সাথে একটা করে আলু সেদ্ধ খেল ভিখিরির দলকে দল সবাই! আদ্দেক লোককে দিতে না দিতে ফুরিয়ে গেল না খিচুড়ি, কেউ বলল না ধমক দিয়ে, ওবেলা আসিস, এখন ভাগ শালার ব্যাটা শালা। আর— এটাই আসল কথা, মন দিয়ে শোনেন বাবু। ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচবার কথা যারা কেউ কানে তোলেনি, দুটো দিন দুবেলা এক মগ ঘন চাল ডাল আর একটা করে আলুসেদ্ধ খেয়ে সকলে কান পেতে শুনতে লাগল আমার কথা, সায় দিতে লাগল যে এই ঠিক, এ ছাড়া বাঁচবার উপায় নেই। মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বজ্জাতরা, কেড়ে নিতে হবে সব, পেট পুরে খেয়ে বাঁচতে হবে দু-বেলা। আমি যা বলি, সবাই সায় দিয়ে তাই বলে। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারি না, মাথা গুলিয়ে যায়। পরদিন যেন উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। পরের দিন তাদেরই কজন নিজে থেকে আমার কাছে এসে বলে যে তারা গুদোম থেকে চাল ডাল ছিনিয়ে নিতে রাজি, নিজেরা রেঁধেবেড়ে খাবে। আমি অ্যাদ্দিন জপাচ্ছি তাদের, আমাকে ঠিকঠাক করে চালাতে হবে কখন কীভাবে কোথায় কী করতে হবে, গুদোম থেকে মালপত্তর সব লুটপাট করে নিতে হলে।

কী বোকামিটাই করলাম সেদিন বাবু। ভাবলাম কি, এমন আবোলতাবোল ভাবে নয়, মাঝে মাঝে তিন বন্দুকওলা জমিদারের বাড়ি হানা দেবার আগে যেমনভাবে দল গড়েছি শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম দিয়ে তেমনিভাবে এদের গড়ে তুলব টাকা পয়সা লুটতে নয়, ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচবার কায়দা। এই না ভেবে পিছিয়ে দিলাম সবাইকে নিয়ে যাওয়াটা কদিনের জন্য। রাতারাতি মিলিটারি লরিতে চালান হয়ে গেল রিলিফখানার গুদোমের আদ্দেক মাল। পরদিন সেই রং করা জলো খিচুড়ি।

তাতে যেন জোর বেড়েছে মনে হল সকলের দল বেঁধে ছিনিয়ে খাওয়ার সাধটার। মোকে ঘিরে ধরে শ-দেড়েক মাগিমদ্দ বলতে লাগল, চলো না যাই ছিনিয়ে আনি ধানচাল। বাচ্চাগুলো পর্যন্ত তড়পাতে লাগল।

বৈকুণ্ঠ সা-র গুদোমে কম করে তিন হাজার মন চাল আছে জানতাম। চালান দেবার ব্যাপারে কত্তাদের সাথে ভাগবাঁটোয়ারায় মীমাংসা না হওয়ায় ব্যাটার গুদোমে মাল শুধু জমছিল মাসখানেক। গুদোমটার হদিশ-টদিশ নিয়ে কালক্ষণ সুযোগ ঠাহর করতে দুটো দিন কেটে গেল। যখন বললাম কীভাবে কী মতলব করেছি সা'র গুদোমের জমানো অন্ন ছিনিয়ে নেবার, তেমন যেন সাড়া এল না সবার কাছ থেকে। শুধু তাদের নয়, চাদ্দিকের কম করে হাজারটা ভুখা মেয়ে, পুরুষ, বাচ্চাকাচ্চাদের বাঁচবার উপায় হবে বললাম, সায় এলো কেমন মনমরা ঝিমোনো মতন।

পরদিন কেউ যেন কান দিল না আমার কথায়! জলো খিচুড়ি বাগাবার ভাবনায় সবাই যেন ফের আবার মশগুল হয়ে গেছে, আর কিছু ভাববার ক্ষেমতা নেই, মন নেই!

সেদিন বুঝলাম বাবু কেন এতলোক না খেয়ে মরেছে, এত খাবার হাতের কাছে থাকতে ছিনিয়ে খায়নি কেন। একদিন খেতে না পেলে শরীরটা শুধু শুকোয় না, লড়াই করে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার তাগিদও ঝিমিয়ে যায়। দু-চারদিন একটু কিছু খেতে পেলেই সেটা ফের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দুদিন খেতে না পেলে ফের ঝিমিয়ে যায়। তা এতে আশ্চর্য কি। এ তো সহজ সোজা কথা! কেউ বোঝে না কেন তাই ভাবি। শাস্তরে বলেনি বাবু, অন্ন হলো প্রাণ? খেতে না পেলে গরু দুধ দেয়, না বলদ জমি চষে? কয়লা না খেয়ে ইঞ্জিন গাড়ি টানে? মহাভারতের সেই মুনির কথা আছে। না খেয়ে না খেয়ে তপ করেন, একদিন দ্যাখেন কি, গর্তের মুখে পুতুল-মতো জ্যান্ত জ্যান্ত মানুষ ঝুলছে ঘাসের শিকড় ধরে, শিকড়গুলি দাঁতে কাটছে ইঁদুর। মুনি বললে, করছ কি তোমরা সব, ইঁদুরে শিকড় কাটছে দেখছ না, গর্তে পড়বে যে ধপাস করে? খুদে খুদে লোকগুলি বললে, বাপু মোরা তোমার পূর্বপুরুষ। বংশে শুধু তুমি আছ। তুমি হলে এই শিকড়টা, যা ধরে মোরা ঝুলছি, হা দ্যাখো—নীচে নরক। শিকড় যিনি কাটছেন চোখা ধারালো দাঁত দিয়ে, তিনি হলেন ধম্মোমশায়। বিয়ে কর, পুত্তুর জন্মাও, মোদের বাঁচাও নরক থেকে। মুনি ভড়কে গিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে করলে এক রাজার মেয়েকে, রাজভোগ খেয়ে পুষ্টু মেয়ে, চটপট ছেলে হবে, পূর্বপুরুষ উদ্ধার পাবে। বছর কাটে দুটো-তিনটে, গব্‌ভো হয় না রাজার মেয়ের। মুনি চটে বলে, একি কাণ্ড বল তো বউ, তুমি বাঁজা নাকি? রাজার মেয়ে বলে ঝংকার দিয়ে, নজ্জা করে না বলতে? উপোস করে শুকনো কাঠি হয়ে উনি বনে গিয়ে তপস্যা করবেন, এক রাত্তির খেতে শুতে বসবাস করতে পারবেন না বিয়ে করা বউয়ের সাথে, ফের বলবেন যে ছেলে হয় না কেন, বউ তুমি বাঁজা নাকি! নজ্জা করে না? না খেয়ে না খেয়ে নিজে বাঁজা হয়েছো। শক্তি নেই, খোমতা নেই, বউকে বাঁজা বলতে নজ্জা করে না? কথার মানে বুঝে, তপস্যা করে যে সোজা কথা বোঝে নি, সেটা চট করে বুঝে নিয়ে মুনিঠাকুর তাড়াতাড়ি গিয়ে বিত্তি চায় রাজার কাছে। দুধ-ঘি, লুচি-মাংস, পোলাও-কালিয়া খায় পেট ভরে যত খেতে পারে। বললে না পিত্যয় যাবেন বাবু, এক বছরে ছেলে বিয়োয় মুনির বউ—

রাত হয়নি? যেতে হবে না বাবুকে দেড়কোশ পথ? যোগী ডাকাতের পরিবার এসে বলে।

মনে হয়, সত্য কী মিথ্যা জানি না, মেয়েটার গড়ন এমন রোগাটে ছিপছিপে বলেই বোধহয় আগামী মাতৃত্ব এতখানি স্পষ্ট হয়েছে। মনে-হয় তিন-চার মাসের মধ্যে যোগী ডাকাতকে সে ছেলে বা মেয়ের বাপ করবেই। জ্যোৎস্নায় গেঁয়োপথে চার মাইল দূরের স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবি, যোগী কি এতোই বোকা, সে এত জানে আর এই সহজ সত্যটা জানে না, খুব কম করেও ক-টা মাস অন্তত লাগে মেয়েমানুষের মা হয়ে ছেলে বা মেয়ে বিয়োতে?

আমার দেশের মাটিতে আমি সমান তালে চলতে পারি না যোগীর সাথে। আলের বাঁকে হোঁচট খাই, কাটাধানের গোড়ার খোঁচায় ব্যথা পাই, কাঁচামাটির রাস্তায় উঠতে দেড় হাত নালায় পড়তে যাই। যোগী সামলে-সুমলে টেনে নিয়ে চলে আমায়। তার মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারি আমার হিসাবনিকাশ বিশ্লেষণের ভুল। যোগী ডাকাত মহাভারতের সেই মুনি নয়। স্বর্গ নরক তার কল্পনায় আছে কি নেই সন্দেহ। বংশ রক্ষায় সে মোটেই ব্যগ্র নয়। ইংরেজের জেল থেকে ছাড়া

পেয়ে খুঁজে খুঁজে মন্দ বস্তি থেকে হারানো বউকে ফিরিয়ে এনে সে আজ শুধু এই কারণে অখুশি হতে নারাজ যে বউ তার যে ছেলে বা মেয়ের মা হবে সে তার জন্মদাতা নয়। সে বাপ হবে তার পরিবারের বাচ্চার, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক সেটা। আজেবাজে খেয়ালে—যেসব খেয়াল তাদেরই মানায়, তাদেরই ফ্যাসান, যারা ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার প্রবৃত্তিটা পর্যন্ত কেঁচে দিয়ে মারতে পারে লাখে লাখে মা বাপ ছেলে মেয়ে—অনর্থক অখুশি হতে রাজি নয় মানুষ।

তার পরিবার খেতে না পেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল তো? যেভাবে পারে খেতে পেয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছে তো! তারপর আর কোনো কথা আছে?

হারানের নাতজামাই

মাঝরাতে পুলিশ গাঁয়ে হানা দিল। সঙ্গে জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতি। কয়েকজন লেঠেল।

কনকনে শীতের রাত। বিরাম বিশ্রাম ছেঁটে ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে তিনটি দিনরাত্রি একটানা ধানকাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পালা করে জেগে ঘরে ঘরে ঘাঁটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। শাঁখ আর উলুধ্বনিতে আকস্মিক আবির্ভাব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল গ্রামের কাছাকাছি পুলিশের আবির্ভাবের। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সমস্ত গাঁ ঘিরে ফেলবার আয়োজন করলে হারানের ঘর থেকে ভুবন মণ্ডল সরে পড়তে পারত, উধাও হয়ে যেত। গাঁ সুদ্ধ লোক যাকে আড়াল করে রাখতে চায়, হঠাৎ হানা দিয়েও পুলিস সহজে তার পাত্তা পায় না। দেড়মাস চেষ্টা করে পারেনি, ভুবন এ গাঁ ও গাঁ করে বেড়াচ্ছে যখন খুশি।

কিন্তু গ্রাম ঘেরবার, আটঘাট বেঁধে বসবার কোন চেষ্টাই পুলিশ আজ করল না। সটান গিয়ে ঘিরে ফেলল ছোটহাঁসতলা পাড়াটুকুর ক-খানা ঘর, যার মধ্যে একটি ঘর হারানের। বোঝা গেল আটঘাট আগে থেকে বাঁধাই ছিল।

ভেতরের খবর পেয়ে এসেছে।

খবর পেয়ে এসেছে মানেই খবর দিয়েছে কেউ। আজ বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে, হঠাৎ সন্ধ্যার পরে তাকে অতিথি করে ঘরে নিয়ে গেছে হারানের মেয়ে ময়নার মা, তার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল না কোন পাড়ায় কার ঘরে সে থাকবে। খবর তবে গেছে ভুবন হারানের ঘরে যাবার পরে! এমনও কি কেউ আছে তাদের এ গাঁয়ে? শীতের তেভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষিদের, জানা যাবে সাঁঝের পর কে গাঁ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল। জানা যাবেই, এ বজ্জাতি গোপন থাকবে না!

দাঁতে দাঁত ঘষে গফুরালি বলে, দেইখা লমু কোন্ হালা পিঁপড়ার পাখা উঠছে। দেইখা লমু।

ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না সালিগঞ্জ গাঁ থেকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে ভুবন এতদিন গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্টকে কলা দেখিয়ে, কোনও গাঁয়ে সে ধরা পড়েনি। সালিগঞ্জ থেকে তাকে পুলিশ নিয়ে যাবে? তাদের গাঁয়ের এ কলঙ্ক তারা সইবে না। ধান দেবে না বলে কবুল করেছে জান, সে জানটা দেবে এই আপনজনটার জন্যে।

শীতে আর ঘুমে অবশপ্রায় দেহগুলি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। লাঠি সড়কি দা কুড়ুল বাগিয়ে চাষিরা দল বাঁধতে থাকে। সালিগঞ্জে মাঝরাতে আজ দেখা দেয় সাংঘাতিক সম্ভাবনা!

গোটা আষ্টেক মশাল পুলিশ সঙ্গে এনেছিল, তিন-চারটে টর্চ। হাঁসখালি পাড়া ঘিরতে ঘিরতে দপদপ করে মশালগুলি তারা জ্বেলে নেয়। দেখা যায় সব সশস্ত্র পুলিশ, কানাই ও শ্রীপতির হাতেও দেশি বন্দুক।

পাড়াটা চিনলেও কানাই বা শ্রীপতি হারানের বাড়িটা ঠিক চিনত না।

সামনে রাখালের ঘর পেয়ে ঝাঁপ ভেঙে তাকে বাইরে আনিয়ে রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথকে তাই জিজ্ঞেস করতে হয়, হারান দাসের কোন বাড়ি?

তার পাশের বাড়ির হারান ছাড়াও যেন কয়েক গণ্ডা হারান আছে গাঁয়ে। বোকার মতো রাখাল পালটা প্রশ্ন করে, আজ্ঞা কোন্ হারান দাসের কথা কন?

গালে একটা চাপড় খেয়েই এমন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রাখাল, দম আটকে আটকে এমন সে ঘনঘন উকি তুলতে থাকে যে তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাই অনর্থক হয়ে যায় তখনকার মতো। বোবা হাবা চাষাগুলো শুধু বেপরোয়া নয়, একেবারে তুখোড় হয়ে উঠেছে চালাকিবাজিতে।

এদিকে হারান বলে, হায় ভগবান।

ময়নার মা বলে, তুমি উঠলা কেন কও দিকি?

বলে কিন্তু জানে যে তার কথা কানে যায়নি বুড়োর। চোখে যেমন কম দেখে কানেও তেমনি কম শোনে হারান। কি হয়েছে ভাল বুঝতেও বোধ হয় পারেনি, শুধু বাইরে একটা গণ্ডগোল টের পেয়ে ভড়কে গিয়েছে। ছেলে আর মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে চটপট, এই বুড়োকে বোঝাতে গেলে এত জোরে চেঁচাতে হবে যে প্রত্যেকটি কথা কানে পৌছোবে বাইরে যারা বেড় দিয়েছে। দু-এক দণ্ড চেঁচালেই যে বুঝবে হারান তাও নয়, তার ভোঁতা ঢিমে মাথায় অত সহজে কোন কথা ঢোকে না। এই বুড়োর জন্য না ফাঁস হয়ে যায় সব!

ভুবনকে বলে ময়নার মা, বুড়া বাপটার তরে ভাবনা!

ভুবন বলে, মোর কিন্তু হাসি পায় ময়নার মা।

ময়নার মা গম্ভীর মুখে বলে, হাসির কথা না। গুলিও করতে পারে। দেখন মাত্তর। কইবো হাঙ্গামা করছিলেন।

তাড়াতাড়ি একটা কুপি জ্বালে ময়নার মা। হারানকে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙুলের ইশারায় তাকে মুখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে। তারপর কুপির আলোয় মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিদারুণ আপশোশে ফুঁসে ওঠে, আঃ! ভালো শাড়িখান পরতে পারলি না?

বলছ নাকি? ময়না বলে।

ময়নার মা নিজেই টিনের তোরঙ্গের ডালাটা প্রায় মুচড়ে ভেঙে তাঁতের রঙিন শাড়িখানা বার করে। ময়নার পরনের ছেঁড়া কাপড়খানা তার গা থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এলোমেলোভাবে জড়িয়ে দেয় রঙিন শাড়িটি।

বলে, ঘোমটা দিবি। লাজ দেখাবি। জামায়ের কাছে যেমন দেখাস। ভুবনকে বলে, ভাল কথা, শোনেন, আপনার নাম হইল জগমোহন, বাপের নাম সাতকড়ি, বাড়ি হাতিনাড়া, থানা গৌরপুর—

নতুন এক কোলাহল কানে আসে ময়নার মার। কান খাড়া করে সে শোনে। কুপির আলোতেও টের পাওয়া যায় প্রৌঢ় বয়সের শুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখদুর্দশার ছাপ ও রেখা কি রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে। ধুতি পরা বিধবা বেশ আর কদমছাঁটা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুষালি ভাব।

গাঁ ভাইঙ্গা রুইখা আইতেছে। তাই না ভাবতেছিলাম ব্যাপার কি, গাঁর মাইনষের সাড়া নাই!

ভুবন বলে, তবেই সারছে। দশ-বিশটা খুনজখম হইব নির্ঘাত। আমি যাই, সামলাই গিয়া।

থামেন আপনে, বসেন, ময়নার মা বলে, দ্যাখেন কি হয়।

শ-দেড়েক চাষি চাষাড়ে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে দল বেঁধে। ওদের আওয়াজ পেয়ে মন্মথও জড়ো করেছে তার ফৌজ হারানের ঘরের সামনে—দু-চারজন শুধু পাহারায় আছে বাড়ির পাশে ও পিছনে, বেড়া ডিঙিয়ে ওদিক দিয়ে ভুবন না পালায়। দশটি বন্দুকের জোর মন্মথের, তার নিজের রিভলভার আছে। তবু চাষিদের মরিয়া ভাব দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছে স্পষ্টই বোঝা যায়। তার সুরটা রীতিমতো নরম শোনায়—স্রেফ হুকুমজারির বদলে সে যেন একটু বুঝিয়ে দিতে চায় সকলকে উচিত আর অনুচিত কাজের পার্থক্যটা, পরিণামটাও।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে সে জানায় যে হাকিমের দস্তখতি পরোয়ানা নিয়ে সে এসেছে হারানের ঘর তাল্লাশ করতে। তাল্লাশ করে আসামি না পায় ফিরে চলে যাবে। এতে বাধা দেওয়া হাঙ্গামা করা উচিত নয়, তার ফল খারাপ হবে। বেআইনি কাজ হবে সেটা।

গফুর চেঁচিয়ে বলে, মোরা তাল্লাশ করতি দিমু না।

প্রায় দুশো গলা সায় দেয়, দিমু না!

এমনই যখন অবস্থা, সংঘর্ষ প্রায় শুরু হয়ে যাবে, মন্মথ হুকুম দিতে যাচ্ছে গুলি চালাবার, ময়নার মার খ্যানখেনে তীক্ষ্ণ গলা শীতার্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল, রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোনো আসামি নাই। চোর-ডাকাইত নাকি যে ঘরে আসামি রাখুম? বিকালে জামাই আইছে, শোয়াইছি মাইয়া জামাইরে। দারোগাবাবু তাল্লাশ করতে চান, তাল্লাশ করেন।

মন্মথ বলে, ভুবন মণ্ডল আছে তোমার ঘরে।

ময়নার মা বলে, দ্যাখেন আইসা, তাল্লাশ করেন। ভুবন মণ্ডল কেডা? নাম তো শুনি নাই বাপের কালে! মাইয়ার বিয়া দিলাম বৈশাখে, দুই ভরি রূপা কম দিছি ক্যান, জামাই ফিরা্যা তাকায় না। দুই ভরির দাম পাঠাইয়া দিছি তবে আইজ জামাই পায়ের ধূলা দিছে। আপনারে কমু কি দারোগাবাবু, মাইয়াটা কাইন্দা মরে। মাইয়া যত কান্দে, আমি তত কান্দি—

আচ্ছা, আচ্ছা—মন্মথ বলে, ভুবনকে না পাই, জামাই নিয়ে তুমি রাত কাটিও।

গৌর সাউ হেঁকে বলে, অত চুপেচুপে আসে কেন জামাই ময়নার মা?

গা জ্বলে যায় ময়নার মার। বলে, সদর দিয়া আইছে! তোমার একটা মাইয়ার সাতটা জামাই চুপেচুপে আসে, মোর জামাই সদর দিয়া আইছে।

গৌর আবার কী বলতে যাচ্ছিল, কে যেন আঘাত করে তার মুখে। একটা আর্ত শব্দ শুধু শোনা যায়, সাপে-ধরা ব্যাঙের একটিমাত্র আওয়াজের মতো।

ময়নার রঙিন শাড়ি ও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মন্মথের, পিচুটির মতো চোখে এঁটে যেতে যায় ঘোমটা পরা ভীরু লাজুক কচি চাষি মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি।

এ যেন কবিতা। বি. এ. পাশ মন্মথের কাছে যেন চোরাই স্কচ হুইস্কির পেগ, যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে একফোঁটা টসটসে দরদ। তার রীতিমতো আপশোশ হয় যে জোয়ান মর্দ মাঝবয়সি চাষাড়ে লোকটা এর স্বামী, ওর আদরেই মেয়েটার এই আলুথালু বেশ!

তবু মন্মথ জেরা করে, সংশয় মেটাতে গাঁয়ের দুজন বুড়োকে এনে শনাক্ত করায়। তারপরেও যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না। ভুবন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে যতটা সম্ভব নিরীহ গোবেচারি সেজে। কিন্তু খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি ভরা মুখ, রুক্ষ এলোমেলো একমাথা চুল, মোটেই তাকে দেখায় না নতুন জামাইয়ের মতো। মন্মথ গর্জন করে হারানকে প্রশ্ন করে, এ তোমার নাতনির বর?

হারান বলে, হায় ভগবান!

ময়নার মা বলে, জিগান মিছা, কানে শোনে না, বদ্ধ কালা।

অ! মন্মথ বলে।

ভুবন ভাবে এবার তার কিছু বলা বা করা উচিত।

এমন হাঙ্গামা জানলে আইতাম না কর্তা। মিছা কইয়া আনছে আমারে। সড়াইলের হাটে আইছি, ঠাইরেন পোলারে দিয়া খপর দিলেন মাইয়া নাকি মরমর, তখন যায় এখন যায়।

তুমি অমনি ছুটে এলে?

আসুম না? রতিভরি সোনারূপা যা দিব কইছিল, তাও ঠেকায় নাই বিয়াতে। মইরা গেলে গাও থেইকা খুইলা নিলে আর পামু?

ওঃ! তাই ছুটে এসেছ? তুমি হিসেবি লোক বটে, মন্মথ বলে ব্যঙ্গ করে। আর কিছু করার নেই, বাড়িগুলি তাল্লাশ ও তছনছ করে নিয়মরক্ষা করা ছাড়া। জামাইটাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া চলে সন্দেহের যুক্তিতে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু হাঙ্গামা হবে। দু-পা পিছু হটে এখনও চাষির দল দাঁড়িয়ে আছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায়নি। গাঁয়ে গাঁয়ে চাষাগুলোর কেমন যেন উগ্র মরিয়া ভাব, ভয়ডর নেই। ঘরে ঘরে তাল্লাশ চলতে থাকে। একটা বিড়াল লুকানোর মতো আড়ালও যে ঘরে নেই সে ঘরেও কাঁথাকানি হাঁড়িপাতিল জিনিসপত্র ছত্রখান করে খোঁজা হয় মানুষকে।

মন্মথ থাকে হারানের বাড়িতেই। অল্প নেশায় রঙিন চোখ। এসব কাজে বেরোতে হলে মন্মথ অল্প নেশা করে, মাল সঙ্গে থাকে কর্তব্য সমাপ্তির পর টানবার জন্য,—চোখ তার রঙিন শাড়িজড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। কুরিয়ে কুরিয়ে তাকায় ময়নার কুড়ি-বাইশ বছরের জোয়ান ভাইটা, উসখুস করে ক্রমাগত। ভুবনের চোখ জ্বলে ওঠে থেকে থেকে। ময়নার মা টের পায়, একটু যদি বাড়াবাড়ি করে মন্মথ, আর রক্ষা থাকবে না!

মেয়েটাকে বলে ময়নার মা, শীতে কাঁপুনি ধরছে, শো না গিয়া বাছা? তুমিও শুইয়া পড়ো বাবা। আপনে অনুমতি দ্যান দারোগাবাবু, জামাই শুইয়া পড়ুক। কত মানত কইরা, মাথা কপাল কুইটা আনছি জামাইরে,--ময়নার মার গলা ধরে যায়, আপনারে কি কমু দারোগাবাবু—

ময়না ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভুবন যায় না।

আরও দুবার ময়নার মা সস্নেহে সাদর অনুরোধ জানায় তাকে, তবু ভুবনকে ইতস্তত করতে দেখে বিরক্ত হয়ে জোর দিয়ে বলে, গুরুজনের কথা শোন, শোও গিয়া। খাড়াইয়া কি করবা? ঝাঁপ বন্ধ কইরা শোও।

তখন তাই করে ভুবন। যতই তাকে জামাই মনে না হোক, এরপর না মেনে কি আর চলে যে সে জামাই। মন্মথ আস্তে আস্তে বাইরে পা বাড়ায়। পকেট থেকে চ্যাপটা শিশি বার করে ঢেলে দেয় গলায়।

পরদিন মুখে মুখে এ গল্প ছড়িয়ে যায় দিগদিগন্তে, দুপুরের আগে হাতিপাড়ার জগমোহন আর জোতদার চণ্ডী ঘোষ আর বড়ো থানার বড়ো দারোগার কাছে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। গাঁয়ে গাঁয়ে লোকে বলাবলি করে ব্যাপারটা আর হাসিতে ফেটে পড়ে, বাহবা দেয় ময়নার মাকে। এমন তামাশা কেউ কখনও করেনি পুলিশের সঙ্গে, এমন জব্দ করেনি পুলিশকে। কদিন আগে দুপুরবেলা পুরুষশূন্য গাঁয়ে পুলিশ এলে ঝাঁটা বঁটি হাতে মেয়ের দল নিয়ে ময়নার মা তাদের তাড়া করে পার করে দিয়েছিল গাঁয়ের সীমানা! সে যে এমন রসিকতাও জানে কে তা ভাবতে পেরেছিল?

গাঁয়ের মেয়েরা আসে দলে দলে, অনিশ্চিত আশঙ্কা ও সম্ভাবনায় ভরা এমন যে ভয়ঙ্কর সময় চলেছে এখন, তার মধ্যেও তারা আজ ভাবনা চিন্তা ভুলে হাসিখুশিতে উচ্ছল।

মোক্ষদার মা বলে একগাল হেসে গালে হাত দিয়ে, মাগো মা ময়নার মা, তোর মদ্যি এত?

ক্ষেন্তি বলে ময়নাকে, কি লো ময়না, জামাই কি কইলো? দিছে কী? লাজে ময়না হাসে।

বেলা পড়ে এলে, কাল যে সময় ভুবন মণ্ডল গাঁয়ে পা দিয়েছিল প্রায় সেইসময় আবির্ভাব ঘটে জগমোহনের। বয়স তার ছাব্বিশ-সাতাশ, বেঁটেখাটো জোয়ান চেহারা, দাড়ি কামানো, চুল আঁচড়ানো। গায়ে ঘরকাচা শার্ট, কাঁধে মোটা সুতির সাদা চাদর। গাঁয়ে ঢুকে গটগট করে সে চলতে থাকে হারানের বাড়ির দিকে, এপাশ ওপাশ না তাকিয়ে, গম্ভীর মুখে।

রসিক ডাকে দাওয়া থেকে, জগমোহন নাকি? কখন আইলা?

নন্দ বলে, আরে শোনো, শোনো, তামুক খাইয়া যাও।

জগমোহন ফিরেও তাকায় না।

রসিক ভড়কে গিয়ে নন্দকে শুধোয়, কী কাণ্ড বুঝলা নি?

কেমনে কমু?

অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দুজনে।

পথে মথুরের ঘর। তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা আছে জগমোহনের। নাম ধরে হাঁক দিতে ভেতর থেকে সাড়া আসে না, বাইরের লোক জবাব দেয়। ঘরের কাছেই পথের ওপাশে একটা তালের গুঁড়িতে দুজন মানুষ বসে ছিল নির্লিপ্তভাবে, একজনের হাতে খোঁটাসুদ্ধ গোরু-বাঁধা দড়ি।

তাদের একজন বলে, বাড়িতে নাই। তুমি কেডা, হারামজাদাটারে খোঁজ ক্যান?

জগমোহন পরিচয় দিতেই দুজনে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

অ! তুমিও আইছো ব্যাটারে দুই ঘা দিতে?

তা ভয় নেই জগমোহনের, তারা আশ্বাস দেয়, হাতের সুখ তার ফসকাবে না। কাল সন্ধ্যায় গেছে গাঁ থেকে, এখনও ফেরেনি মথুর, কখন ফিরে আসে ঠিকও নেই, তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না জগমোহনকে। মথুর ফিরলে তাকে যখন বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে বিচারের জন্য, সে খবর পাবে। সবাই মিলে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলার আগে তাকেই নয় সুযোগ দেওয়া হবে মথুরের নাক কানটা কেটে নেবার, সে ময়নার মার জামাই, তার দাবি সবার আগে।

শাউড়ি পাইছিলা দাদা একখান!

নিজের হইলে বুঝতা। জগমোহন জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে চলতে আরম্ভ ক'রে। শুনে দুজনে তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অবাক হয়ে!

আচমকা জামাই এল, মুখে তার ঘন মেঘ। দেখেই ময়নার মা বিপদ গনে। ব্যস্তসমস্ত না হয়ে হাসিমুখে ধীর শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানায়, তার যেন আশা ছিল, জানা ছিল এ সময় এমনিভাবে জামাই আসবে, এটা অঘটন নয়। বলে, আস বাবা, আস। ও ময়না, পিঁড়া দে। ভাল নি আছে বেবাকে? বিয়াই বিয়ান পোলামাইয়া?

আছে।

আরেকটু ভড়কে যায় ময়নার মা। কত গোসা না জমা আছে জামাইয়ের কাটাছাঁটা এই এক কথার জবাবে। ময়নার দিকে তার না তাকাবার ভঙ্গিটাও ভাল ঠেকে না। পড়ন্ত রোদে লাউমাচার সাদা ফুলের শোভা ছাড়া আর কিছুই যেন চোখ চেয়ে দেখবে না শ্বশুরবাড়ির, পণ করেছে জগমোহন! লক্ষণ খারাপ।

ঘর থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় হারান হাঁকে, আসে নাই? হারামজাদা আসে নাই? হায় ভগবান!

নাতিরে খোঁজে, ময়নার মা জগমোহনকে জানায়, বিয়ান থেইকা দ্যাখে না, উতলা হইছে।

ময়নার মা প্রত্যাশা করে যে নাতিকে হারান সকাল থেকে কেন দ্যাখে না, কি হয়েছে হারানের নাতির, ময়নার ভায়ের, জানতে চাইবে জগমোহন, কিন্তু কোন খবর জানতেই এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না তার।

খাড়াইয়া রইলা ক্যান? বস বাবা, বস।

জগমোহন বসে। ময়নার পাতা পিঁড়ি সে ছোঁয় না, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসে।

মুখ হাত ধুইয়া নিলে পারতা।

না, যামু গিয়া অখনি।

অখনি যাইবা?

হ। একটা কথা শুইনা আইলাম। মিছা না খাঁটি জিগাইয়া যামু গিয়া। মাইয়া নাকি কার লগে শুইছিল কাইল রাইতে?

শুইছিল? ময়নার মার চমক লাগে, মোর লগে শোয় মাইয়া, মোর লগে শুইছিল, আর কার লগে শুইব?

ব্রহ্মাণ্ডের মাইনষে জানছে কার লগে শুইছিল। চোখে দেইখা গেছে দুয়ারে ঝাঁপ দিয়া কার লগে শুইছিল।

তারপর বেধে যায় শাশুড়ি জামাইয়ে। প্রথমে ময়নার মা ঠাণ্ডা মাথায় নরম কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু জগমোহনের ওই এক গোঁ! ময়নার মাও শেষে গরম হয়ে ওঠে। বলে, তুমি নিজে মন্দ, অন্যেরে তাই মন্দ ভাব। উঠানে মাইনষের গাদা, আমি খাড়া সামনে, এক দণ্ড ঝাঁপটা দিছে কি না দিছে, তুমি দোষ ধরলা! অন্যে তো কয় না?

অন্যের কী? অন্যের বউ হইলে কইতো।

বড় ছোটো মন তোমার। আইজ মণ্ডলের নামে এমন কথা কইলা, কাইল কইবা জুয়ান ভায়ের লগে ক্যান্ কথা কয়।

কওন উচিত। ও মাইয়া সব পারে। তখন আর শুধু গরম কথা নয়, ময়নার মা গলা ছেড়ে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগমোহনের চোদ্দপুরুষ। হারান কাঁপা গলায় চেঁচায়, আইছে নাকি? আইছে হারামজাদা? হায় ভগবান, আইছে? ময়না কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছুটে আসে পাড়াবেড়ানি নিন্দাছড়ানি নিতাই পালের বউ আর প্রতিবেশি কয়েকজন স্ত্রীলোক।

কী হয়েছে গো ময়নার মা? নিতাই পালের বউ শুধায়, মাইয়া কাঁদে ক্যান?

তাদের দেখে সংবিৎ ফিরে পায় ময়নার মা, ফোঁস করে ওঠে, কাঁদে ক্যান? ভাইটারে ধইরা নিছে, কাঁদব না?

জামাই বুঝি আইছে খবর পাইয়া?

শুনবা বাছা, শুনবা। বইতে দাও, জিরাইতে দাও।

ময়নার মার বিরক্তি দেখে ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে মেয়েরা ফিরে যায়। তাকে ঘাঁটাবার সাহস কারও নেই। ময়নার মা মেয়েকে ধমক দেয়, কাঁদিস না। বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করছিলি, কাঁদনের কী?

বাপ নাকি? জগমোহন বলে ব্যঙ্গ করে।

বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে, আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান। তোমারে কই জগু, হাতে ধইরা কই, বুইঝা দ্যাখো, মিছা গোসা কইরো না।

বুইঝা কাম নাই। অখন যাই।

রাইতটা থাইকা যাও। জামাই আইলা, গেলা গিয়া, মাইনষে কী কইব?

জামাইয়ের অভাব কী? মাইয়া আছে, কত জামাই জুটবো।

বেলা শেষ হতে না হতে ঘনিয়ে এসেছে শীতের সন্ধ্যা। অল্প অল্প কুয়াশা নেমেছে। ঘুঁটের ধোঁয়া ও গন্ধে নিশ্চল বাতাস ভারী। যাই বলেই যে গা তোলে জগমোহন তা নয়। ময়নার মারও তা জানা আছে যে শুধু শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে যাই বলেই জামাই গটগট করে বেরিয়ে যাবে না। ময়নার সাথে বোঝাপড়া, ময়নাকে কাঁদানো, এখনও বাকি আছে! যদি যায় জামাই মেয়েটাকে নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়ে তারপর যাবে। আর

কথা বলে না ময়নার মা, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ঘরে কিছু নেই, মোয়ামুড়ি কিছু জোগাড় করতে হবে। খাক বা না খাক সামনে ধরে দিতেই হবে জামাইয়ের।

চোখ মুছে নাক ঝেড়ে ময়না বলে ভয়ে ভয়ে, ঘরে আস।

খাসা আছি। শুইছিলা তো?

না, মা কালীর কিরা, শুই নাই। মায় কওনে খালি ঝাপটা দিছিলাম, বাঁশটাও লাগাই নাই।

ঝাঁপ দিছিলা, শোও নাই। বেউলা সতী!

ময়না তখন কাঁদে।

তোমার লগে আইজ থেইকা শেষ।

ময়না আরও কাঁদে।

ঘর থেকে হারান কাঁপা গলায় হাঁকে, আসে নাই? ছোঁড়া আসে নাই? হায় ভগবান!

থেমে থেমে এক-একটা কথা বলে যায় জগমোহন, না থেমে অবিরাম কেঁদে চলে ময়না, যতক্ষণ না কান্নাটা একঘেয়ে লাগে জগমোহনের। তখন কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে। মুড়িমোয়া জোগাড় করে পাড়া ঘুরে ময়নার মা যখন ফিরে আসে, ময়না তখন চাপা সুরে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। বেড়ার বাইরে সুপারিগাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দু-চোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সাথে, দারোগা পুলিশের সাথে লড়াই করা চলে, অবুঝ পাষণ্ড জামাইয়ের সাথে লড়াই নেই!

আপন মনে আবার হাঁকে হারান, আসে নাই? মোর মরণটা আসে নাই? হায় ভগবান!

জগমোহন চুপ করে ছিল, এতক্ষণ পরে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে শালার খবর।—উয়ারে ধরছে ক্যান?

ময়নার কান্না থিতিয়ে এসেছিল, সে বলে, মণ্ডলখুড়ার লগে গোঁদলপাড়া গেছিল, ফিরতি পথে একা পাইয়া ধরছে।

ক্যান ধরছে?

কাইল জব্দ হইছে, সেই রাগে বুঝি।

বসে বসে কী ভাবে জগমোহন, আর কাঁদায় না ময়নাকে। ময়নার মা ভেতরে আসে, কাঁসিতে মুড়ি আর মোয়া খেতে দেয় জামাইকে. বলে, মাথা খাও, মুখে দাও।

আবার বলে, রাইত কইরা ক্যান যাইবা বাবা? থাইকা যাও।

থাকনের জো নাই। মা দিব্যি দিছে।

তবে খাইয়া যাও? আখা ধরাই? পোলাটারে ধইরা নিছে, পরানডা পোড়ায়। তোমারে রাইখা জুড়ামু ভাবছিলাম।

না, রাইত বাড়ে।

আবার কবে আইবা?

দেখি।

উঠি-উঠি করেও দেরি হয়। তারপর আজ সন্ধ্যারাতেই পুলিশ হানার সেইরকম শোর ওঠে কাল মাঝরাত্রির মতো। সদলবলে মন্মথ আবার আচমকা হানা দিয়েছে। আজ তার সঙ্গের শক্তি কালের চেয়ে অনেক বেশি। তার চোখ সাদা।

সোজাসুজি প্রথমেই হারানের বাড়ি।

কি গো মণ্ডলের শাশুড়ি, মন্মথ বলে ময়নার মাকে, জামাই কোথা?

ময়নার মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এটা আবার কে?

জামাই। ময়নার মা বলে।

বাঃ, তোর তো মাগি ভাগ্যি ভালো, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে! আর তুই ছুঁড়ি এই বয়সে—

হাতটা বাড়িয়েছিল মন্মথ রসিকতার সঙ্গে ময়নার থুতনি ধরে আদর করে একটু নেড়ে দিতে। তাকে পর্যন্ত চমকে দিয়ে জগমোহন লাফিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে গর্জে ওঠে, মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন!

বাড়ির সকলকে, বুড়ো হারানকে পর্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামি নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মতো না হলেও লোক মন্দ জমেনি। দলে দলে লোক ছুটে আসছে চারিদিক থেকে, জমায়েত মিনিটে মিনিটে বড়ো হচ্ছে। মথুরের ঘর পার হয়ে পানা পুকুরটা পর্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালের চেয়ে সাত-আট গুণ বেশি লোক পথ আটকায়। রাত বেশি হয়নি, শুধু এ গাঁয়ের নয়, আশেপাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারেনি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বোঝা যেত, হারানের বাড়ির লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে! মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।

ময়না তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়েই রক্ত মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে জগমোহনের। নব্বই বছরের বুড়ো হারান সেইখানে মাটিতে মেয়ের কোলে এলিয়ে নাতির জন্য উতলা হয়ে কাঁপা গলায় বলে, ছোঁড়া গেল কই? কই গেল? হায় ভগবান!

ছোটবকুলপুরের যাত্রী

গাড়িটা ঘণ্টাখানেক লেট্ করেছে।

ঠিক সময়ে পৌঁছলেও অবশ্য প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়, স্টেশনের তেলের বাতিগুলি তার আগেই জ্বালানো হয়। প্ল্যাটফর্মে অল্প কয়েকজন মাত্র যাত্রী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল, শঙ্কিত ও স্তব্ধভাবে। আরও গভীর রাত্রের ট্রেনের জন্যও এ স্টেশনে সাধারণত আরও অনেক বেশি যাত্রী জড়ো হতে দেখা যায়। আজ একদল সিপাই প্ল্যাটফর্মে যাত্রীর অভাব পূর্ণ করেছে।

গাড়ি দাঁড়ায় মিনিট দেড়েক। এই সময়টুকুর ব্যস্ততা এবং কলরবও আজ স্টেশনে ঝিমানো মনে হয়, তারপর গাড়ি ছেড়ে যাবার দু-চার মিনিটের মধ্যেই অদ্ভুতভাবে স্টেশন এলাকা যাত্রীশূন্য হয়ে ছমছমিয়ে আসে। গাড়ি থেকে যারা নেমেছে তারা কোনোদিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি গেটে টিকিট দিয়ে পথে নেমে যায়—এত লোকে যে টিকিট কাটে এবং সদর গেটে টিকিট দাখিল করে স্টেশন ছাড়ে, এও এক অসাধারণ ব্যাপার বটে। চারিদিকে একনজর তাকালেই টের পাওয়া যায় যে বাড়ির টান আজ সকলের হঠাৎ বেড়ে যায়নি, স্টেশন এলাকা ছেড়ে তফাত হবার তাগিদেই যাত্রীদের এত তাড়া।

পথে নেমেও কেউ দাঁড়ায় না। স্টেশনের লাগাও তে-রাস্তার মোড়, দু-তিনটি দোকানে মাত্র আলো জ্বলছে, বাকিগুলি বন্ধ। চায়ের দোকানের আলোটা সবচেয়ে উজ্জ্বল, সাধারণত এসময় দোকানটা লোকে প্রায় ভরা থাকে, আজ একরকম শূন্য পড়ে আছে। প্রকাণ্ড বাঁধানো বটগাছের তলায় দুজন চাষি কিছু তরিতরকারি সাজিয়ে বসে আছে, কিন্তু ভিণ্ডি বেগুনের দরটা জিজ্ঞাসা করার কৌতূহলও যেন আজ কারও নেই।

স্টেশনের বাতির মতোই মিটমিট করে দিবাকরের চোখ। সে এদিক ওদিক তাকায়। চোখের পলকে পলকে তার জানাচেনা স্টেশনটি যেভাবে যাত্রীশূন্য হয়ে যেতে থাকে সেটা যেন ম্যাজিকের মতো ঠেকে তার কাছে। একদল সশস্ত্র সিপাইয়ের দখলে স্টেশনের চেহারা যে অভিনব হয়েছে এটা তার খাপছাড়া লাগে না। এ দৃশ্য দেখা অভ্যাস আছে। কাল এখানে যে ব্যাপার ঘটে গেছে তার বিবরণও সে গাড়িতে শুনেছে। এরকম দৃশ্যই সে প্রত্যাশা করছিল।

দেখলি ব্যাপার?

বাচ্চাটাকে বুকে চেপে আন্না চাপা গলায় বলে, দেখব আবার কী? হাঙ্গামা হয়েছে, পাহারা বসেছে, না তো কি থেটার হবে? হাবার মতো দাঁড়িয়ে থেকো নি, যাই চলো।

বিড়ি সিগারেট টানতে টানতে কজন বাবুমতো লোক একান্ত বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যাত্রীদের লক্ষ করছিল, নামধামও জিজ্ঞাসা করছিল দু-একজনকে। স্টেশন যাত্রীশূন্য হয়ে আসায় এতক্ষণে দিবাকরদের দিকে তাদের নজর পড়ে। মাঝবয়সি বেঁটে লোকটি মুখ বাঁকিয়ে বলে, চাষাভুসো বাজে লোক, যেতে দাও।

তার খদ্দরপরা ছোকরা বয়সি সঙ্গীটি পানরাঙা মুখে আরও দুটো পান পুরে চিবুতে চিবুতে আন্নার দিকে চেয়ে থাকে, আচমকা প্যাচ করে পিক ফেলে হাত উঁচিয়ে আঙুল ঠেরে দিবাকরকে কাছে ডাকে, এই! শোন!

দিবাকর অবশ্য দেখেও দ্যাখে না, শুনেও শোনে না। পুটুলিটা বগলে চেপে দড়িবাঁধা হাড়িটা হাতে ঝুলিয়ে আন্নাকে সঙ্গে নিয়ে গুটিগুটি এগোতে থাকে।

ওরা জন তিনেক তখন সামনে এসে দাঁড়ায়।

টিকিট আছে?

আছে।

শার্টের বুক পকেট থেকে দিবাকর দুখানা টিকিট বার করে দেখায়।

কোথা যাবে?

আজ্ঞে ছোটবকুলপুর যাব।

শুনে তারা যেন একটু চমকে যায়। পানখোর ছোকরা আবার প্যাচ করে খানিকটা পিক ফেলে। গতকালের হাঙ্গামায় প্ল্যাটফর্মের লাল কাঁকরে খানিক রক্তপাত ঘটেছিল, ছোঁড়া যেন পানের পিক দিয়েই তার জের টেনে প্ল্যাটফর্মটা রাঙা করে দিতে চায়। দিবাকরও পান ভালোবাসে, রাস্তায় পুরো চার পয়সার তৈরি পান কিনেছে। কাগজের ঠোঙাটা বার করে সেও একটা পান মুখে পুরে দেয়। লোকগুলির এত কাছে দাঁড়ানোর জন্যই বোধহয় পানটা তার একটু তিতো লাগে। ওদের মাথার পিছনে দূরে কারখানাটার উঁচুতে টাঙানো নিঃসঙ্গ আলোটা তার চোখে পড়ছিল, অন্ধকার আকাশে যেন বিনা অবলম্বনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ওই কারখানার ধর্মঘট নিয়ে কাল স্টেশনের হাঙ্গামা। তিনজন নেতাকে ধরে ট্রেনে চালান দেবার সময় কয়েকশো মজুর তাদের ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তখন গুলি চলে, রক্তপাত ঘটে। গাড়িতে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনার পর থেকে দিবাকরের আধাচাষি আধামজুর প্রাণটা বড়ই বিগড়ে আছে।

বেঁটে লোকটি জিজ্ঞাসা করে, রাত করে ছোটবকুলপুর যাবে? সেখানকার খবর জানো সব?

দিবাকর নির্লিপ্তভাবে বলে, খবর জেনেই এয়েছি বাবু। আত্মীয়কুটুম আছে সেথা, খপর নিতে এয়েছি তারা বেঁচে আছে না স্বাধীন হয়েছে।

বেঁটে বলে, ও বাবা, তোমার দেখি চটাং চটাং কথা!

না বাবু, গরিব মানুষ কথা কোথা পাব?

তেমাথার পাশে দুটি খোলা গোরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, কাছে মাটিতে শুয়ে জাবর কাটছে একজোড়া শীর্ণ ও শান্ত বলদ। স্টেশনের সামনে সাধারণত দু-তিনটি ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, ঘোড়া যত প্রাচীন, গাড়িগুলি ততোধিক। বেগার খাটার ভয়ে গরিব গাড়োয়ানেরা আজ গাড়িই বার করেনি। গাড়ি চেপে শ্বশুরবাড়ি যাবার মতো বড়লোক দিবাকর কোনদিন ছিল না, আজ কিন্তু সে ঘোড়ার গাড়ি চেপেই যেত—আন্নার রূপার গয়না বাঁধা দিয়ে এই উদ্দেশ্যেই সে টাকা জোগাড় করে এনেছে। ছোটবকুলপুর পৌঁছোতে রাত হবে এটা জেনেই তারা রওনা দিয়েছে, তবে রাত করে মেয়েছেলে আর শিশু নিয়ে তিন মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে ঘোড়ার গাড়ির আশাটা ছিল।

এখন ভরসা গোরুর গাড়ি।

গাড়োয়ান কই হে! দিবাকর ডাকে।

দুই গাড়ির দুজন মালিকেরই আবির্ভাব ঘটে। আবছা আলোয় মনে হয় একজন যেন পুরানো বটগাছটা এবং অন্যজন দোকানঘরের বেড়া ভেদ করে কাছে এসে দাঁড়াল।

তাদের তাড়া নেই, গোরুর গাড়িতে কম্পিটিশনও নেই। ধীরেসুস্থে তারা জানতে চায় দিবাকরেরা কোথায় যাবে।

ছোটবকুলপুর।

শুনে তারা দুজনেই ঘাড় নাড়ে। ওরে বাবা, রাত্রিবেলা ছোটবকুলপুর কে যাবে! সেখানে সৈন্যপুলিশ গ্রাম ঘিরে আছে, রীতিমতো লড়াই চলছে।

চারজনেই তারা সম্মুখে পথটার দিকে তাকায়। ছোটবকুলপুরের এ রাস্তা কিছু দূর গিয়ে বাঁক নিয়েছে, কিন্তু সে পর্যন্ত এখন নজর চলে না—মনে হয় বিপজ্জনক অন্ধকারেই বুঝি পথটা হারিয়ে গেছে। বাঁ হাতে কোলের বাচ্চাকে সামলে ডান হাতে আন্না দিবাকরকে এক পা পিছু ঠেলে দেয়, নিজে এগিয়ে দায়িত্ব নেয়।

ওখান তক্ নাই বা গেলে বাবা? যদ্দুর যেতে চাও নিয়ে চলো, বাকি রাস্তা মোরা হেঁটে যাব। ভাড়া ঠিক মতো পাবে।

রাম বলে, রাতের বেলা কে অত হাঙ্গামা করে, না কী বল ঘোষের পো?

ওমা, তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ! আন্না মিষ্টি সুরে বলে, বাচ্চা কোলে মেয়েছেলে যাব, তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ!

রাম চুপ করে থাকে। তার বয়স বেশি, সাহস কম। গগন ঘোষ বলে, কমলতলা তক যেতে পারি।

তাই হোক। কমলতলার সীমা পেরিয়েও যদি নামিয়ে দেয় তবু প্রায় আধমাইল হাঁটতে হবে। পুরো দেড়ক্রোশ হাঁটার চেয়ে সে অনেক ভালো। একটা গাড়িতে বলদ জুড়লে আন্না উঠে বসে, এ কসরত তার অভ্যাস আছে। গগনের গাড়িটা নড়বড়ে, ক্রমাগত লেজ মলে তাড়া না দিলে শীর্ণ বুড়ো বলদ এক পা এগোতে চায় না। আন্না আগ্রহের সঙ্গে ছোটবকুলপুরের খবর জিজ্ঞাসা করে, তবে গাঁয়ে ঘরে পৌঁছবার আগে বাপ-ভায়ের কুশল জানার আশা সে করে না। গ্রামের সাধারণ অবস্থার ঘনিষ্ঠতর বিবরণ, অনেক নতুন খবর গগনের কাছে জানা যায়। দূর থেকে তারা শুনেছিল যে ছোটবকুলপুরের অবস্থা অতি শোচনীয়; প্রচণ্ড আঘাতে গাঁয়ের গেরস্থজীবন তছনছ চুরমার হয়ে গেছে! গগনের কাছে শোনা যায়, ব্যাপার ঠিক তা নয়। গোড়ায় গাঁয়ের মধ্যে খুব খানিকটা অত্যাচার হয়েছিল, কিন্তু তারপর গাঁয়ের লোক এমন আঁটসাঁট বেঁধে তৈরি হয়ে জেঁকে বসেছে যে চৌধুরী বা ঘোষেদের কোনো লোক অন্তত দু-ডজন রাইফেল ছাড়া গাঁয়ের ভেতরে ঢুকতেই সাহস পায় না।

একবার মুখ খুললে গগনকে থামানো দায়। গোরুর লেজ মলে মলে মুখে গোরু তাড়ানোর অদ্ভুত আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে সে চারিদিকের অবস্থা বর্ণনা করে যায়, তার মতে কলিযুগ সত্যই এবার শেষ হতে চলেছে। সমস্ত লক্ষণ থেকে তাই মনে হয়। নইলে রাজায় প্রজায় এমন যুদ্ধ বাধে?

মোরা কলির পাপী লোক, এ লড়ায়ে মোরা মরব। মোদের ছেলেপুলেরা ফের সত্যযুগ করবে!

অন্ধকার নিস্তব্ধ পথে বেশ শোরগোল তুলেই গাড়ি চলে। রাস্তার ধারের কোনো কোনো ঘরের বেদখল দাওয়া থেকে মাঝে মাঝে টর্চের আলো এসে পড়ে গাড়িতে, গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন আসে ঃ কে যায়? কোথা যাবে?

গগন জবাব দেয় ঃ ইস্টেশনের ট্রেইনের মেয়েছেলে, কমলতলি যাবে।

গাড়ি গাছপালা বাড়িঘরের আড়ালে যাওয়া পর্যন্ত টর্চের আলো আন্নার গায়ে সাঁটা

থাকে, ট্রেনের প্যাসেঞ্জার নিরীহ নির্দোষ মেয়েছেলেই যে যাচ্ছে গাড়িটাতে সেটা যেন যতক্ষণ সম্ভব প্রত্যক্ষ করা চাই।

এ অঞ্চলে ঘন বসতি, গায়ে গায়ে লাগানো বড় বড় গ্রাম। তবু এখন সন্ধ্যারাত্রেই রাস্তায় প্রায় লোক চলাচল নেই। গেঁয়ো লোকের পথ চলাও খাপছাড়া রহস্যময় হয়ে উঠেছে। এই পথ ধরেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে লোকে পাড়ি দেয়, আজ যেন চারিদিকে সকলেরই দীর্ঘ পথ হাঁটার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। রাস্তার পাশ থেকে আচমকা হয়তো একজন রাস্তায় উঠে আসে, জোরে জোরে পা ফেলে খানিকটা এগোতে না এগোতেই আবার রাস্তার ধারের অন্ধকারেই মিশিয়ে যায়। মাত্র দুটি একটি লোকের এরকম টুকটাক খুচখাচ খুচরো চলাফেরার প্রয়োজন নির্জনতা ও স্তব্ধতাকে আরও বেশি অস্বাভাবিক করে তোলে।

কদমতলায় মস্ত ছাউনি পড়েছে। চোখ তুলে সেদিকে চেয়ে গগন মাথা চুলকায়।

যাব নাকি এগিয়ে ছোটবকুলপুর তক?—গগন অনুমতি চাওয়ার সুরে বলে, দিবাকরেরাই যেন তাকে যেতে বারণ করেছে!—চলো যাই মেয়া, তোমায় নিয়ে যাই। মাঝ রাস্তায় কেমন করে নামিয়ে দি বলো, আঁ?

আন্না খুশি হয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, ভগবান মুখপোড়া একচোখো কানা, নইলে তোমার নতুন গাড়ি হত বাবা, জোয়ান বলদ হত।

ছোটবকুলপুরের প্রান্ত ছুঁতে ছুঁতে একেবারে তিন-তিনটে টর্চের আলো গোরুর গাড়িতে এসে পড়ে। কিছু হাঁকডাক শোনা যায়। বেশ বোঝা যায় গাঁয়ে ঢুকবার মুখে যারা পাহারা দিতে গেড়ে বসেছে বিদ্রোহী গ্রামটিকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে, অসময়ে গগনের গোরুরগাড়ির আবির্ভাবে তাদের মধ্যে খানিকটা সানন্দ উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। গাড়িতে শুধু দুটি বলদ, একটি গাড়োয়ান, একজন পুরুষ ও একটি মেয়েমানুষ এবং একটি বাচ্চা—সুতরাং ভয়ের কোনো কারণ নেই।

দেখতে দেখতে সাত-আটজন গাড়িটা ঘিরে ফেলে। টুপিটা ঠিক করে বসাতে বসাতে মাঝবয়সি মোটা লোকটি, সে-ই বোধহয় বেসরকারি দলপতি, গম্ভীর গলায় বলে, কোথা থেকে আসছো?

গগন বলে, ইষ্টিশনের টেরেনগাড়ির প্যাসিঞ্জার আজ্ঞা।

শাট্ আপ! তোকে কে জিজ্ঞেস করেছে? তোমার নাম?

মোর নাম দিবাকর দাস।

বাপের নাম? কোথায় থাক? কি কর? এদিকে এসেছ কেন?

বাপের নাম মনোহর দাস। তেনা স্বগ্‌গে গেছেন—তিপ্পান্নের মন্বন্তরে। রোগ ব্যারাম কিছু নয়, উপোস দিয়ে মিত্যু। হাওড়ায় থাকি, ঘনশ্যাম-বেটেনেট কারখানায় মজুর খাটি। ইদিকে হাঙ্গামা শুনলাম, বউ কাঁদতে লাগল যে তার বাপ ভাই মরেছে না বেঁচে রয়েছে। তা ভাবলাম কি যে কারখানার ধরমঘট দু-দশদিনে মেটার নয়, যা দিনকাল। বউকে নিয়ে দেখে আসি শ্বশুরবাড়ি ব্যাপার কী।

সবিনয়ে স্পষ্ট সরল ভাষায় দিবাকর তাদের আগমনের কারণ ও বিবরণ দাখিল করে।

কাঁদাকাটা করে না বলে, ভয়ে দিশেহারা হয়ে পায়ের তলায় আছড়ে আছড়ে পড়ে না বলে বোধহয় তার ব্যাখ্যা এদের পছন্দ হয় না।

পুঁটলিতে কী আছে? বোমা বন্দুক?

আজ্ঞে কাঁথা কাপড়।

তুমি যে সত্যি দিবাকর দাস, মজুর খাটো, শ্বশুরবাড়ি আসছ, কোনো বদ মতলব নেই, তার প্রমাণ দিতে পার?

কী প্রমাণ দেব বলেন? সাক্ষী প্রমাণ তো সাথে আনিনি!

ষোল-সতেরো বছরের স্বেচ্ছাসেবক ফরসা ছেলেটি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, দীর্ঘ থলথলে চেহারার প্রৌঢ়বয়সি লোকটির ধমকে বিষম খেয়ে থেমে যায়, কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়ে।

আন্না বলে, গাঁয়ের চাষাপাড়ার দশটা লোক ডেকে পাঠাও না বাবুরা, মোকে দু-চারজন চিনবেই, গাঁয়ের মেয়া আমি।

সে তো চিনবে, না চিনলেও চিনবে। যাদের সঙ্গে যোগসাজশ তাদের যদি না চিনবে তো কাদের চিনবে?

আন্না দিবাকরের কানে কানে বলে, গাঁয়ের লোক ডাকতে ডরাচ্ছে, জানো?

দীর্ঘ থলথলে লোকটি আঙুল উঁচিয়ে বলে, এই! কানে কানে কী কথা হচ্ছে? চুপিচুপি সলাপরামর্শ চলবে না, খপরদার!

গাঁয়ে যাওয়া কি বারণ বাবু? একশো চুয়াল্লিশ রটিয়েছো? দিবাকর প্রশ্ন করে।

কদমছাঁটা চুল লম্বাটে মাথা পাঞ্জাবি গায়ে বয়াটে চেহারার ছোঁড়াটা বলে, বারণ কেন, বারণ নেই। তোমরা কে, কী মতলবে এসেছ জানা গেলেই যেতে দেওয়া হবে।

ওসব যাতে জানা যায় তার একটা বিহিত কর বাবুরা?

চোপ, তামাশা হচ্ছে, না?

ধমকানির চোটে দিবাকরেরা চুপ হয়ে যায়, বাচ্চাটা ককিয়ে কেঁদে উঠে প্রতিবাদ জানায়। ওদের দিকে পিছন ফিরে বসে ছেলেকে শান্ত করতে করতে আন্না তাদের মন্তব্য ও পরামর্শ শোনে। আচমকা গরুর গাড়ি চেপে হাজির হয়ে তারা যে গুরুতর ও জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে মানুষগুলি রীতিমত বিব্রত ও বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সঙ্গের জিনিস বেশভূষা চেহারা দেখে আর কথাবার্তা শুনে সত্যি সত্যি টের পাবার জো নেই যে এরা সত্যিকারের নিরীহ সাধারণ গোবেচারি চাষামজুর মাগভাতার ছাড়া অন্য কিছু নয়, কিন্তু সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে দারুণ সন্দেহের কারণ। যে তাণ্ডব চলেছে ছোটবকুলপুরে কদিন ধরে, তাতে সত্যিকারের কোনো ভীরু মুখ্যু ছোটলোক মাগছেলে সাথে নিয়ে সাধ করে কখনো তার মধ্যে আসতে চায়? তাও আবার হাঙ্গামার খবর জানবার পরে! বাজে লোকের এ সাহস হবে কোত্থেকে? তার চেয়েও বড় কথা, সন্দেহের কথা, চারিদিকে এত রাইফেল বন্দুকের সমারোহ দেখেও ওরা মোটে ভড়কে যায়নি, দিব্যি নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব।

একজন নীচু গলায় বলে, নিশ্চয় কোনো ডেঞ্জারাস লোক ছদ্মবেশে এসেছে। আরেকজন বলে, সার্চ করা যাক না?

দীর্ঘ থলথলে লোকটি হুকুম দেয়, এই! জিনিসপত্র নিয়ে নামো।

তার মুখের কথা খসতে না খসতে দুজনে দিবাকরকে ধরে টেনে নামিয়ে দেয়। উৎসাহ অথবা উত্তেজনার আতিশয্যে একজনের হাত থেকে পড়ে গিয়ে মুখবাঁধা মাটির হাঁড়িটা ভেঙে যায়, ছড়িয়ে পড়ে আধ হাঁড়ি জল আর তাতে কিলবিল করে গোটা ছয়েক শিং মাছ!

দিবাকর গোঁসা করে বলে, দিলে তো বাবুরা, গরিবের পথ্যির দফা মেরে দিলে তো? রুগি বউটা এখন খাবে কি!

বলি ওহে দিবাকর দাস, একজন গম্ভীর মুখে বলে, কারখানায় খেটে খাও বললে না? কুলিমজুরের বউরা কবে থেকে শিং মাছের ঝোল খাচ্ছে হে? পাঁচ-ছটাকা শিং মাছের সের।

শিঙিমাছ খাওয়া মোদের বারণ আছে নাকি বাবু?

এ ফোড়নের অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে সে গর্জন করে ওঠে, শাট্ আপ, বেয়াদপ!

পোঁটলাটা খুলে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়, তাতে একটা অঘটন ঘটে যায়। আন্নার বাচ্চাটা রাস্তায় দু-একবার পায়খানা করেছে, নোংরা ন্যাকড়া দলা পাকিয়ে আন্না পুঁটলির মধ্যে রেখেছিল। ঘাঁটতে যাওয়ায় অনুসন্ধানীর হাতে ময়লা লেগে যায়। গন্ধে ও স্পর্শে রাগ চড়ে যাওয়ায় বেহিসাবির মতো পুঁটলিটাতে সে বল শুট করার মতো লাথি মেরে বসে। ফলে কাদার মতো তরল পদার্থ খানিকটা তার পায়েও লাগে, ছিটকে বন্দুকের গায়েও একটু আধটু লেগে যায়।

গাড়িতে বিছানো বিচালি তুলে, ছেঁড়া বস্তাটার ভাঁজ খুলে খোঁজার পর গগন আর দিবাকরের গা খোঁজা হয়। দিবাকরের শার্টের পকেট থেকে বার হয় পানের মোড়কটা।

বাঃ, সাজা পান! দে তো একটা।

তিনটি পান অবশিষ্ট ছিল, তিনজনের মুখে যায়। পান চিবোতে চিবোতে একজন লণ্ঠনের আলোয় পানমোড়া ছাপানো কাগজটার দিকে এক নজর তাকিয়েই যেন বৈদ্যুতিক শক্ খেয়ে চমকে ওঠে। কাগজটা ভালো করে মেলে ধরে সে বিস্ফারিত চোখে বড়ো হরফের হেডলাইনটার দিকে চেয়ে থাকে।—"ছোটবকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি।"

নিগূঢ় আবিষ্কারের উত্তেজনায় কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, পাওয়া গেছে! ইস্তাহার পাওয়া গেছে!

ইস্তাহার? তাই বটে। বিপজ্জনক ইস্তাহার! যদিও দুমড়ে মুচড়ে চুন আর পানের রসে মাখামাখি হয়ে গেছে, তবু চেষ্টা করে আগাগোড়া পড়া যায়। পড়তে পড়তে চোখও কপালে উঠে যায়।

তবু তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। আর শূন্যে হাতড়াতে হবে না, মনগড়া সন্দেহ সংশয়ে জর্জরিত হতে হবে না, একেবারে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে হাতের মুঠোয়। এবার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবে।

এ ইস্তাহার পেলে কোথা?

প্রশ্নটার যেন স্বাদ আছে এমনিভাবে আরামে জিভে জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করা হয়।

ইস্তাহার? ইস্তাহারের তো কিছু জানি না! চার পয়সার পান কিনলাম, পানওয়ালা ও কাগজটাতে জড়িয়ে দিল।

পানওয়ালা জড়িয়ে দিল না তুমি ভেবেচিন্তে পান কিনে ইস্তাহারটাতে জড়িয়ে নিলে?

কেন? তা কেন করতে যাব?

আর ঢং কোরো না। এবার আসল নাম বলো দিকি।

দিবাকর আর আন্না পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

আর না কান্না

'কান্না' গল্পের সাত বছরের ছিচকাঁদুনে মেয়েটা মাইরি আমায় অবাক করেছে। যেমন মা-বাবা, তেমনি মেয়ে। শুধু কান্না আর কান্না।

যত চাও রুটি খাও শুনে কোথায় খুশিতে ডগমগ হবে, ভাববে যাকগে, আজকে পেটটা আমার ভরবেই ভরবে—তা নয়। এক মুঠো ভাতের জন্য কান্না! রেশনের চালের ভাত! রুটি এমনি চিবোলে মিঠে লাগে, একটু গুড় পেলে মাখিয়ে নিলে হয়ে যায় একেবারে পাটিসাপটা পিঠে। রুটি খেয়ে পেট ভরে জল খাও, তার কাছে নাকি ভাত খাওয়ার পেট ভরা! ছিটেফোঁটা ডাল, এইটুকু তরকারি, তাই দিয়ে ছিরি আছে নাকি ভাত খাওয়ার?

প্রাণটা ভাত চেয়ে চোঁ চোঁ করে বইকি ভেতো মনিষ্যির। বড়োদের আরও বেশি করে। কিন্তু ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসলে প্রাণটা যে আবার লাগসই পরিমাণে ভালো তরকারি মাছ চায় মশাই! শুধু ডাল হোক, শুধু একটা তরকারি হোক, তাই দিয়ে এক দিস্তে রুটি মেরে দেওয়া যায় (যেন এক দিস্তে রুটি গরিবদের মেরে দিতে দিচ্ছে দুর্ভিক্ষ-পোষক সদাশয় কংগ্রেস সরকার)! রুটি স্রেফ ভুলিয়ে দেয় মাছের শোক। বাটিভরা ডাল নেই, ভাজা নেই (তেল লাগে!). চচ্চড়ি, শুক্তো, মরিচ ঝোল, ডালনা-ফালনার যে কোনো একটা যদি থাকে তো দু-গেরাসের বেশি ভাত মাখার মতো নেই, নাকে একটু আঁশটে গন্ধ নেই, —সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে রাত এগারোটায় হয় কাদার মতো গলা গলা আর নয়তো কড়কড়ে শক্ত ভাত খেতে পেয়ে কে যে সুখে একদম গদগদ হয় বাংলায়?

ঠাণ্ডা বরফ ভাত!

সেটা ভুললে চলবে না। রান্না হয় সন্ধ্যায়—গুদাম-পচা সরকারি চালের বোটকা গন্ধেই বুঝি ন্যাকা মেয়ের ভাতের জন্য কান্না বাড়ে! কর্তাকে গরম গরম ভাত দিয়ে খুশি করতে যে গিন্নি রাত এগারোটা পর্যন্ত উনানে কয়লা পোড়াবে, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে যে কর্তা ব্যক্তিটা সকাল আটটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত খেটে মরে, সে মানুষটা গিন্নির সাথে কাব্যি করবে না, মারবে এক চাঁটি।

গাঁ-ঘেঁষা ঘর। যতীনের একগণ্ডা ছেলেমেয়ে আবদার তোলে শুনতে পাই, এবেলা রুটি কর মা, রুটি কর। কর না রুটি? আটা কম তো কম করে কর না! ভাতের সঙ্গে একটা দুটো করে খাব।

বাবারে বাবা, কি রুটিই তোরা খেতে পারিস!

একটা করে দিও?

দাঁড়া দেখি হিসেব করে।

হিসাব ছাড়া পথ নেই। সব বিষয়ে সব কিছুর গোনা-গাঁথা ওজন করা হিসাব দিয়ে কোনোমতে দিন গুজরান। আটার পরিমাণ দেখে অবলা তার জীর্ণ পুরনো সেলাই করা ব্লাউজটা গা থেকে খুলে ফেলে দিতে দিতে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

নাঃ, এবেলা রুটি হবে না।

শুধু এবেলা নয়, এ হপ্তার বাকি ক-টা দিন আর রুটি পাবে না কেউ, ভাতের সঙ্গে দুখানা

একখানাও নয়। সকাল আটটায় বেরিয়ে রাত এগারোটায় ফিরবে যে মানুষটা, কদিন তার বাইরে খাবার জন্য রুটি করে দিতেই এ আটাটুকু লেগে যাবে। বাইরে কিনে খেতে বড্ড খরচ।

তবু আবদারের কলরব ওঠে—ছোটো দুজনের। তারা এখনও ভাবজগতের মায়া একেবারে কাটিয়ে উঠে বাস্তব জগতের কঠোরতা সম্পূর্ণ মানতে পারেনি, এখনও বুকে আশা নিয়েই আবদার করে। তবে এক ধমকে তারা থেমে যায়।

সাত বছরের মেজমেয়েটা ফোঁস করে ওঠে, তুমি সব বাবার জন্যে রেখে দেবে। আমরা ভেসে এসেছি? বাবা বলে কত কিছু কিনে খায়—

তার গালে একটা চড় পড়ে সশব্দে।

চড়চাপড় এই মেয়েটাই খায়। ওর স্বাস্থ্যটাই ভালো, খিদেও বেশি—ও-ই বেশি খাই খাই করে। অন্য তিনজনেই রোগা দুর্বল—দশ বছরের বড়মেয়েটা তো প্যাঁকাটির মতো দেখতে। ওদের গায়ে হাত তুলতে ভরসা হয় না—হয়তো মরেই যাবে, খিদেয় কাতর বাপের চড় খেয়ে চাষির যে ছেলেটার মরে যাবার খবর খবরের কাগজে বেরিয়েছে, তার মতো।

অন্য তিনজনকে বশে আনতে অনেক সময় শাসন জোটে একা ওই সাত বছরের মেজ মেয়েটার।

রোগা ক্ষীণজীবী বড়মেয়েটা দু-চারখানা বাসন মাজে, ঘটিতে করে জল তোলে, ঘর ঝাঁট দেয়, দোকানে যায়। পুতুলখেলা ফেলে মেজবোন দিদির সাথে হাত লাগায়। পুতুল খেলার চেয়ে তার ভালো লাগে টুকটাক সংসারের কাজ করার খেলা।

সে দিদির কাজ করে, মার কাজ নয়। মার সঙ্গে তার বিবাদ। সে মিনতি করে বলে, দিদি, আমায় দে না বাটিটা মাজি।

মা বাটিটা এগিয়ে দিতে বললে সে শুনতে পায় না। ধমক দিয়ে হুকুম করলে অনিচ্ছার সঙ্গে ওঠে, পুতুলকে বলে যায় 'রোসো বাছা একটু, পরে খেতে দেব। রাক্ষুসি ডাকছে।

আটটা বাজবার আগেই ঝিমিয়ে নেতিয়ে আসে চারজন। সেটাও মেজাজ বিগড়ে দেয় অবলার কিন্তু বেচারিরা করবে কী? খাদ্যে মেটে না ক্ষয়ের পূরণ আর পুষ্টির প্রয়োজন—ঘুম তাই ঘনিয়ে আসে আরও বেশি ক্ষয় ঠেকাতে। এ বিষয়ে প্রকৃতি ছেড়ে কথা কয় না কাউকে। ওই তেতলা বাড়ির ভুঁড়িওলা মালিক ঘনশ্যামবাবু; সাতজন ভাড়াটের কাছে লোকটা মাসে বাড়িভাড়াই পায় চারশো টাকার মতো—অনিদ্রা রোগ খুব বেশি বেড়ে গেলে মাঝে মাঝে তাকেও মাছ মাংস মিঠাই মণ্ডা একেবারে বাদ দিয়ে উপোস করতে হয়! অতিপুষ্ট শরীরটা তার যথারীতি পুষ্টি না পেয়ে আপসে একটু ঘুম এনে দিয়ে নিদ্রাহীনতার অসহ্য কষ্টে তাকে পাগল হতে দেয় না।

চারজনে একসঙ্গে খেতে বসে। তার মানে চারজনকেই একসঙ্গে বসানো হয়, একসঙ্গে চুকিয়ে দিলেই হাঙ্গামা চুকে যায়।

অবলারও সহ্যের সীমা আছে তো।

আমি আলু পাইনি মা!

আমায় ডাঁটা দিলে না যে?

এট্টুখানি ডাল দাও মা, শুধু এট্টুখানি!

পেট ভরেনি!

আমারও ভরেনি!

খা। খা। খা। আমার হাড়মাস চিবিয়ে খা তোরা।

রোগা বড়মেয়েটা চুপচাপ খায়। এবার সে তার ক্ষীণকণ্ঠ যতদূর পারে চড়িয়ে বলে, তুমি যেন কেমন কর মা। রুটি দিলে না একখানা, আরেক হাতা করে ভাত দাও না আমাদের? খিদের চোটে রাতে ওরা কাঁদলে ফের মারবে তো?

ঘরে বসে মেয়েটাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। একটু বাঁকা মেরুদণ্ডটা সে সোজা করেছে। শীর্ণ মুখে যেটুকু ক্ষোভের স্ফুরণ হয়েছে, খাঁটি দরদির চোখ ছাড়া নজরেই পড়বে না। ছোটো ছোটো চোখ, সে চোখে ভর্ৎসনার ঝিলিক দেখে কালো হরিণ চোখের কথা ভুলে গিয়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নতুন প্রতিবাদের কবিতা লিখতেন।

তোমরা সব চেপেপুটে খাবে, আমরা উপোস দেব? দ্যাখ তো হাঁড়িতে ভাত আছে কতটুকু? তোদের জন্যে দুবেলা হাঁড়ি ঠেলছি, আমি খাব না? সারাদিন হাড়ভাঙা খাটছে, সে মানুষটা খাবে না?

মাকে কৈফিয়ত দিতে হয় ছেলেমেয়ের কাছে, প্রচার করতে হয় যে মা হওয়া কি মুখের কথা! বাপ হওয়া কি সহজ কাজ! মায়ের কত ত্যাগ, বাপের কত ত্যাগ, তাতেই মুগ্ধ সন্তুষ্ট থাকা উচিত সন্তানের।

মেজমেয়েটা ছ্যাঁচোড়। সভ্যতা ভব্যতা ভদ্রতা কিছু শেখেনি সাত বছর বয়সে। সে ফ্যাঁস করে ওঠে, ইস্! তোমরা খাবে না খাবে আমাদের কী? আরও ভাত রাঁধনি কেন? তোমরা খাও না যত খুশি, আমরা না করেছি? আমাদের খালি মারবে, আমাদের খালি পেট ভরে খেতে দেবে না!

হে রাত আটটার তারায়-ভরা আকাশ, একবার বিদীর্ণ হও। কোটি বজ্রের গর্জনে ফেটে চৌচির হয়ে যাও। আমার বাংলার ছেলেমেয়েরা আজ খিদেয় কাতর হয়ে একখানা রুটির জন্য, একমুঠো ভাতের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে নিরুপায় মায়ের সঙ্গে!

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে যতীন দুদণ্ডের জন্য আমার ঘরে বসে। আড্ডা দিতে নয়—সারাদিন যা করেছে তার একেবারে বিপরীত কাজ আহার এবং নিদ্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে। যে খাটে সে জানে যে খাটুনি শেষ করেই খিদের চোটে দিশেহারা হয়ে খেতে নেই।

তাতে অসুখ হয়। শোষণের স্তর থেকে একেবারে পোষণের স্তরে আছাড় খেয়ে পড়লে সামঞ্জস্য ঠুনকো কাঁচের মতো ভেঙে চৌচির হয়ে যায়।

আমার দেওয়া বিড়িটা ধরায়। টানতে গিয়ে কাশে। গায়ে বাতাস লাগায়। হাঁফ ছাড়ে। দেহ মনের টান করা তন্ত্রী আর স্ক্রুগুলি ঢিল করে দেয়। আমার চোখের সামনে দুদণ্ডে জীবন্ত মানুষটা ঝিমিয়ে নেতিয়ে আসে। এও বাঁচার লড়ায়ের কৌশল। সকাল থেকে চলেছে সক্রিয় লড়াই—এখনকার লড়াই নিষ্ক্রিয় বিরামের। চিন্তা ভয় ক্ষোভ দুঃখ স্নেহ মমতা আনন্দ উদ্দীপনা ন্যাকামি পাকামি কোন অজুহাতেই আর একবিন্দু বাড়তি শক্তি ক্ষয় করা নয়।

খেতে বসেই টের পায় নিজের ভাগ কমিয়ে অবলা তার পাতে ভাত বেশি দিয়েছে। দুটো রসগোল্লা নয়, পেটে খিদে নিয়ে পেট ভরবে না জেনে দুমুঠো ভাত বেশি দেওয়া। এ ত্যাগের আগের দিনের মূল্য দেবার সাধটা মনের কোণে একবার উঁকি দিয়ে যায় বইকি, দরদ দেখিয়ে বলতে ইচ্ছে হয় বইকি যে, তুমি আমায় রাক্ষস বানাবে!

কিন্তু সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে নিছক আগের দিনের জের টানার জন্যেই ন্যাকামি করা কি পোষায় মানুষের?

খেতে শুরু করে খাঁটি দরদ দেখিয়ে বলে, তুমিও বসে যাও? মিছে রাত করবে কেন?

হ্যাঁ, আমিও বসি।

ফাঁকা আদর আর মিছে চোখে জল আসার চেয়ে কত মনোরম এই বোঝাপড়া। ভোরে উঠে উনান ধরাতে হবে অবলাকে, রাতের আবছা আঁধার বজায় থাকা ভোরে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে তাকে বিশ্রাম করতে বলাটাই সবচেয়ে সুমিষ্ট আদর।

অবশ্য অবস্থাটা এরকম বলে।

তারা শোয়। তাদের চোখে গাঢ় ঘুম ঘনিয়ে আসে। ঘুমোতে কেন, শ্বাস উঠে মরতেও দু-চার মিনিট সময় লাগে মানুষের। সেই ফাঁকে মেজমেয়েটা উঠে চলে যায় রান্নাঘরে।

খিদের আগুনে পুড়ে গিয়েছে তার ঘুম। অন্ধকারে কোথায় গেল, কী করতে গেল মেয়েটা? অবলাই ওঠে গায়ের জোরে। বলে, মাগো, আর তো পারি নে!

রুটি পায়নি মেজমেয়েটা। অন্ধকারে আটা নিয়ে সে জলে গুলে খাচ্ছে। খানিক ছড়িয়েছে মেঝেতে।

এঁটো হাতাটা তুলে নিয়ে অবলা প্রাণপণে বসিয়ে দেয় তার পিঠে। আর্ত কান্নায় চিরে যায় রাত্রির অন্ধকার।

হট্টগোলে চমকে জেগে কেঁদে উঠেই কান্না থামায় ক্ষীণজীবী রোগা বড়মেয়েটা।

রান্নাঘরে গিয়ে দ্যাখে কি, বোনটি তার আকাশ-চেরা গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে আটার হাঁড়িটা কাত করে ফেলে হাত-পা ছুঁড়ে তছনছ করে উড়িয়ে দিচ্ছে আটাগুলি, বাবা তার দাঁড়িয়ে আছে পুতুলের মতো, মা হাতাটা উঁচু করেছে মেয়েকে আরেক ঘা বসিয়ে দেবার জন্য।

রোগা মেয়েটা দু-হাতে হাতাটা চেপে ধরে কেড়ে ছিনিয়ে নেয়। যাকে মারবার জন্য হাতা উঁচু করা, হাতা-ধরা হাতা দুটো তারই মায়ের, তাই রোগা কাঠি মেয়েটার ক্ষীণ শক্তিটুকুই হাতাটা কেড়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। সপ্তমে তোলা তীক্ষ্ণ বাঁশির আওয়াজে বলে, পেতলের হাতা দিয়ে মারলে যে মরে যাবে মা?

ও! বড় যে দরদি আমার!

ব'লে রোগা মেয়েটার গালে চড় কষিয়ে দেবার জন্য অবলা হাত তুলেছে, যতীন তার হাতটা চেপে ধরে।

কি করছ?

অবলা ঠাণ্ডা হয়ে বলে, আর সয় না, এবার আমি মরব।

মেয়ে বলে, মরবে তো নিজে নিজে মরো না? আমাদের মারছ কেন?

পরিশিষ্ট ১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫। ১৯ মে ১৯০৮। স্থান ঃ সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহর। পৈতৃক নিবাস ঃ বিক্রমপুর, ঢাকা।

পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক হিসাবে ডাকনাম মানিক ব্যবহারের কাহিনী নিজেই তাঁর 'গল্প লেখার গল্পে' বলেছেন।

বিবাহ ঃ ১১ মে ১৯৩৮। স্ত্রী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই পুত্র ও দুই কন্যা।

পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের চতুর্থ পুত্র। পিতার সরকারি চাকুরির প্রয়োজনে, পূর্ব ও পশ্চিম, উভয় বঙ্গ এবং বিহারের বিভিন্ন শহর ও মফস্বল অঞ্চলে বাল্যকাল কেটেছে।

বাঁকুড়ার ওয়েস্‌লিয়ান মিশন কলেজ থেকে আই. এস. সি পাস করে অঙ্কে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এস-সি পড়ার সময় প্রথম গল্প 'অতসীমামী' লেখেন ও ছাপা হয় (১৯২৮)। প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' একুশ বছর বয়সের রচনা। সাহিত্যচর্চায় আগ্রহ পারিবারিক বিরোধের কারণ হয় এবং শেষ পর্যন্ত শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে স্বেচ্ছানির্বাচিত দারিদ্র্যের মধ্যে সাহিত্যকর্মকেই জীবিকার একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনের দু-তিন বছরের চাকুরি ব্যতীত সাহিত্যরচনাই ছিল জীবনের একমাত্র কাজ। জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পর এ-পর্যন্ত বিভিন্ন সংকলন-গ্রন্থসহ প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ছিয়ানব্বই। গল্প ও উপন্যাস ছাড়া উল্লেখযোগ্য অন্যান্য প্রকাশিত রচনা প্রবন্ধ ও কবিতা।

আটাশ-উনত্রিশ বছর বয়সে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' রচনাকালে একদিন হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং তারপর একমাস দু-মাস অন্তর এ-ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা যায়, মাঝে মাঝে এই অজ্ঞান হয়ে যাবার কারণ চিকিৎসাশাস্ত্রে আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে, নিজেই চিকিৎসাশাস্ত্র-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ঘেঁটে সাময়িক প্রতিষেধক হিসাবে একটি পেটেন্ট ওষুধ ও সাহিত্যচর্চার জন্য শারীরিক সুস্থতার প্রয়োজনে সম্পূর্ণ বিপরীত ও আত্মঘাতী এক উপায় গ্রহণ করেন।

অবশিষ্ট জীবন, চিকিৎসার-অতীত অসুখ ও নিয়তি-চালিত সৃষ্টিপ্রতিভার যুগপৎ আক্রমণে বহুবার মৃত্যুকে অতি নিকটে প্রত্যক্ষ করে চৈতন্যের এমন এক চরম পরীক্ষায় রত হন যেখানে শিল্পচর্চা ও জীবনচর্চা, আত্মরক্ষা ও আত্মহনন. এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। এই অমানুষিক প্রয়াসের ফলস্বরূপ ক্রমে অস্তিত্ব-সুদ্ধ বিপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু চূড়ান্ত সংকটকালেও নিজেকে রোগী বলে মেনে নিতে পারেননি এবং বিশ্বাস রাখেন যে তিনি 'সুস্থ সবল সক্রিয় মানুষ'। শেষ তিন বছরের (১৯৫৪-১৯৫৬) কিছুকাল ইসলামিয়া হাসপাতাল ও তারপর লুম্বিনী পার্কের মানসিক চিকিৎসালয়ে বিপর্যস্ত শরীর মনের শেষ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা চলে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ আস্থা রেখেও হাসপাতালের বিধিবদ্ধ চিকিৎসার বিরুদ্ধে প্রথমে বিদ্রোহ করেন শুধুমাত্র এই আশঙ্কায় যে, যে-কোনো

আরোপিত চেষ্টার সামান্যতম চাপে হয়তো তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির গঠন ও সৃষ্টিক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত চেতনাচেতনের শেষ সীমারেখা অবধি লুপ্ত হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে নীত হয়ে, ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬ (১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

লেখক-জীবনের সূচনাকাল থেকে শরীরের অন্তর্গত ব্যক্তিগত মৃত্যুর বিরুদ্ধে পরাক্রান্ত চৈতন্যের আমৃত্যু সংগ্রাম,—দীর্ঘ ঋজু প্রখর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত অথচ অতিজীবিত জীবনের সমগ্র ইতিহাস।

পরিশিষ্ট ২

গ্রন্থপঞ্জির ভূমিকা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম রচনা 'অতসীমামী' ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত উপন্যাস 'জননী' ও গল্পগ্রন্থ 'অতসীমামী' গ্রন্থ দুটির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থকার হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রতিষ্ঠা ঘটে। জীবিতকালে প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ গল্প সংকলন 'স্ব-নির্বাচিত গল্প' ও উপন্যাস 'মাশুল' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে, লেখকের মৃত্যুর মাত্র মাস কয়েক পূর্বে (মৃত্যু ঃ ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬)।

১৯২৮ থেকে ১৯৫৬, লেখক-জীবনের সূচনা থেকে সমাপ্তি অবধি নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যকর্মে ব্যাপৃত এই আটাশ বছরের লেখক-জীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা নিম্নরূপ ঃ উপন্যাস ঃ ৩৫, নাটক ঃ ১, গল্পগ্রন্থ ঃ ১৬, নির্বাচিত গল্পসংকলন ঃ ২, গ্রন্থাবলী (বসুমতি সাহিত্য মন্দির) ২ খণ্ড। মৃত্যুর পর এ-যাবৎকাল পর্যন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে : ২টি উপন্যাস (প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান ও শান্তিলতা), ১টি অসমাপ্ত উপন্যাস (মাটি-ঘেঁষা মানুষ—শেষাংশ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় লিখিত), ১টি কিশোর উপন্যাস (মাঝির ছেলে), ১টি প্রবন্ধ-সংকলন (লেখকের কথা), ছোটদের গল্পের ১টি নির্বাচিত সংকলন (ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প), ১টি কাব্যগ্রন্থ (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা), লেখকের ডায়েরি, চিঠিপত্র ইত্যাদির সংকলন-গ্রন্থ (অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়েরি ও চিঠিপত্র), অন্যান্য সংকলন-গ্রন্থ ৭টি, সমগ্র কিশোর রচনার সংকলন (কিশোর রচনা সম্ভার), ১৩ খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত মানিক গ্রন্থাবলী এবং সাম্প্রতিক প্রকাশনা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে নবভাবে পরিকল্পিত ১২ খণ্ডে সমাপ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র-এর এ-পর্যন্ত প্রকাশিত ১১টি খণ্ড।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থপঞ্জির বিষয় শুধুমাত্র গল্পের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ। লেখকজীবনের উপরোক্ত সময়কালের ভিতর প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সকল গল্পগ্রন্থ ও গল্পসংকলন এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত অন্যান্য গল্পসংগ্রহের প্রকাশ সংক্রান্ত বিবরণ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টের পরবর্তী অংশে পর্যায়ক্রমে নির্দেশিত হল।

এতকাল পর্যন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র গল্পের সম্পূর্ণ তথ্যপঞ্জি প্রণয়ন করা একরূপ দুঃসাধ্য কর্ম ছিল। লেখক কর্তৃক রক্ষিত কাগজপত্রে অধিকাংশ গল্পের রচনাকাল,

প্রথম প্রকাশের তারিখ, মূল পাণ্ডুলিপি বা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের কপি রক্ষিত ছিল না। সর্বোপরি, লেখকের কিছু বিক্ষিপ্ত কাগজপত্রে বা তাঁর ডায়েরিতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এমন অসংখ্য গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায় যেগুলি লেখকের কোনো গল্পগ্রন্থে বা সংকলন-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সম্প্রতি, প্রধানত লেখক-পরিবারের নিরলস প্রচেষ্টায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ-জাতীয় অধিকাংশ গল্পের উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত এবং অগ্রন্থিত এরূপ গল্পের পত্রিকাপাঠ থেকে অধিকাংশ গল্পের প্রকাশকাল সংগৃহীত হওয়ায় সাধারণভাবে গল্পগুলির রচনাকালেরও ধারণা পাওয়া যায়। লেখকের জীবিতকালে প্রকাশিত ষোলটি গল্পগ্রন্থের সব কটি গল্প, শিশু-কিশোরদের জন্য লিখিত গল্প এবং উপরোক্ত অগ্রন্থিত গল্পসহ বর্তমানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লভ্য গল্পের সংখ্যা তিন-শতাধিক। ষোলটি গল্পগ্রন্থ-বহির্ভূত গল্পগুলি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র-এর একাদশ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। এর পরেও রয়ে গিয়েছে বেশ কিছু অগ্রন্থিত গল্প। হয়তো সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে পত্রপত্রিকা থেকে গল্পগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

একটি বাদে শ্রেষ্ঠ গল্পে অন্তর্ভুক্ত সব কটি গল্পের পত্রপত্রিকায় প্রথম প্রকাশের তথ্য সংগৃহীত হওয়ায় প্রকাশক্রম অনুসারে গল্পগুলি বর্তমান পঞ্চম সংস্করণে (মে ২০১০) পুনর্বিন্যস্ত হল। শুধুমাত্র যাকে ঘুস দিতে হয় গল্পটির প্রকাশসূত্র অলব্ধ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল বিবেচিত হয়েছে। গল্পগুলির প্রথম প্রকাশ-সংক্রান্ত তথ্য নীচে দেওয়া হল। প্রসঙ্গত, এই তালিকায় প্রদত্ত গল্প এবং গল্পগ্রন্থের নামের বানান লেখকের জীবিতকালে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণের অনুসারী।

গল্প	পত্রিকা	প্রকাশকাল	গল্পগ্রন্থ	প্রকাশকাল
প্রাগৈতিহাসিক	পূর্বাশা	আশ্বিন ১৩৪০	প্রাগৈতিহাসিক	বৈশাখ ১৩৪৪
সরীসৃপ	বঙ্গশ্রী	আশ্বিন ১৩৪০	সরীসৃপ	শ্রাবণ ১৩৪৬
আত্মহত্যার অধিকার	ভারতবর্ষ	পৌষ ১৩৪০	অতসীমামী	ভাদ্র ১৩৪২
কুষ্ঠরোগীর বৌ	উত্তরা	ফাল্গুন ১৩৪০	বৌ	১৩৪৬-১৩৪৭ (১৯৪০)
টিকটিকি	পরিচয়	শ্রাবণ ১৩৪৪	মিহি ও মোটা কাহিনী	ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৪৫
হলুদ পোড়া	পরিচয়	শারদ ১৩৪৯	হলুদ পোড়া	জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২
কে বাঁচায়, কে বাঁচে!	ভৈরব	শারদ ১৩৫০	(অগ্রন্থিত)	—
সাড়ে সাত সের চাল	অর্চনা	বৈশাখ ১৩৫১	পরিস্থিতি	আশ্বিন ১৩৫৩
দুঃশাসনীয়	যুগান্তর	শারদ ১৩৫২	আজ কাল পরশুর গল্প	জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩
মাসি পিসি	পূর্বাশা	চৈত্র ১৩৫২	পরিস্থিতি	(পূর্বোক্ত)
যাকে ঘুস দিতে হয়	?	?	আজ কাল পরশুর গল্প	(পূর্বোক্ত)
শিল্পী	সীমান্ত পত্রিকা	১৯৪৬(১৩৫২-৫৩)	পরিস্থিতি	(পূর্বোক্ত)
কংক্রীট	পরিচয়	আষাঢ় ১৩৫৩	পরিস্থিতি	(পূর্বোক্ত)
টিচার	বসুমতী	শারদ ১৩৫৩	খতিয়ান	১৩৫৪

ছিনিয়ে খায় নি কেন	পূর্ণিমা	নভেম্বর ১৯৪৬ (কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৫৩)	খতিয়ান	(পূর্বোক্ত)
হারাণের নাতজামাই	পূর্বাশা	মাঘ ১৩৫৩	ছোট বড়	শ্রাবণ ১৩৫৫
ছোটবকুলপুরের যাত্রী	সংবাদ	শারদ ১৩৫৫	ছোটবকুলপুরের যাত্রী	আষাঢ় ১৩৫৬
আর না কান্না	পরিচয়	জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮	ফেরিওলা	বৈশাখ ১৩৬০